সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য

তপোধীর ভট্টাচার্য

সময়ের প্রত্নতত্ত্ব ও অন্যান্য

তপোধীর ভট্টাচার্য

জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
১১ জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - ৭৯৯ ০০১

SAMAYER PRATNATATTWA O ANYANYA

By

Tapodhir Bhattacharjee

প্রথম প্রকাশ
কলকাতা বইমেলা
জানুয়ারী, 2005

প্রকাশক
দেবানন্দ দাম
জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী
11 জগন্নাথবাড়ি রোড, আগরতলা - 799001
ফোন : (0381) 232 6342 / 232 3781

প্রচ্ছদ
অপরেশ পাল

মুদ্রক
বেঙ্গল ফটোটাইপ কোং
46\1, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-9

কলকাতা অফিস ও বিক্রয়কেন্দ্র
জ্ঞান বিচিত্রা
16 ডঃ কার্তিক বোস স্ট্রিট, কলকাতা - 700 009
ফোন : (033) 2360-4981

ISBN : 81-8266-021-1

মূল্য : 150 টাকা

অমলেন্দু ভট্টাচার্য
আবুল ফতে ফাত্তাহ
তরুণ মুখোপাধ্যায়
বিশ্বতোষ চৌধুরী
সময় যাদের সঙ্গে দ্বিরালাপ গড়ে তুলছে

প্রাক্‌কথন

যে-সময় পেরিয়ে যাচ্ছি এখন, তথ্যের চমকপ্রদ বিস্ফোরণে হারিয়ে যাচ্ছে বিস্ময়, পরম্পরাবোধ, গভীরতার তৃষ্ণা। মেঘ না চাইতে জল নয় শুধু, বর্ষা নেমে আসছে। তাতে জিজ্ঞাসা নেই, জিজ্ঞাসা নির্মাণের অধ্যবসায় নেই। আধুনিকোত্তর কৃষ্ণবিবরে নিজেদের মিলিয়ে দেওয়ার জন্যে আত্মহননের বৌদ্ধিক মাদকে আচ্ছন্ন হওয়া আছে বরং। বিশ্বায়ন সব শিকড়বাকড় উপড়ে ফেলছে বেপরোয়া আগ্রাসনে, উন্মাদের পাঠক্রম রচিত হচ্ছে সর্বত্র। আমাদের স্মৃতি নেই, পরম্পরা নেই, লক্ষ্য নেই, দায়বোধ নেই। পৌর সমাজের ওপর এমন ভাবে আক্রমণ নেমে এসেছে যে ভূগোল-ইতিহাস দিয়ে গড়া স্বাতন্ত্র্যের সৌন্দর্য মুছে যাচ্ছে।

এখন আমরা শুনছি প্রতীত বাস্তবতা (ভার্চুয়্যাল রিয়্যালিটি), প্রতীত পরিসর, প্রতীত সময়, প্রতীত বয়ানের কথা। এদের অভিঘাতে যথাপ্রাপ্ত অবস্থান হয়ে উঠছে শূন্যের চেয়েও রিক্ত। অথচ আমরাই সদর্থক ভাবে বিশ্বনাগরিক হতে পারতাম। বলতে পারতাম, বিমানবায়ন থেকে নির্মাণবায়ন প্রক্রিয়ার চোরাবালিতে নিমজ্জিত হওয়ার চেয়ে ভালো বিকল্প আমাদের জানা ছিল। খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীর লাতিন লেখক টেরেন্স এই বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন: 'Homo sum, humani nihil a me alienum puto' অর্থাৎ 'মানুষ আমি, মানুষের পৃথিবীতে কোনো কিছুই আমার পক্ষে দূরবর্তী নয়।' নয়ই তো। তাই সাহিত্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, সমাজতত্ত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সক্রেটিস-প্লেটো-অ্যারিস্টটল-নিউটন-আইনস্টাইন-মার্ক্স-বাখতিনের মতো অসংখ্য চিন্তাবিদদের আত্মস্থ করে নিয়েছে।

সমস্তই মানববিত্ত, সব কিছুতে আমাদের উত্তরাধিকার স্বতঃসিদ্ধ বলেই কালে-কালান্তরে অনবরত প্রসারিত হচ্ছে মানব সম্পদের সমৃদ্ধি। এই ধারা যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে, আলোকযোদ্ধারা কখনও অন্ধকারের কাছে হার মানবে না। আর, যেমন ভেবেছিলেন টেরেন্স, ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা হয়েও, আমরা হতে পারব সার্থক বিশ্বনাগরিক। নেতি ও নৈরাজ্যের বিশ্বায়ন যত উৎকট হোক, নিরন্তর নবায়মান জিজ্ঞাসাই হবে আমাদের প্রতিরোধ আর বিকল্প জীবনবীক্ষার ইস্তাহার।

কত বিচিত্রভাবে দেখা যায় জীবনকে, তৈরি করা যায় মনন ও কল্পনার কত অজস্র সৃজনশীল প্রতিবেদন : বহুবাচনিক এই সত্যের আভাস পাওয়ার জন্যে পড়ব প্রতীচ্যের ভাবুকদের রচনা। বুঝব, জীবনের কত লীলা আর মানুষের কত রূপ। হয়তো এতে নিজেদের অজ্ঞাতসারে পুঞ্জীভূত হয়ে-ওঠা রক্ষণশীলতা ও কূপমণ্ডূকতার নিশ্চল অভ্যাস কেটে যাবে। শুনতে পাব মহাসমুদ্রের চলোর্মি আহ্বান। আত্ম-প্রতারক সমঝোতা-প্রবণতার দুঃসহ ঘোর ভেঙে যাবে তখন। আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধা-পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় যে কাঁটাঝোপ ও ক্যাকটাসের চাষ হয়ে উঠেছে অবাধ অগাধ, তার উপর ভোগোন্মত্ত আধুনিকোত্তরবাদের প্রচ্ছায়া আরোপিত হওয়ার ফলে

ছিন্নমূল ব্যক্তিসত্তা কি অতলান্ত সংকটের মুখোমুখি, কোথাও কি রয়েছে কোনো বিশল্যকরণী: এইসব বিহুল প্রশ্নাবলি উঠে আসবে বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থান থেকে। এইজন্যে পড়া, এইজন্যে লিখন-প্রয়াস। শরিক হওয়ার জন্যে, শরিক করার জন্যেও।

পড়াও যুদ্ধ। নেতিবাদ ও নৈরাজ্যপন্থার বিরুদ্ধে, উৎকট মূল্যবোধহীনতা ও জৈব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। সমস্ত তাৎপর্য তাই নিঃসন্দেহে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। এই পাঠ জীবনের, এই পাঠ সাহিত্যের। এভাবেই যাবতীয় অন্তর্ঘাত ও বিদূষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াব আমরা। নির্মাণ করব আমাদের অনুভব-স্থাপত্য, মননবিশ্ব ও বিশ্বাসের ত্রিপাদভূমি। অনিবার্য এখন নতুন দ্রাঘিমার আবিষ্কার, অপরাজেয় আলোর কথকতা। যত পড়ি তত বুঝি নিজেকে আর চারদিকে সৃজ্যমান জগৎকে। লিখি পুরোনোকে নতুন চোখে দেখার কথা, পুরোনোর ঝরে যাওয়া আবার নতুন প্রকরণে ফিরে আসার কথাও। লিখি নতুনের বিহ্বলতা, স্ববিরোধ আর ব্যাসকূট নিয়ে। লিখি যে তীব্র সংঘর্ষের কুহকে সত্তা আর সত্তা নেই, জগৎও জগৎ নেই। এবং লিখি, তত্ত্ববীজদেরও আছে গ্রীষ্ম-বর্ষা শীত-বসন্ত। শেষ আছে সব কিছুর, শুধু মানুষের শেষ নেই কোনো।

মানুষ এবং তার অন্তর-বাহির নিয়ে কত গ্রন্থনা তাত্ত্বিকদের। যত দেখি তত দৃষ্টির পরিধি বেড়ে যায়। যত অধ্যবসায় এই প্রক্রিয়ায়, তার চেয়ে বেশি আনন্দ: এই জেনেছি তত্ত্ববিশ্ব পরিক্রমায়। ছোট পত্রিকার সহযোদ্ধা সম্পাদকেরা চেয়েছিলেন, তাই এইসব লেখাপত্র : একথা এখানে না-লিখলেই নয়। তাঁদের সঙ্গে আমার নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপের নিদর্শন এই নিবন্ধ সংকলন, জ্ঞান-বিচিত্রার অনুজ-প্রতিম কর্ণধার দেবানন্দ দামের সদিচ্ছায় যা প্রকাশিত হচ্ছে। বিজ্ঞান-মনস্ক তিনি, মানব-বিজ্ঞানের আরেক পরিসরে সম্প্রসারিত হলো তাঁর কৃৎকুশলতা। ভরসা করি, এই প্রকাশনা নতুন সূচনাবিন্দুর স্মারক বলে বিবেচিত হবে অচিরেই। আর, উল্লেখ থাকুক আমার কৃতী ছাত্র শ্রীমান অমিতাভ চক্রবর্তী ও ভাগ্নে অয়নের অকুণ্ঠ সহায়তার কথাও।

যে-কথা আগেও জানিয়েছি, তা-ই আরও একবার জানাই: তত্ত্ব নয়, পড়াটা কঠিন। পড়া শিখতে হয়। যে-মানুষ খবরের কাগজ পড়ে, সেই একই মানুষ একই ভঙ্গিতে উপন্যাস বা কবিতা পড়ে না; তেমনই পড়ে না অনুসন্ধিৎসা-খচিত প্রবন্ধ। এইজন্যে সকলেই পাঠক নয়, কেউ কেউ পাঠক।

অবশ্য, এখানে একটুখানি সংশোধনী প্রস্তাব করতে চাইছি। পড়ার যুদ্ধে সবাইকে পাঠক হিসেবে চাই; কেননা আমাদের অন্বিষ্ট সর্বমানবিক অভিজ্ঞান।

১৯ জানুয়ারি ২০০৫ তপোধীর ভট্টাচার্য

নিবন্ধক্রম

সাহিত্যতত্ত্বের সহজ পাঠ

গত কয়েক বছরে বাঙালির পাঠাভ্যাস নামক অচলায়তনের প্রাচীরে বেশ কিছু ফাটল দেখা দিয়েছে। পড়ার চিরাচরিত ধরন কিছুতেই বজায় থাকছে না। চিন্তা-চর্চার কোনো ক্ষেত্রই আর সুনির্দিষ্ট দীক্ষিতজনদের মধ্যে রুদ্ধ নয়। বহুদিন যে-যাঁর সীমানার মধ্যে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চা করে গেছেন। সামাজিক জীবনে বড়োসড়ো ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে প্রাচীরগুলি হয়তো কেঁপে উঠেছে কিংবা কয়েকটা পাথর খসে পড়েছে ; কিন্তু চিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয় এইসব উৎপাত শুষে নিতেও দেরি হয়নি। সময়-স্বভাবের কথা বিদ্বজ্জনেরা বিবেচনা করেছেন হয়তো এবং বিবর্তনশীল সময়ের অনুশীলন করে নতুন কিছু উপাদানও আত্মস্থ করেছেন, কিন্তু কাঠামোর খোল-নলচে পালটে নেওয়ার কথা ভাবেননি। মানুষের অস্তিত্বগত নির্যাস এবং তার হওয়া ও হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া কীভাবে সময়ের গ্রন্থিল বাস্তবতায় সম্পৃক্ত এবং অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ কেন অজস্রবার বদলে যাচ্ছে, তার যথার্থ অনুশীলন হয়নি।

একুশ শতকের প্রত্যুষে আমরা দেখছি আমাদের চেনাজানা পৃথিবী গত একশ বছরে ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গেছে। একদিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অকল্পনীয় উন্নতি, অন্যদিকে নিজেরই গড়া সাজানো বাগানকে ঘাতকের নির্মমতায় উপড়ে ফেলছে মানুষ। ইতিহাসের সংজ্ঞা ও প্রকরণ বদলে যাচ্ছে মুহুর্মুহু, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্তঃসার খোঁজার বদলে আমরা নিজেদের অজান্তে বহিরঙ্গসর্বস্ব হয়ে পড়েছি। বাইরের জগতে তুমুল আলোড়নই চলছে না শুধু, উদ্দাম গতি তৈরির তাড়নায় আজকের সব চিহ্ন ও প্রত্যয় আগামীকালই মুছে যাচ্ছে। যে-কোনো মূল্যে নতুন হওয়া ও নতুন থাকার তাগিদ সব বিশ্বাস, দায়বোধ ও মূল্য-চেতনাকে অবান্তর করে দিচ্ছে। ফলে কোথাও কোনো স্থিরতা নেই, কেন্দ্র নেই কাজে কিংবা চিন্তায়; আছে কেবল চাওয়া-পাওয়ার মাদকে নিজে আচ্ছন্ন হয়ে অন্যকেও আচ্ছন্ন করার প্রক্রিয়া। বিশ শতক মানুষকে কেবল লেনিন, মাও সে তুং, চে গুয়েভারা দেয়নি— হিটলার, আইখম্যানদেরও দিয়েছে। এ যুগে মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ফিদেল কাস্ত্রো যেমন রয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি রয়েছে মুসোলিনি-গর্বাচ্যভ-বিল ক্লিন্টনের মতো ইতিহাসের খলনায়কেরাও । এ যুগ ফ্রয়েড-সার্ত্র-আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথ-কাম্যু-মার্কেজের যতখানি, ঠিক ততটাই প্রতিভাবাদর্শের অজস্র স্থপতিদেরও। এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে।

মোদ্দা কথা হলো: বিশ শতকের বহুরৈখিক মানবিক উপার্জন ধ্বস্ত হয়ে গেছে হিরোশিমা- নাগাসাকিতে, ইরাকে, বসনিয়ায়, নাৎসি বন্দি শিবিরে, ইথিওপিয়ায় ক্ষুৎপীড়িত

মানুষের মিছিলে। গত তিন দশকে ঐস্লামিক মৌলবাদ, হিন্দু মৌলবাদ, নব্য নাৎসিবাদ ইত্যাদির পুনরুত্থানে মুক্ত মানুষের আলো-হাওয়া-রোদ অনেকটা বিষিয়ে গেছে। এই সময় আত্ম-প্রতারণার, পারস্পরিক প্রবঞ্চনারও। ইতিহাস, সামাজিক প্রগতি, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয়কে মহাআখ্যান বলে যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, এরা যে প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন ধাঁচের ও চরিত্রের নয়া উপনিবেশবাদী কৃৎকৌশলগুলিকে আরো পোক্ত করতে চাইছে এবং মানুষকে নির্বাসন দিচ্ছে তারই যত্নে-গড়া জগৎ থেকে —এই অনস্বীকার্য সত্য থেকে আমাদের দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার আয়োজন এখন সর্বত্র। এই মুহূর্তে যারা অন্ধ, সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা।

আবার এরাই সব ধরনের মৌলিক জিজ্ঞাসা থেকে আমাদের মনোযোগ সরিয়ে দিতে চায়। এবং এরাই, অগভীর সফরি-সঞ্চরণে অভ্যস্ত থেকে যাবতীয় জিজ্ঞাসু প্রতিবেদনকে তত্ত্বকথা বলে পরিহাস করে আসর জমিয়ে তুলতে চায়। এতে অযোগ্যতা ও অক্ষমতাজনিত কিছু অস্বস্তি থেকেও খুব সহজলভ্য পরিত্রাণের পথ এরা পেয়ে যায়। তাদের অগভীরতা, অন্তঃসারশূন্যতা, আঙ্গিক-সর্বস্বতা, সময়- নিরপেক্ষতা আড়ালে চলে যায়। চিন্তা ও মননের সংকীর্ণতা, অনুভূতি ও উপলব্ধির অভাব, ধারাবাহিক অধ্যয়নে অনীহা, বিশ্লেষণে ব্যর্থতা যখন সীমাহীন, তখনই 'তত্ত্ব' শব্দটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র এরা আঁৎকে ওঠে। থোড়-বড়ি খাড়া আর খাড়া-বড়ি-থোড় যাদের জীবনের মূলমন্ত্র, এদের জন্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক হলো প্রবাদের সেই অণুগল্পটি : 'কত রবি জ্বলেরে ? কেবা আঁখি মেলেরে !'

দুই

মূল প্রশ্নটা হলো : তত্ত্ব কী এবং তত্ত্বের কেন প্রয়োজন ? এই প্রসঙ্গ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আলোচিত হয়েছে। তবু আরো একবার বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যেতে পারে। 'তত্ত্ব' - এর আভিধানিক অর্থ হলো স্বরূপ বা যাথার্থ্য। অন্যভাবে বলা যায়, বস্তুস্বরূপই তত্ত্ব। কোনো ঘটনা-বিন্যাস বা ভাব-বিন্যাসের সারাৎসার যখন অনুসন্ধান করি এবং সেই অনুসন্ধানের বার্তা বা প্রতিবেদন তৈরি করি, তখনই তত্ত্বকথা জন্ম নেয়। তার মানে, তত্ত্ব হলো বিশেষ দৃষ্টি এবং দার্শনিকেরই অন্য নাম তাত্ত্বিক। ইংরেজি ভাষান্তরে তত্ত্বকে বলি 'Theory'; এতেও রয়েছে দেখারই প্রসঙ্গ। লাতিন ও গ্রিক উৎসমূলে পাচ্ছি 'Theoria' যার আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ (Webster's 3rd New International Dictionary, 1986 : 2371 অনুযায়ী) হলো 'act by viewing, contemplation, consideration'। আর একই উৎসজাত ফরাসি 'Theorein' এর অর্থও 'to look at, behold, contemplate, consider'। ঐ একই অভিধানে শব্দটির প্রাচীন প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

বলা হয়েছে, 'Theory' হলো 'Imaginative contemplation of reality, Direct intellectual apprehension, insight' অর্থাৎ বাস্তবতার কল্পনা-নিষিক্ত উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ বৌদ্ধিক উপপত্তি বা অন্তর্দৃষ্টি হলো তত্ত্বের সারাৎসার। যিনি প্রতীয়মানের নির্মোক ভেদ করে গভীরে দৃষ্টিপাত করতে পারেন, তিনিই তাত্ত্বিক।

উল্টো করে বলা যায়, সাহিত্যের কিংবা সমাজের কিংবা দর্শনের কোনো প্রতিবেদন থেকে নির্যাস খুঁজে নিতে চাইলে অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হওয়া আবশ্যিক। যাদের মনোযোগ কেবল বহিরঙ্গে সীমিত থাকে, তারা আসলে খোলসের চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে শাঁসের দিকে নজর দিতে ভুলে যায়। এরা চোখ থাকতেও অন্ধ, মন থাকতেও মননহীন। এইসব দৃষ্টিহীন জনেরাই প্রকরণ-সর্বস্ব হয় এবং বহু প্রজন্ম ধরে সুনির্দিষ্ট প্রথাসিদ্ধ পথে চলতে পারলে স্বস্তি বোধ করে। অতএব এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে এ ধরনের মানুষ-জনেরা তত্ত্বের ওপরে সবচেয়ে বেশি খড়্গহস্ত। এইসব অচলায়তনের দ্বাররক্ষীরা সমালোচনার নামে নিরপেক্ষ বাক্যপিণ্ডের সমাবেশ ঘটিয়ে থাকে। প্রচলিত চিন্তা-পদ্ধতি বলতে যা বোঝেন তাকেই নির্বিচারে মান্যতা দিয়ে যান। এদের মনে কখনো কোনো জিজ্ঞাসা জাগে না। তাই পাঠকও তাঁদের রাশিরাশি ভারাভারা বাক্যস্রোত থেকে নিজের মনে কোনো প্রশ্ন উঠে আসতে দেখেন না।

দেখা যাচ্ছে, ধ্রুপদী গ্রিক ও রোমান মনীষা দৃষ্টির বিশেষত্বকেই সত্য সন্ধানেব মুখ্য হোতা বলে জেনেছিল। অতএব তত্ত্ব মানে গভীর বিশ্বাস ও অবস্থান গ্রহণের প্রস্তাবনা। প্রাগুক্ত অভিধান দৃষ্টি ও তাত্ত্বিকতাকে অভিন্ন বলে জেনে এদের গভীরতর ব্যঞ্জনাকে প্রসারিত করে জানিয়েছে যে তত্ত্ব বা 'Theory' হলো (a) belief, policy or procedure proposed or followed as the basis of action : a principle or plan of action; (b) an ideal or hypothetical set of facts, principles or circumstances ; (c) The body of generalisations and principles developed in association with practice in a field of activity ; (d) the coherent set of hypothetical, conceptual and pragmatic principles forming the general frame of reference for a field of enquiry ; (e) a hypothetical entity of structure explaining or relating an observed set of facts' ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, গ্রিক বিশ্ববীক্ষায় দেখা বা বীক্ষণ ছিল সমস্ত বৌদ্ধিক উপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দু। তাই দৃষ্টির বহুধা-বিচ্ছুরণ মূল অভিধা থেকে ক্রমাগত নানা ধরনের ব্যঞ্জনা নিঙড়ে নিয়েছে। শুধু কি বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায়, গ্রিক জীবনের আরো দুটি প্রধান পরিসরে তত্ত্বের মূলাধার 'দেখা'কে আমরা প্রসারিত হতে লক্ষ করি। যেমন জ্যামিতিক উপপাদ্য বা Theorem উদ্ভূত হয়েছে গ্রিক (এবং লাতিন) Theorema থেকে যার আক্ষরিক ইংরেজি

অনুবাদ করা হয়েছে Sight বা Spectacle। ফরাসি ভাষায় Theoros হলো Spectator অর্থাৎ দর্শক। সুতরাং এখানেও দেখারই রকমফের।

এই দৃষ্টির বিচ্ছুরণ থেকে দেখা দিচ্ছে বস্তুতে বস্তুতে, প্রতীকে প্রতীকে, বস্তুতে প্রতীকে বিচিত্র সম্পর্কের টানাপোড়েন। এই দৃষ্টিই রয়েছে Theater বা নাট্য-ক্রিয়ায়। গ্রিক Theatron ইংরেজিতে বোঝাচ্ছে To see. view. action of seeing । আসলে মূল গ্রিক শব্দের পূর্বপদ এই দৃষ্টির ক্রিয়া বোঝায় আর প্রত্যয় সূচক উত্তরপদ বোঝায় means. instrument or place। এভাবে ভাষার অন্তর্নিহিত ইঙ্গিতধর্মিতায় চেতনার উন্মেষপর্ব থেকে বিশিষ্ট দৃষ্টিকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তত্ত্ব বা Theory - এর অব্যাহত যাত্রা কোনো নতুন কথা নয়। গত ত্রিশ বা চল্লিশ বছরে যদি তাত্ত্বিক প্রতিবেদনের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব খুব বেশি মাত্রায় লক্ষ্যগোচর হয়ে থাকে, এর মানে নিশ্চয় এই নয় যে এ কোনো নতুন প্রবণতা। মানুষ যেদিন থেকে অস্তিত্ব ও জগতের আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়েছে, সেদিন থেকেই তত্ত্বেরও সূচনা হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ যদি কেউ ঘুম ভেঙে উঠে বলেন, এসব তত্ত্বটত্ত্ব আবার কেন — তাহলে তিনি আত্মপ্রতারণা করছেন মাত্র।

তিন

যাঁরা খুব বিজ্ঞের মতো গাছ আগে না ফল আগে গোছের যুক্তি দেখিয়ে বলেন, আগে সাহিত্য পরে তত্ত্ব কিংবা আগে সমাজ পরে তত্ত্ব (অথবা আগে অভিজ্ঞতা পরে উপলব্ধির সূত্র) তাঁরা শুধু বিভ্রান্তি ছড়ান। যেখানে কোনো বিভাজন নেই, সেখানে জলবিভাজন রেখা কল্পনা করে তাঁরা নিজেদের চিন্তাদৈন্য ও অগভীরতাকে ধরিয়ে দেন মাত্র। এঁদের অধিকাংশ জেগে-জেগে ঘুমোন বলে তাঁদের ঘুম কেউ ভাঙাতে পারে না। যদি কেউ 'বুঝব না' বলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে থাকেন, তাঁকে বোঝাবে কে ? আসলে এই বোঝা এবং না বোঝার ব্যাপারটাও পুরোপুরি অভ্যাসের বিষয়। যেভাবে ভাবতে এবং বুঝতে আমরা বহু প্রজন্ম ধরে অভ্যস্ত, তাতে কোনো ছেদ ঘটলে বা ব্যতিক্রম হলে সমস্ত বোধ তোলপাড় করে প্রত্যাখ্যানের জেদ দেখা দেয়। যা কিছু অভ্যাসের বাইরে, তাকেই সন্দেহের চোখে দেখে অধিকাংশ মানুষ। স্বভাবত সাবধানী মন অতিসতর্কতা বশত ভেবে নেয়, নিয়ম মাফিক কিছু না হলেই বিপত্তির আশঙ্কা। এর চেয়ে ভালো স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপদ সরলীকৃত পথে চলা। সময়ের রূপান্তর এহেন চিত্তবৃত্তিতে কথার কথামাত্র, চোখের সামনে চেনা-জানা জগৎ অপরিচিত হয়ে গেলেও কিছুতেই স্বেচ্ছাবৃত বৃত্তবন্দিত্ব থেকে কেউ বেরিয়ে আসতে চায় না। একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোকের কথা মনে পড়ছে

'তাতস্য জলোয়ম্ ইতি ব্রুবাণাঃ।
ক্ষারং জলং কাপুরুষাঃ পিবন্তি।'

তার মানে, 'এ আমার পিতৃপুরুষের তৈরি কুয়ো, এই বলে দূষিত কুয়োর জল কাপুরুষেরাই খেয়ে নেয়।' বলা বাহুল্য, কাপুরুষ বলতে এখানে গোঁয়ার-গোবিন্দ, মূর্খ ও অবিবেচকদেরই বোঝানো হচ্ছে।

জীবনের সর্বস্তরে এখন মুহুর্মুহু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। মহাকাশ-প্রযুক্তির কল্যাণে একদিকে ইন্টারনেট এবং অন্যদিকে দূরদর্শনের অজস্র চ্যানেলে পৃথিবীব যাবতীয় তথ্য ও বিনোদন হাতের মুঠোয় এসে গেছে। বিশ্বায়নের নামে নয়া ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভোগবাদকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে আমাদের চিন্তাচেতনা আজ দুমড়ে মুচড়ে অষ্টাবক্র হয়ে যাচ্ছে। সত্য উৎপাদিত হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্তে। কায়া হয়ে যাচ্ছে মায়া আর মায়া হয়ে উঠছে কায়িক অস্তিত্ব। দৈনন্দিন জীবনে এবং বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সম্পর্কে অতীতের প্রাসঙ্গিকতা থাকছে না কোথাও। সব কিছুতে আমরা পরিবর্তন মেনে নিচ্ছি। বস্তুত স্বতশ্চল ভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল বদলে যাচ্ছে। অথচ সাহিত্যের পাঠ বিশ্লেষণে আমরা অদ্ভুতভাবে রক্ষণশীল হয়ে পডছি। নতুনভাবে পড়তে, ভাবতে ও বিশ্লেষণ করতে আমরা নারাজ। কেউ যদি নতুনভাবে কথা বলতে চায়, নতুন ঐ বাচনকে তত্ত্বকথা বলে উড়িয়ে দিযে আমরা ভারি স্বস্তি বোধ কবি। 'তাত্ত্বিক' বিশেষণটি হয়ে উঠেছে নিন্দাবাচক। বিচিত্র আত্মবিরোধিতার এই প্রদর্শনী সমানে চলেছে।

সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে আরো একটা মজার ব্যাপার দেখা যায়। একদিকে বিশ্বায়নকে মান্যতা দিয়ে আমরা পিটার ইংল্যান্ড শার্ট কিংবা নিউপোর্ট জিন অথবা রিকার্ডি ভরিয়মের মতো পানীয়কে আমাদের ঈপ্সিত আধুনিকোত্তর জীবনের চিহ্নায়ক করে নিতে পারি, কিন্তু সাগরপারের কোনো তত্ত্ব-প্রস্থানের ছায়ামাত্র দেখে ব্যাখ্যাতীত শুচিবায়ুর প্রভাবে 'গেল গেল' বলে আর্তনাদ শুরু করে দিই। পদার্থবিদ্যায় আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ কি বিদেশের বস্তু বলে উপেক্ষিত হতে পারে কখনো? হকিং-এর সময় ও কৃষ্ণবিবর বিষয়ক ভাবনা কি ভারতীয় উপমহাদেশের বৈজ্ঞানিকেরা বিদেশি তত্ত্ব বলে উপেক্ষা করতে পারেন? অথবা ভাষা-বিজ্ঞানে কেউ কি আজ সোস্যুর ও চমস্কিকে এড়িয়ে যেতে পারেন! প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অলীক ব্যবধান বিশ শতকের শেষপ্রান্তে পৌঁছাতে পৌঁছাতে মুছে গেছে। অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স যদি বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য বিভাগে অবশ্য-পাঠ্য বলে স্বীকৃত হয়ে থাকে, তাহলে নতুন কালের নতুন দাবি অনুযায়ী ফুকো-দেরিদা-বার্ত-বদ্রিলার-বাখতিন প্রমুখ তাত্ত্বিকদের ভাবনা কেন অনুশীলন করা যাবে না? অ্যারিস্টটল — পরবর্তী পৃথিবী কতবার ওলটপালট হয়ে গেছে; কিন্তু দেশে দেশে

সাহিত্য-আলোচনায় তাঁর অমোঘ উপস্থিতি তর্কাতীত। তবু এও সত্য যে সার্বিক বিনির্মাণের এপর্যায়ে কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে সাহিত্য-চিন্তা রুদ্ধ থাকতে পারে না। ভারতীয় উপমহাদেশে বাঙালির সাহিত্য-চিন্তাও নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির অভিঘাত অস্বীকার করতে পারে না। অন্ধ হলে কি আর প্রলয় বন্ধ থাকে ?

চিন্তাচেতনায় কোনো ভূগোলের সীমারেখা স্বীকৃত নয়। তা যদি হত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার রুদ্ধ থাকত তার উৎসভূমিতে। মানুষের পৃথিবীতে যত কিছু নতুন উদ্‌ভাসন হয়ে চলেছে, তাতে প্রত্যেকের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। যদিও জ্ঞান আর প্রতাপ অন্যোন্যসম্পৃক্ত এবং তথ্য-উপনিবেশবাদ অত্যন্ত সক্রিয় — মননবিশ্ব এক ও অবিভাজ্য। সেখানে নতুন ধরনের 'হ্যাভ' আর 'হ্যাভ-নট' এর বিভাজন মেনে নেবে না কেউ। যেহেতু তাৎপর্য সর্বদা প্রসঙ্গ-নির্ভর, প্রতিটি গ্রহীতা সমাজ নতুন চিন্তা-চেতনাকে নির্বিচারে একইভাবে প্রয়োগ করবে না। নিজের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রয়োজন অনুযায়ী যতখানি নেওয়ার নেবে, বাকিটুকু বর্জন করবে। বস্তুত একই তত্ত্ববীজ ভিন্ন ভিন্ন মননভূমিতে আলাদা-আলাদা ফসল উৎপাদন করতে পারে, করে থাকেও। তত্ত্ববীজের উপযোগিতা পরখ করতে গিয়ে চিন্তার অভ্যাসে রৈখিকতা ভেঙে যায়। শেষ পর্যন্ত তার প্রায়োগিক সম্ভাবনা যতটুকু থাক না কেন, বহুদিনের প্রাতিষ্ঠানিক মনন সম্পর্কে তাতে যে প্রশ্ন দেখা দেয — এব গুরুত্ব অনেকখানি। বিশেষত সাহিত্যিক পাঠকৃতির বিশ্লেষণে নিরন্তর বিনির্মাণ সবচেয়ে জরুরি। মননের প্রাতিষ্ঠানিক ধরন প্রশ্নের সম্ভাবনাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দেয়। তাই নতুন-নতুন জিজ্ঞাসা উসকে দেওয়ার অর্থ যাবতীয় বদ্ধতা-নিষ্ক্রিয়তা-অনীহার জটাজাল থেকে চেতনাগঙ্গার মুক্তি। এই প্রক্রিয়াকে গতিময় করে তোলে নতুন নতুন তত্ত্ববীজের সাহসী ও নিরবচ্ছিন্ন কর্ষণ। অর্থাৎ চিন্তাবীজের ব্যবহার উপযোগিতা আর ফসলের জমি তৈরির কাজ একই প্রক্রিয়ার এপিঠ আর ওপিঠ।

চার

বাঙালির চিন্তাবিশ্বে উনিশ শতক যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিল, তাতে বহুদিনকার রৈখিকতা ও অভ্যাসের গণ্ডি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আঠারো শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত সামাজিক ধারাবাহিকতায় বিপুল ছেদ নিয়ে এসেছিল প্রতীচ্যের অজস্র ভাববীজ। সেদিনকার রক্ষণশীল সমাজ যাবতীয় নতুনের বিরুদ্ধে উৎকটভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ইতিহাসের চাকা সব অচলায়তন গুঁড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে গেছে। অবশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা লক্ষ করার মতো। নবীন প্রজন্মের যাঁরা নির্বিচারে ও প্রসঙ্গবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতীচ্যের ভাববীজকে মান্যতা দিয়েছিলেন — নিজেদের মুদ্রাদোষে ক্রমে তাঁরা আলাদা, কক্ষচ্যুত ও নিঃসঙ্গ হয়ে গেছেন। অন্যদিকে নবাগত তত্ত্ববীজ ও কর্ষণযোগ্য ভূমির দ্বিবাচনিক সম্পর্ক

যাঁরা যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছেন, তাঁরাই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে সোনালি ফসল ফলিয়েছেন। গ্রহণ ও বর্জনের এই দ্বিরালাপ আসলে সময়েরই আহ্বান। সময়ের কণ্ঠস্বর যাঁরা শুনেও শোনেননি, তাঁরাই বিশ্লেষণশূন্য নিরক্ত মননের কিংবা মননহীনতার পরিচয় দিয়ে অনিবার্যভাবে সময়-বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন। ফলে সময়ের মূল স্রোত তাঁদের নির্মমভাবে পরিত্যাগ করে নতুন ভগীরথদের শঙ্খনাদ শুনে এগিয়ে গেছে।

বিদেশের ঠাকুর ফেলে স্বদেশের কুকুর উপাসনাকে যতই একমাত্রিক ভাবে শ্লাঘ্য মনে করা হোক না কেন, ইতিহাসের পাতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিন্তু খুব বেশি মর্যাদার অধিকারী নন। বঙ্কিমচন্দ্র গুপ্তকবিকে যতই প্রশংসা করুন না কেন, তিনি নিজে কিন্তু উপন্যাসের মতো সময়-সচেতন ও দ্বিবাচনিক কল্পনায় ঋদ্ধ নতুন প্রকাশ-মাধ্যমটি প্রতীচ্যের ভাব-জগৎ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রতীচ্যের তত্ত্ববিশ্ব থেকে আহৃত সাহিত্য-মাধ্যমকে বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের জাগরণ-উন্মুখ বাঙালি চেতনার পক্ষে যথাসাধ্য উপযোগী করে তুলেছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তেমনি মহাকাব্যের ভাববীজ ও প্রকরণ সন্ধান করতে গিয়ে ভারতীয় আধার ও প্রতীচ্যের আধেয়ের মধ্যে অপূর্ব দ্বিবাচনিক গ্রন্থনা সম্ভব করে তুলেছিলেন। Blank verse কোন্ জাদুমন্ত্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রূপান্তরিত হলো, তা যদি অনুধাবন করি, তাহলে বুঝব, পয়ারের বেড়ি তাঁর পক্ষে ভেঙে ফেলা সম্ভবই হত না যদি তিনি প্রতীচ্যের চেতনাবিশ্বকে অস্বীকার করতেন। আসলে প্রতিভার অভিজ্ঞানই হলো সংশ্লেষণের ক্ষমতা।

গোটা বিশ শতক জুড়ে আমরা বার বার দেখলাম, সাহিত্যের অন্তর্বস্তু ও আঙ্গিক পুরোনো পথ ছেড়ে নতুন পথ ধরে এগিয়ে যেতে চাইছে। সর্বদা এই উদ্যম যে সফল হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। কিন্তু তবুও অব্যাহত থাকছে নিরবচ্ছিন্ন আত্মবিনির্মাণ। এই অসংখ্যবার বাঁক ফেরার পেছনে কিন্তু রয়েছে সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিশ্বপরিসর থেকে অনবরত নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আত্তীকরণের প্রবণতা। চিন্তায় যখন নতুন বিভঙ্গ তৈরি হচ্ছে, সাহিত্যে তার অভিঘাত অনিবার্যভাবে এসে পড়ছে। বাঙালির মনন পর্বে-পর্বান্তরে নতুন নতুন তত্ত্ব-প্রস্থান থেকে আধেয় সংগ্রহ করে গেছে বলেই স্রোত সরে গিয়ে চরভূমি বড়ো হয়ে দেখা দেয়নি। কোনো সন্দেহ নেই যে চিন্তা-প্রবাহকে সঞ্জীবিত করার জন্যে বহির্জগৎ থেকে নিয়মিত নতুন নতুন উপকরণের যোগান চাই। অন্তত বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক পাঠ-অভিজ্ঞতা এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য করে তোলে। বিশ শতকের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক প্রেরণাকে নানা মাত্রায় শুষে নিয়ে বাঙালির সৃষ্টিশীলতা এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে পরিক্রমা করেছে। মার্ক্সবাদ-অস্তিত্ববাদ-পরাবাস্তববাদ থেকে শুরু করে হাল আমলের আকরণবাদ-আকরণোত্তরবাদ-নারীচেতনাবাদ-উপনিবেশোত্তরচেতনাবাদ ঐ পরিক্রমায় কত বিচিত্র ধুপছায়া ও উচ্চাবচতা এনে দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণ

ছাড়া এত অজস্র তত্ত্ববীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ও পুষ্পায়ন সম্পর্কে যথার্থ ধারণা করা অসম্ভব।

সাহিত্যতত্ত্ব জীবনের বাইরে যেতে পারে না কখনো। জীবনতত্ত্ব আর সাহিত্যতত্ত্ব একই সত্যের দুরকম উপলব্ধি মাত্র। জীবনে যা কিছু ঘটে এবং সাহিত্যিক প্রতিবেদনে যা কিছু প্রকাশিত হয়, সমস্তই কোনো-না-কোনো তত্ত্বের পুষ্টিদান করে। জীবনে তত্ত্ব মিশে থাকে জলে মাছের মতো। তেমনি সাহিত্যে তত্ত্ব থাকে ধমনীতে রক্ত-প্রবাহের মতো কিংবা জৈব অস্তিত্বে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। অর্থাৎ তত্ত্বের অন্তর্বৃত অস্তিত্ব বুঝে নিতে হয় স্বভাবের পথে। তাই কোথাও যদি সামঞ্জস্য ব্যাহত হয় বা আতিশয্য প্রকট হয়ে পড়ে, তাতে তাত্ত্বিক বিন্যাসের সৌন্দর্য ও মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং সাহিত্যতত্ত্বের সার্থক অভিব্যক্তি বা অনুশীলন কখনো সামঞ্জস্য-বোধকে পীড়িত করতে পারে না। কিন্তু যাঁরা এই বিষয়টিকে গভীরভাবে বুঝতে চান, তাঁদের জন্যে রয়েছে আবশ্যিক কিছু প্রাক্‌শর্ত। প্রণালীবদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ছাড়া জীবন থেকে উৎসারিত সাহিত্যতত্ত্বের গভীরে প্রবেশাধিকার পাওয়া যায় না। এই উপলব্ধি অর্জনের জন্যে কোনো সরলীকৃত সহজিয়া মার্গ নেই।

আরো একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তত্ত্বের অনুধাবন মানে জীবনের অনুধাবন আর জীবনের অনুধাবন মানে সময়-চিহ্নিত পরিসরের অনুধাবন। এইজন্যে কোনো সাহিত্যতত্ত্বই সময় ও পরিসর নিরপেক্ষ নয়। ফলে বিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যতত্ত্বের উদয়, বিকাশ ও অস্তকে বুঝে নিতে হয়। বিশ শতকের গোড়ায় যে-সাহিত্যতত্ত্ব প্রাসঙ্গিক ছিল, একুশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। নতুন সময় নিয়ে এসেছে নতুন প্রয়োজন, নতুন বিনির্মাণ, তত্ত্ব ও প্রয়োগের নতুন বিন্যাস। অবশ্য এই সঙ্গে এও মনে রাখতে হয় যে গ্রহীতার দেশ-কালজাত যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয় কোন্ তত্ত্ব কতটা স্বীকৃত, বর্জিত, পরিমার্জিত, পুনর্বিন্যস্ত হবে।

যেমন ধরা যাক্ প্রতীচ্যের আধুনিকতা বিষয়ক আকল্প ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে, বিশেষ ভাবে বাঙালির ভাববিশ্বে, অনেকখানি পুনর্বিন্যস্ত হয়েছিল। বিলম্বিত পুঁজিবাদের পর্যায়ে আধুনিকোত্তরবাদের সূচনা হলো যখন, বাঙালির চেতনায় তার অভিঘাত বহুধা বিচ্ছুরিত হলো। নয়া ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির মধ্যেও এত দ্রুত পটপরিবর্তন হয়ে চলেছে যে গত দুই দশকে উত্তরাধুনিকতা ও আধুনিকোত্তরবাদী চিন্তার সহাবস্থান আমরা লক্ষ করেছি। এই বিতর্ক এখনও অমীমাংসিত । প্রবল অনিশ্চয়তা ও কেন্দ্র-বিচ্যুতির আবহে এমন ধরনের আশ্চর্য নতুন সাহিত্যিক পাঠকৃতি রচিত হয়ে চলেছে যে এদের বিশ্লেষণ করতে গেলে পুরোনো পাঠাভ্যাস সংহিতায় আর কুলোচ্ছে না। প্রাসঙ্গিক তত্ত্বের উপযুক্ত সমর্থন ছাড়া এখন কোনো ধরনের প্রতীতি অসম্ভব।

পাঁচ

মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস ঠিক কী কী কারণে পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক উপন্যাসকল্প রচনার ভিড় থেকে আলাদা—প্রথাসিদ্ধ বিশ্লেষণ দিয়ে তার নাগাল পাওয়া অসম্ভব। তেমনি ভোগবাদ ও সাংস্কৃতিক রাজনীতির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যাঁর অধিগত, কেবলমাত্র তেমন সমালোচকই গত চার দশকের সাহিত্যিক পণ্যের প্রাতিষ্ঠানিক ও অনান্দনিক চরিত্র যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন। আমাদের আধুনিকতার ঔপনিবেশিক চরিত্র যাঁর কাছে স্পষ্ট, তিনিই কেবল বাংলা কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটকে অভিব্যক্ত ব্যাধির সংক্রমণ শনাক্ত করতে পারেন। কাকে বলে চিহ্নায়ন প্রকরণ, এসম্পর্কে কোনো ধারণাই যাঁর নেই, তিনি কীভাবে কবিতার ভাষায় শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের যুগলবন্দির তাৎপর্য বুঝবেন! জীবনানন্দ-শঙ্খ ঘোষ- শক্তি চট্টোপাধ্যায়- জয় গোস্বামী-রাহুল পুরকায়স্থ-মন্দাক্রান্তা সেনদের চেতনাবিশ্ব কেন পরস্পরভিন্ন, চিহ্নবিজ্ঞানের উদ্ভাসন ছাড়া সম্পূর্ণ অধিগত হওয়া অসম্ভব। আখ্যানের সময় ও পরিসরের দ্বিরালাপ যদি না বুঝি কিংবা ঔপনিবেশিক কাহি নি বয়নের ধরনকে প্রত্যাখ্যান করার তাগিদকে যদি তত্ত্বগত ভাবে বুঝে না নিই — ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, দেবেশ রায়, কমল কুমার মজুমদার, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, নবারুণ ভট্টাচার্যদের কথনবিশ্বের স্বাতন্ত্র্য কখনো উপলব্ধি করব কি ? পাঠকৃতির আকরণোত্তর বিন্যাস ও বিনির্মাণের বহুস্বরিক দ্যোতনা সম্পর্কে যিনি উদাসীন কিংবা পাঠকের সার্বভৌম পরিসর বিষয়ে সাম্প্রতিক চিন্তাধারা থেকে যিনি লক্ষ যোজন দূরে — হাসান আজিজুল হক, রমানাথ রায়, সুবিমল মিশ্র, উদয়ন ঘোষ, কমল চক্রবর্তীদের লেখা পড়া বা না পড়া তাঁর পক্ষে সমান।

তেমনি নারীচেতনাবাদী দর্শন ও নন্দন সম্পর্কে যিনি জিজ্ঞাসু নন, তাঁর পক্ষে সাহিত্যের সমস্ত প্রধান স্থাপত্যের গভীরে বিরাজমান ঋদ্ধ অন্তঃস্বরগুলি অস্তিত্বশূন্য হয়েই থাকবে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবাদ-প্রতিম নাট্যসংলাপের প্রতিধ্বনি করে বলা যায়, অন্ধের কিবা দিন কিবা রাত্রি ! কিংবা, পিতৃতান্ত্রিক বিশ্বাস ও সংস্কারে যেসব লেখিকা আনখশির প্রোথিত, তাঁদের রচনা কেন তাৎপর্যহীন, এর উত্তর পাওয়া সম্ভব শুধু নারীচেতনাবাদের দর্পণে। নারীর আত্মকথামূলক রচনার সাম্প্রতিক আলোচনা থেকে বুঝতে পারি, প্রাসঙ্গিক তত্ত্বভাবনায় নিষ্ণাত হওয়ার ফলেই এতদিনকার অন্ধকার পরিসর ক্রমাগত আলোকিত হয়ে উঠছে। আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবীদের রচনা নবার্জিত শ্রদ্ধা ও মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী, মহাশ্বেতা দেবী, সেলিনা হোসেন, সুচিত্রা ভট্টাচার্যদের চেতনাবিশ্ব কি যথার্থ তত্ত্বভাবনা ছাড়া বিশ্লেষণ করা আদৌ সম্ভব ?

আখ্যানতত্ত্ব ও প্রতিবেদনতত্ত্ব কীভাবে সাম্প্রতিক তত্ত্ববিশ্বের পুরোধা চিন্তাবিদদের অবদানে অভাবনীয় সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, সে-সম্পর্কে উদাসীন থাকার অর্থ নিজেদের মনন- জিজ্ঞাসাকে পঙ্গু করে দেওয়া। বিশ্বায়ন কি কেবল দুনিয়াজোড়া বাজারের হট্টমেলায় ক্রেতা-বিক্রেতা হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্যে ? রবীন্দ্রনাথ যেদিন 'যত্র বিশ্ব ভবতি একনীড়ম্'-এর ভাবকল্প দিয়েছিলেন আমাদের, সেদিনই তো সমস্ত নঞর্থক প্রবণতা মুছে দিয়ে সদর্থক বিশ্বায়নের বার্তা প্রচারিত হয়েছিল। মানববিশ্বে যা কিছু জ্ঞেয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক, তাতে যে-কোনো মানুষের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ। অতএব আখ্যান আর কাহিনির মনোলাভা মায়ামৃগ মাত্র নয় কিংবা প্রতিবেদনও নয় যে-কোনো সন্দর্ভ। মানুষের চিন্তাবিশ্ব থেকে উৎসারিত অজস্র বিচ্ছুরণে আখ্যান ও প্রতিবেদন আজ অনেকান্তিক ও অনেকার্থদ্যোতক। তত্ত্ব-নিরপেক্ষতা আসলে অসাড় চিত্তবৃত্তির লক্ষণ। আজ সর্বব্যাপ্ত রাজনৈতিক অর্থনীতির পেষণে কীভাবে অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে পুরোনো চিহ্নায়ক মুছে গিয়ে চিহ্নায়নের নতুন প্রকরণ জেগে উঠেছে — এবিষয়ে যিনি অবহিত নন, তাঁর পক্ষে আজকের আখ্যান ও প্রতিবেদনের অভিনবত্ব উপলব্ধি অসম্ভব।

দেবেশ রায়ের 'একটি ইচ্ছামৃত্যুর প্রতিবেদন', নবারুণ ভট্টাচার্যের 'যুদ্ধপরিস্থিতি', স্বপন সেনের 'মুখোশ যোদ্ধা', রবিশঙ্কর বলের 'পোখরান ৯৮' ইত্যাদি কেন ঔপন্যাসিকতার নব্য গ্রন্থনার নিদর্শন, তা শুধুমাত্র বিবর্তনশীল আখ্যানতত্ত্বের নিরিখে বুঝে নেওয়া সম্ভব। সত্তর-পরবর্তী ভারতবর্ষের দ্রুত বিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবচেতনা, বহুরৈখিক বাস্তবতা, চেতনার অনেকান্তিকতা কীভাবে লেখক-কথক স্বরের নতুন অন্তর্বয়ন এবং মুক্ত পাঠকৃতির বিশ্বাসে প্রতিফলিত হচ্ছে — তা যখন বুঝে নিই, অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়' ও 'দেবাংশী', ভগীরথ মিশ্রের 'চারণভূমি' ও 'মৃগয়া', সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পক্ষবিপক্ষ' ও 'জলতিমির', ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'স্বজনভূমি' ও 'চরপূর্ণিমা', আফসার আমেদের 'বিবির মিথ্যা তালাক ও তালাকের বিবি এবং হলুদ পাখির কিস্সা' ও 'কালো বোবখার বিবি ও কুসুমের গন্ধ এবং চল্লিশজন লোক' ইত্যাদি উপন্যাসের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করতে পারি। একইভাবে কবিতা ও ছোটগল্প থেকে আমরা নতুন ধরনের নির্যাস পেয়ে যাই। আরো একটি কথা এখানে বলে নিতে চাই। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উদয়ন ঘোষ, সুবিমল মিশ্র, কমল চক্রবর্তী, অজিত রায়, বারীন ঘোষাল, মলয় রায়চৌধুরীর মতো লিখিয়েরা কেন একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে উদ্ভূত হয়েও সমান্তরাল সৃজনশীল পরিসরের সূত্রধার এবং কেনইবা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক চেতনা-বিশ্বের পক্ষেও তাঁরা প্রত্যেকে নিজস্ব অপরতার সন্ধানী—এই মীমাংসা উপযুক্ত তত্ত্বের সাহায্য ছাড়া অসম্ভব।

বস্তুত শুধুমাত্র বাংলা কথা-সাহিত্যেই নয়, গত দুই দশকে প্রবন্ধ-সাহিত্যেরও আমূল রূপান্তর ঘটে গেছে। এতদিন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনে রচিত ও তথাকথিত সৃষ্টিশীল প্রেরণায় রচিত প্রবন্ধের মধ্যে জলবিভাজন রেখা তৈরি করে অকারণ কূট বিতর্ক চলত। কিন্তু রোলাঁ বার্ত, জাক দেরিদা ও জাঁ বদ্রিলারের কল্যাণে সৃষ্টিশীলতার সংজ্ঞা আমূল বদলে গেছে। প্রাগুক্ত জলবিভাজন রেখা এখন পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। কেন এই মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেছে, এর উত্তর রয়েছে সাম্প্রতিক বিশ্বপরিস্থিতিতে। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিসর যখন যন্ত্র-প্রযুক্তির দৌলতে খোলনলচে পাল্টে ফেলেছে এবং নতুন নতুন চিহ্নায়ন প্রকরণ তৈরি হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রে ও প্রতিটি চিন্তা-প্রস্থানে, সে-সময় প্রবন্ধের প্রতিবেদনও বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক হতে বাধ্য। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় অভ্যস্তজনেরা অজস্র কুম্ভের ভূমিকা নিয়ে নকল বুঁদির গড় রক্ষায় ব্যস্ত। তফাত অবশ্য একটু আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কুম্ভ কাউকে কটু-কাটব্য করেনি, অকারণ হিংস্রেতায় কিংবা অসূয়ায় কাউকে আঘাত করা দূরে থাক, দাঁত খিঁচানোর কথাও ভাবেনি। কিন্তু যারা প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা বিদ্যাচর্চার দ্বারপাল, সময়ের দাবি অবচেতনে বুঝতে পেরে কিন্তু সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যান করে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠছে। পায়ের নিচে জমি দ্রুত সরে যাচ্ছে, তা অনুমান করেও দুর্মর অভ্যাসের শেকল ভেঙে তত্ত্ববিশ্বের নতুন সত্যকে স্বীকার করতে পারছে না। তাদের তত্ত্বশূন্য রচনা পুঞ্জ পুঞ্জ কথার ফানুস বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে ভেবে সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব ধরনের তাত্ত্বিক রচনার ওপর।

সময়ের পাঠ গ্রহণে অনিচ্ছুক ঐসব ছদ্মপড়ুয়াদের সংঘ-রচনার জন্যে সাহিত্য থেকে আজ জীবন নির্বাসিত। সাহিত্যের বিশ্লেষণে সমাজতত্ত্ব, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস ইত্যাদির গুরুত্ব এইসব রক্ষণশীলজনেরা মৌখিকভাবে স্বীকার করেন হয়তো, কার্যত কিন্তু বহু প্রজন্মলালিত চিন্তার অচলায়তন থেকে এঁরা একচুলও সরে আসেন না। রবীন্দ্রনাথের গোরা, রক্তকরবী, কালান্তর এবং এরকম অন্যান্য বই তাঁদের জন্যে কখনো অনেকার্থদ্যোতক পাঠকৃতি হয়ে ওঠে না। শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে প্রতি মুহূর্তে বাংলা বিদ্যাচর্চা নিহত হচ্ছে তাই। আমাদের যে-কোনো সহজিয়া পাঠ তাই ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে নিরালম্ব বায়ুভুক ফানুসের মতো শূন্যে মিলিয়ে যায়। জ্ঞানতাত্ত্বিক ও অস্তিত্বতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা জাগিয়ে দিয়ে যেসব তত্ত্ব-ভাবনা জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার মতো অভ্যাসের জাড্য ও অন্ধকার দূর করে দেয়, তাতে আমাদের বড়ো ভয়। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা, বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের বিপুল দৈন্যের মধ্যেও এমন কয়েকজন চিন্তাবিদকে পাওয়া গেছে, যাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রবন্ধ কেবল নির্দিষ্ট বিষয়ের গণ্ডিতে রুদ্ধ রচনা মাত্র নয়। তাঁদের বয়ানে মিশে থাকে দার্শনিক চিন্তার দ্যুতি, সমাজতত্ত্বের নির্যাস, ইতিহাসের চলিষ্ণুতা।

ছয়

শঙ্খ ঘোষের প্রবন্ধে আমরা যে-ধরনের পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, তা কি কেবল বিষয়গৌরবে আমাদের আকৃষ্ট করে ? নাকি তার প্রতিটি বাক্যে গভীর দার্শনিক বাচনের দ্যুতি বিকীর্ণ হয় ? অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রবন্ধে বিপুল মানব-বিশ্বের অনেকান্তিক অভিজ্ঞতা কি একনীড় হয়ে ওঠে না ? প্রবন্ধ মানে জিজ্ঞাসার বয়ন; মীমাংসার ছলে আরো জিজ্ঞাসা উসকে দেওয়া । মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন প্রাঙ্গন থেকে কুসুম চয়ন করে একটি মালা গেঁথে নেওয়াই প্রাবন্ধিকের অন্বিষ্ট। বিষয় সাহিত্য হোক বা না হোক, প্রবন্ধকে সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন অর্থাৎ নান্দনিক বোধে ঋদ্ধ হতেই হবে। আর, দার্শনিক উপলব্ধির সূত্রায়িত বিন্যাস ঘটবে তাতে। আমরা যখন প্রবন্ধ পড়ব, চেনা জগতের অচেনা আদল খুঁজে নিতে চাইব। অতি পরিচিত জগৎ ও জীবনের অভ্যস্ত ব্যাখ্যা পেয়ে যারা সন্তুষ্ট, প্রবন্ধ তাদের জন্যে নয়। প্রবন্ধ পড়ে প্রাবন্ধিকের সঙ্গে একমত হতে হবে, তা কিন্তু নয়। তিনি সাহিত্য ও সমাজ কিংবা সাহিত্য ও দর্শন কিংবা সাহিত্য ও ইতিহাসের বহুমাত্রিক যুগলবন্দি উপলব্ধি করবেন ঃ এইটুকুই শুধু প্রত্যাশিত। তার মানে, কোনো প্রবন্ধে যদি কোথাও কোনো তত্ত্ববীজ তাত্ত্বিক বয়ানের মধ্যে বিকশিত না হয়, তাহলে তা 'প্রবন্ধ' অভিধার যোগ্যই নয়।

কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিকেরা যখন নিজেদের সৃজনী অভিজ্ঞতার নিরিখে সাহিত্যের হওয়া ও হয়ে ওঠা নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন, তাঁদের রচনায় ভিন্ন মাত্রা নিশ্চয় প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁদের কাছেও আমরা চাইব দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা। সব সময় আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হয়, একথা অবশ্য বলা যায় না। জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রনাথ-বিষ্ণু দে উত্তম প্রাবন্ধিক ছিলেন। তাঁদের বয়ানে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, নান্দনিক ভাবাদর্শ ও সময়-চেতনার অভিব্যক্তি দেখেছি। নিবিড় পুনঃপাঠে তাঁদের প্রবন্ধ থেকে নানা ধরনের তত্ত্ববীজ আবিষ্কার করা সম্ভব। শঙ্খ- অলোকরঞ্জনের কথা আগেই লিখেছি। এছাড়া দেবেশ রায়, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রবন্ধেও সমান সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই তালিকা দীর্ঘ নয়। 'কবিতার কথা', 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', 'সংস্কৃতির ভাঙা সেতু' দার্শনিক মননে কতখানি ঋদ্ধ, তা আজও আমরা ভালো ভাবে লক্ষ করিনি। আসলে আমাদের সাহিত্যিক পাঠকৃতির ঐতিহ্যে 'কবি ক্রান্তদর্শী' কিংবা 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ' ইত্যাদি নিছক প্রাজ্ঞোক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

বলা ভালো, কথার কথামাত্র হয়ে থেকেছে। এইসব উচ্চারণের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়তো করেছি, কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত গভীর তাৎপর্য কতটা সুদূরপ্রসারী, তা তলিয়ে ভাবিনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' প্রভৃতি নিবিড় তাত্ত্বিকতায় পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বজিজ্ঞাসা ও জীবনজিজ্ঞাসা কীভাবে

সমর্থক হয়ে ওঠে, তা যদি ভালোভাবে লক্ষ করতাম, তাহলে আমাদের রবীন্দ্র-পাঠ প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার চক্রব্যূহে রুদ্ধ হয়ে যেত না। সব জিনিসকে টুকরো-করে-আনা আমাদের পদ্ধতি বলে রবীন্দ্রচর্চা আজও অসম্পূর্ণ। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে বলে শতবর্ষের ঢাকঢোল সত্ত্বেও জীবনানন্দচর্চাও অসম্পূর্ণ। তেমনি অন্য সব লিখিয়েদের রচনা-পাঠও ছ'জন অন্ধের হাতি দেখার কথা মনে করিয়ে দেয়। তবও চেতনাকে আমরা কখনো যথাযথ গুরুত্ব দিতে শিখিনি বলে আমাদের যাবতীয় সাহিত্যপাঠ হয়ে রইল অর্ধমনস্ক, লক্ষ্যশূন্য ও অগভীরতায় আক্রান্ত। তাসের দেশের সেনাদের মতো নিয়ম মাফিক পা তুলে পা ফেলে খড়ির গণ্ডির মধ্যে আমরা প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে তৃপ্ত থাকতে চাই। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম লক্ষ করলেই শুচিবায়ুগ্রস্ত তর্জনি উদ্যত হয়ে ওঠে। কোথাও বা বিহ্বল কণ্ঠ অভিযোগ করে : 'আমি যে তোর ভাষা বুঝি নে !' আসলে, ভাষা সংযোগ সাধনের মাধ্যম হলেও তাতে যে অধিকারী অনধিকারীর ভেদ অবশ্যস্বীকার্য, একথা প্রায়ই ভুলে যাই। সংযোগ হতে পারে শুধু দক্ষ দাতা ও প্রস্তুত বা উপযুক্ত গ্রহীতার মধ্যে। মনে পড়ে 'বিসর্জন' নাটকের একটি বিখ্যাত সংলাপ—

'জয়সিংহ জানো কি একেলা কারে বলে ?
অপর্ণা জানি, যবে বসে আছি ভরা মনে—
দিতে চাই, নিতে কেহ নাই !'

যিনি নেবেন, তাঁকে তো নেওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিতে হবে। মা-ঠাকুরমার কোলে শুয়ে বেঙ্গমা-বেঙ্গমির গল্প শোনা যেতে পারে ; কিন্তু বয়স্ক কালের কথাতেও কি একই ধরন সম্ভব ? পরিণত বয়ানের জন্যে আবশ্যিক পরিণত মন। মুশকিল এই অনেক পরিণত শরীরে অপরিণত মন লুকিয়ে থাকে। কারো কারো শৈশব, কৈশোর কিছুতেই কাটতে চায় না। কেউ কেউ আবার জেগে জেগে ঘুমোতে অভ্যস্ত ; কোনোভাবেই এদের ঘুম ভাঙে না। চারদিকে ঘটনার ঘনঘটা যত আবর্তন তৈরি করুক, দৈশিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি চোখের সামনে যত ওলট পালট হয়ে যাক, ব্যক্তির পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থানে যত জটিলতাই দেখা দিক — চোখের ঠুলি অনড় হয়ে এঁটে থাকে। চোখ খুলে দেখাতে চাইলেও এরা দেখতে নারাজ। মান্ধাতার আমলে যেভাবে পড়া, জানা, বোঝা চলত, তেমনি চললেই ভালো, এই হলো এদের অভিপ্রায়।

যে-ভাষা খবরের কাগজে নিত্যদিন ব্যবহৃত হয়, সাহিত্য-বিশ্লেষণেও এঁরা সেই একই ভাষা প্রত্যাশা করেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যদিও মোক্ষম কথা লিখে গেছেন —'যে দুরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে, তার জন্যে কবিকে দোষারোপ করা অন্যায়' — তবু কোনো ইতরবিশেষ হয়নি। বিনা আয়াসে সব বুঝে নেব, সমস্তই হবে জমা-খরচের হিসেবের

মতো প্রাঞ্জল — এই মনোভঙ্গির কোনো বদল নেই। ব্যতিক্রম মাত্রেই উৎপাত হিসেবে নিন্দনীয়।

সমস্যার মূল কারণ, নতুন কিছু পড়তে অনীহা আর নতুনভাবে চিন্তা করতে আপত্তি। যখন প্রচলিত বিদ্যাচর্চা ও চিন্তাপ্রস্থানের সীমানা মুছে যাচ্ছে, সাহিত্যিক প্রতিবেদন কি নতুন কালের বার্তাকে 'ওকে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছিঃ, ওযে চণ্ডালিনীর ঝি, নষ্ট হবে যে দই-সেকথা জানো না কি' বলে ছোঁয়া-বাঁচানো দূরত্বে চলে যেতে পারবে ? দর্শন-ইতিহাস-সমাজতত্ত্ব-রাজনৈতিক অর্থনীতি-বিজ্ঞানের সংশ্লেষণে যে অনেকান্তিক সন্দর্ভ তৈরি হয়ে চলেছে, তার বহুস্বরিক তাৎপর্য উপলব্ধির জন্যে সাহিত্যকেও নানা ধরনের তাত্ত্বিক আয়ুধে সজ্জিত হতে হচ্ছে। যে কেউ এই অনিবার্য সত্যকে অস্বীকার করছে, সে আত্মঘাতী হচ্ছে মাত্র। ভাষা দুরূহ নয়, দুরূহ হচ্ছে এই সময় ; দুরূহ নয়, দুর্বোধ্য। কিন্তু মানুষ তো অপরাজেয় সৈনিক ; সে এই দুর্বোধ্যতায় ত্রস্ত হবে কেন ? বরং গোলকধাঁধায় প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের জন্যে নতুন নতুন দিশা খুঁজে নেবে। এই দিশা খোঁজার অভিব্যক্তি হলো তত্ত্ব। সাহিত্য যেহেতু স্বভাবত জীবন-ঘনিষ্ঠ, তার প্রতিটি বয়ানে থাকবে তাত্ত্বিকতার মোহর। কখনো তা স্পষ্ট আর কখনো আভাসিত, এই মাত্র তফাত। যাকে সাহিত্য বলছি তা আসলে দর্শন। এই দর্শনে ব্যক্তি উপলক্ষ মাত্র, সমাজই প্রকৃত অন্বিষ্ট। অতএব এমন বাচন ব্যবহৃত হবে সাহিত্যে যা শুধু বর্ণনা দিয়ে ফুরিয়ে যাবে না, ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তুলবে পরাবাচনের আভা। একক বাচনের সঙ্গে সামূহিক বাচনের দ্বিরালাপ হবে ঐ বয়ানের প্রধান আধেয়। এ কোনো তত্ত্বকথা নয়, এ হলো চলমান জীবন থেকে পাওয়া অনুভূতির নির্যাস।

এইজন্যে সাহিত্যিক প্রতিবেদনে অভিব্যক্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসায় পরিভাষার গ্রন্থনা অনিবার্য। পরিভাষা মানে তো কঠিন করে বলা কথা নয় ; চিন্তার যে বীজতলিকে অন্য কোনোভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, পরিভাষা হলো তার একমাত্র আশ্রয়। পরিভাষা থেকে অর্থের বহুধা বিচ্ছুরণ লক্ষ করে শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই ; একে বরং তার ঐশ্বর্যের দ্যুতি হিসেবে বন্দনা করাই কাম্য। পরিভাষার গ্রন্থনা যাঁদের কাছে দুরূহ, তাঁরা অনুগ্রহ করে অধ্যবসায়ী হোন। বাংলা ভাষার একটু দূরবর্তী উৎসধারায় তাঁরা অবগাহন করুন। প্রাথমিক দ্বিধা কেটে গেলেই বুঝবেন, কী অসামান্য সম্ভাবনার বীজতলি তাঁদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কিছুদিন আগে অন্য একটি প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম একটি প্রত্যয়ের ঘোষণা হিসেবে, আরো-একবার তা ফিরিয়ে আনছি : কোনো সূক্ষ্ম ও গভীর ভাব-বিচ্ছুরণ প্রচলিত ভাষায় কুলোয় না। তাই ভাষার ভিত্তি খুঁড়তে হয়। প্রসারিত করতে হয় অন্তর্বৃত ক্রিয়াপদের সম্ভাবনা। এমন কি উপসর্গের বা প্রত্যয়ের একক ও যুক্ত তাৎপর্য পুনর্নির্মাণ করতে হয়। কখনো কখনো ফিরে যেতে হয় প্রাতিপদিকের আদি পরিসরে। সব কিছুই

আছে ভাষার গভীরে, তাকে কেবল পুনর্গঠন ও পুনরাবিষ্কার করে নেন পরিভাষা-ভাবুকেরা। পৃথিবীতে দ্রুত তত্ত্বচিন্তার পরিধি বেড়ে যাচ্ছে। খুলে যাচ্ছে শাখাপথের দিগন্ত। শুধুমাত্র ভাষাতত্ত্ব আর সাহিত্যতত্ত্বে দেখতে পাচ্ছি কত বিচিত্র আয়তন। ইউরোপীয় ভাষাবিশ্ব আজ বাঙালির নিজস্ব ভুবনেও নতুন নতুন প্রবণতার বীজাধান করছে। চিন্তার বিশ্বায়নের যুগে পুনর্নির্ধারিত হচ্ছে সমাজ-সংস্কৃতি-ইতিহাস বিষয়ক সীমান্তের ধারণাও। অপরিচিত ভাববীজ ভাষার পুরোনো আকরণে গৃহীত হতে পারে না। তার জন্যে চাই পুরোপুরি নতুন উদ্যম, নতুন সংহিতা, নতুন কৃৎকৌশল। পরিভাষা এইজন্যে আবশ্যিক এখন ।অপরিচয়ের দূরত্ব প্রথম পাঠে কিছুটা বাধা তৈরি করবেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপত্তি বিরোধিতা পর্যন্ত গড়াবে। ভাবের দুরূহতাকে ভাষার দুরূহতা বলে মনে করেন কেউ কেউ। বারবার পড়া ছাড়া এই ভ্রম কাটিয়ে ওঠার অন্য পথ নেই কোনো। পরিভাষা যখন সার্থক, তাতে লক্ষ করি বহুস্বরিকতা। একে যদি বুঝে নিই সতর্কভাবে, দুরূহতা সংক্রান্ত আপত্তি খুব বেশি দিন টিকবে না। গত কয়েক বছরে বাঙালি তত্ত্বচিন্তায় নিবিষ্ট থেকে নিবিষ্টতর হচ্ছে। এসময় তাই ভাষাচেতনার নয় শুধু, পরিভাষাচেতনারও।

এরপর সম্ভবত খুব বেশি কথা বাকি থাকে না। এইটুকু শুধু বলার যে পরিভাষা কোনো সত্যিকারের অধ্যবসায়ী পড়ুয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। অভ্যাসের অবিরল প্রবাহে তা ছেদ তৈরি করে বলে যাঁরা হোঁচট খাচ্ছেন, তাঁদের শুধু সময়ের অভিজ্ঞান ও দাবি বুঝে নিতে হবে। জীবনযাপনে সব কিছু যখন বদলে যাচ্ছে, সাহিত্য-পাঠ বিশ্লেষণ-পদ্ধতিও বদলাতে বাধ্য। তত্ত্ব তো ঐ রূপান্তরকে চেনার জন্যে, প্রবহমানতা ও পরিবর্তনের দ্বিরালাপকে বোঝার জন্যে। তত্ত্বকে যষ্ঠির মতো নয়, প্রদীপের মতো ব্যবহার করাই বিধি। আর, সেই প্রয়োগ করাও হচ্ছে। প্রদীপে যষ্ঠিভ্রম তো রজ্জুতে সর্পভ্রমের চেয়েও মারাত্মক। তত্ত্ব সূর্যের মতো নিরপেক্ষ, পর্বতে ও সমভূমিতে তার আলো ও উত্তাপ সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যেখানে কুয়াশা ও অন্ধকার, সেখানে তত্ত্ব আলো দেয় দৃষ্টিকে লক্ষ্যাভিমুখী করার জন্যে। আর, যেখানে আলোর আভাস থাকলেও তা অপরিস্ফুট, সেখানে তত্ত্বের কাজ উজ্জ্বলতা ও তীক্ষ্ণতা বাড়িয়ে দেওয়া। অন্ধকার ঘরেও একটি কোণে প্রদীপ জ্বালালে তা যেমন পুরো ঘরকে আলোকিত করে, তেমনি সাহিত্যতত্ত্বও সম্পূর্ণ প্রতিবেদন বা পাঠকৃতিকে উদ্ভাসিত করে তোলে। অনেক প্রচ্ছন্ন তাৎপর্য তখন দৃষ্টিগোচর হয়, সামান্যের অন্তরালে আবিষ্কৃত হয় বিশেষের অস্তিত্ব।

নিজেদের বিশ্বাসে, অভিজ্ঞতায়, অনুভূতিতে তত্ত্বের উপস্থিতি যখন হৃৎস্পন্দনের মতো স্বাভাবিক হয়ে যায় — তখন সাহিত্যপাঠ কেবল শ্রম ও অধ্যবসায়ের বিষয় থাকে না। তা হয়ে ওঠে কুঁড়ি থেকে ফুলের জেগে ওঠা দেখার মতো আনন্দদায়ী প্রকরণ। আরো

নিবিড় ভাবে চিনি নিজেকে, জগৎকে, সম্পর্কের রুদ্ধ ও মুক্ত বিন্যাসকে। সাহিত্য-পাঠ ও জীবন-পাঠের যুগলবন্দিকে তখন আর কষ্ট করে বুঝতে হয় না। সাহিত্যতত্ত্বের তত্ত্ব অর্থাৎ পরাতত্ত্ব নিয়ে কোনো বাগ্‌বিস্তার না করেও বলা যায়, প্রকৃত জীবন আর কল্পিতজীবনের মধ্যে প্রলম্বিত সব অদৃশ্য পর্দা সরিয়ে দেওয়া সাহিত্য-তত্ত্বের অন্যতম লক্ষ্য। প্রকৃত জীবন যতক্ষণ স্পষ্ট না হচ্ছে, অন্তত ততক্ষণ বিশ্লেষণী সমালোচনা পথ ও পাথেয় খুঁজে পাবে না।

সমালোচক তত্ত্বের দর্পণে নিজেকে দেখেন আবার সমান্তরালভাবে সাহিত্যকেও দেখেন। তত্ত্ব ও জীবনের মধ্যে দ্বিমেরুবিষমতা ভ্রান্ত ধারণা। বস্তুত সমগ্র সামাজিক জীবনই তো কোনো-না-কোনো ভাবে তাত্ত্বিকতার আধার। তেমনি তত্ত্বও বাস্তব সামাজিক প্রক্রিয়া। আমরাই তাকে অকারণে বিমূর্তায়িত করে তুলি। সাহিত্যতত্ত্ব পৃথিবীকে তাৎপর্য-বিশ্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। সারাজীবন ধরে জেনে বা না জেনে আমরা কেবল চিহ্নায়ক তৈরি করি। আমাদের এই স্বাভাবিক মানবিক প্রক্রিয়াকে সাহিত্যতত্ত্ব প্রণালীবদ্ধভাবে তুলে ধরে এবং প্রসঙ্গ ও প্রেক্ষিতের দ্বিবাচনিকতায় যাবতীয় তাৎপর্যকে পরীক্ষা করে।

মানব-বিশ্বে তত্ত্ব দৃষ্টিশক্তির মতোই অপরিহার্য। অনবরত মুছে যাওয়া আর নতুনভাবে তৈরি হওয়া চিহ্নায়ন প্রকরণকে সংহত, সুস্থির ও দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার জন্যেই সাহিত্যতত্ত্ব। এমন নয় যে কোনো তত্ত্ব বৈপ্লবিক আর কোনো তত্ত্ব রক্ষণশীল। ব্যবহার-উপযোগিতার ওপর নির্ভর করে, জীবন-ব্যাপ্ত সন্ধানে কোন্ তত্ত্ব অন্বিষ্টের দিকে আমাদের কতটা এগিয়ে দেবে ! এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি মীমাংসার অভ্যাস চাই, নাকি এক জিজ্ঞাসা থেকে অন্য জিজ্ঞাসায় বয়ে যেতে চাই ?

আরব্য রজনী ঃ কল্পকথার ক্রমপাঠ

'You know what a miracle is .... another world's intrusion into this one. Most of the time we coexist peacefully. but when we do touch there's cataclysm.'

আধুনিকোত্তর আখ্যান-প্রণেতা টমাস পিনশোঁ তাঁর বহুচর্চিত বয়ান 'The crying of lot 49'- এ (১৯৬৬) লিখেছিলেন এমন। কেন বহু শতাব্দী ধরে বহু প্রজন্মের সমবায়ী উদ্যমে উদ্ভূত আরব্য রজনীর কল্পকথা প্রসঙ্গে মনে এল সাম্প্রতিক ভাবনা-প্রসূত উচ্চারণ? তাহলে কি পাঠ-পরম্পরার অজস্র প্রবেশবিন্দু ও নির্গমবিন্দুতে এমন কিছু রয়েছে যাতে পরস্পরবিরোধী জগতের, বাস্তব ও অবাস্তবের, স্বপ্ন ও ইচ্ছাপূরণের সহাবস্থান সম্ভব ?

আপাতত মুলতুবি থাকুক এই আলোচনা। বরং ভাবি, মধ্যযুগীয় এই রচনাপুঞ্জের পুনঃপাঠ কেন, কীভাবে করব আজ ? প্রাচ্যতত্ত্ব নাকি উপনিবেশোত্তর চেতনার নিরিখে আখ্যানের ভেতরে আখ্যান এবং সেই আখ্যানেরও ভেতরে আরো আখ্যান সন্নিবিষ্ট হওয়ার নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব ? অথবা, এই পাঠ-সমবায়ে খুঁজব প্রত্ন-আধুনিকোত্তর আখ্যানের দূরবর্তী সম্ভাবনা! কিংবা, কিছুই না-খুঁজে শুধু উদ্ভটের অন্তহীন মায়ায় মুগ্ধ হব ? কিন্তু এইসব দ্বিধান্বিত জিজ্ঞাসা কোন পাঠকের ! তত্ত্ববিশ্বে নিঃশ্বাস নিয়ে অলৌকিকের রহস্যনিবিড় প্রাসাদে বিচরণ করা যায় হয়তো। কিন্তু কীভাবে ভুলব যে অনেকের কাছেই আরব্যরজনী নিছক শৃঙ্খলমুক্ত যৌনতার কার্নিভাল !

মনে পড়ে, এই বইটি আমাব কাছে প্রথম পৌঁছেছিল বয়স্ক-পাঠ্য নিষিদ্ধ বই হিসেবে। নবম বা দশম শ্রেণিতে, সহপাঠীদের মধ্যে অসমবয়স্ক ও ডেঁপো হিসেবে কুখ্যাত একজন, জীবন-প্রণালী সম্পর্কে 'শিক্ষিত' কবে তোলার অভিপ্রায়ে, মলাটে-মোড়া বইটি আমাকে দিয়েছিল। কয়েক পৃষ্ঠা পরে-পরে তাতে ছিল বিহ্বলতার চিত্রল উপাদান; শরীরে-মনে অস্বস্তি কিংবা অস্বস্তির কুহক এনে-দেওয়া বই বাড়িতে, জাগ্রত-চক্ষু অভিভাবকদের উপস্থিতিতে, আনা যাবে না : এই সারসত্য বুঝেছিলাম। ইস্কুলে টিফিনের সময় অন্য সব বিবেচক সহপাঠীদের কৌতূহল এড়িয়ে যতখানি পড়া সম্ভব, পড়েছিলাম। সেই আমার প্রথম পাঠ, উত্তেজক কিন্তু অসম্পূর্ণ। আলো-আঁধারি বয়ঃসন্ধি পেরোনোর পরে, কলেজে পড়ছি যখন, হাতে আবার এল আরব্য রজনী। তখনকার পাঠ সম্পূর্ণ হলেও মিশ্র অনুভূতি হয়েছিল। স্নাতক শ্রেণিতে ইংরেজি সাম্মানিক পড়ছি বলেই হয়তো রুচির নতুন পাঠে বাধছিল। মনে হয়েছিল, সম্ভবত, এ তো সামঞ্জস্যশূন্য রচনা। একদিকে শৈশবের অমল রূপকথা, অন্যদিকে বয়স্কজনের নিষিদ্ধ ফল। সে-সময় প্যারাডাইস লস্ট পড়ছি ; অতএব

স্যাটানের হাতছানি সম্পর্কে সতর্ক থাকার জন্যে তারুণ্যের পক্ষে বিষমানুপাতিক অবস্থান নিয়েছিলাম।

তারপর তো এক জীবনে ঘটে গেল রুচি ও ভাবনার জন্ম-জন্মান্তর। হয়তো এরকমই হয়ে থাকে সমস্ত পাঠকের। আরব্য রজনীর ক্ষেত্রে সম্ভবত একটু বেশি কেননা এ তো একক গ্রন্থ মাত্র নয়, মধ্যপ্রাচ্যের লোকায়ত গ্রন্থাগার। মধ্যযুগীয় আরবি সাহিত্যে নয় কেবল, যে-কোনো সাহিত্যে এ জাতীয় রচনা দুর্লভ। 'আরব্য রজনী'র সঙ্গে তুলনীয় শুধু আরব্য রজনী। তত্ত্ববিদেরা জানিয়েছেন, একে বলা যায় 'Sui generis'! কত স্বতন্ত্র উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে অজস্র আখ্যান এসে মিশেছে একই মোহনায়, তার ইয়ত্তা নেই। কাহিনিগুলি পুনঃকথিত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে কত অসংখ্যবার, তা এখন অনুমান-সাপেক্ষ শুধু। তাই এর সারমর্ম করাও সম্ভব নয়। স্থাপত্যমালার অন্তহীন উচ্চাবচতাকে প্রচলিত অর্থে 'বৈচিত্র্য' বলেও ব্যাখ্যা করা যাবে না। লাতিন আমেরিকার প্রসিদ্ধ কথাকার হোর্হে লুই বোর্হেস 'Seven Nights' (নিউইয়র্ক : ১৯৮০ : ৫৪) বইতে এই মন্তব্য করেছেন : 'To erect the palace of The Thousand and One Nights, it took generations of men, and those men are our benefactors, as we have inherited this inexhaustible book, this book capable of so much metamorphosis.'

বোর্হেস-ব্যবহৃত এই সুপ্রযুক্ত বিশেষণকে (inexhaustible) আমরা, ভারতীযেরা, নিজেদের সাংস্কৃতিক বীক্ষা অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারি অতলান্ত গভীরতা বা সীমাহীন দিগন্ত বলে ; অথবা বলতে পারি অক্ষয় তূণীর বা দ্রৌপদীর অন্তহীন শাড়ির প্রতিমান। নিরবচ্ছিন্ন চলমানতাই এর অভিজ্ঞান। মহাসময়ের পরিধি থেকে হঠাৎ, যে-কোনো মুহূর্তে, উৎক্ষিপ্ত হতে পারে আখ্যান। আবার তেমনই ঐ মহাসময়ের পটে যে-কোনো মুহূর্তে বিলীনও হয়ে যেতে পারে। রয়ে যায় শুধু এই প্রতীতি, আখ্যানমালার কোনো আনুষ্ঠানিক আরম্ভ নেই, শেষও নেই। অনন্ত বিস্তারের যে-কোনো পরিসর থেকে কিছু কথকতা যদি বা গ্রহণ করি, অতলান্ত ও অক্ষয় পাঠকৃতি যেমন ছিল তেমনই থাকে। এক পাঠ থেকে অন্য পাঠে, অজস্র অন্তর্বয়নের তন্তুজাল ছড়াতে-ছড়াতে যখন ভাবছি বহুদূর এগিয়ে এসেছি — তখনই হয়তো মায়া ভেঙে যায়। আবিষ্কার করি, আসলে এতক্ষণ অন্যতর সুষুপ্তির মধ্যে ছিলাম ; আখ্যানের যাত্রা প্রকৃতপক্ষে ছিল যাত্রার অবভাস। ভারতীয় পাঠকেরা যখন গুণাঢ্যের বৃহৎকথা বা সোমদেবের কথাসরিৎসাগর পড়েন কিংবা যখন পঞ্চতন্ত্র বা হিতোপদেশের মুখোমুখি হন — তাঁর সামনে কি সাতমহলা প্রাসাদের সারি-সারি দরজা উন্মোচিত হয় না? আর, যখনই তিনি সাহসী উদ্যম নিয়ে কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে, অলিন্দ থেকে অলিন্দে পরিক্রমা করতে থাকেন — কখন যেন পথরেখা মুছে যায়। জেগে থাকে শুধু অবিরাম অফুরান চলার স্মৃতি।

দুই

মধ্যপ্রাচ্য ও ভারত তাহলে কি দূরবর্তী অতীতে অভিন্ন সামূহিক কল্পনার উত্তরসূরি ছিল ? গল্পের ভেতরে গল্প সন্নিবেশের এই প্রক্রিয়া দিয়ে কি কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধেরা কাহিনির তৃষ্ণা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে মহাসময়ের বিপুলতা ও গভীরতাকে ছুঁতে চাইত ? এরকম আরও অনেক প্রশ্নের সম্ভাব্য মীমাংসার জন্যে আমাদের যেতে হবে মূলত আরব্য রজনীর পাঠ-পরম্পরার কাছে। কেননা নির্মাণের ইতিহাসে প্রচ্ছন্ন রয়েছে সমবায়ী বয়ানের নির্যাস। অসংখ্য প্রজন্ম তাদের ভিন্ন-ভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিসরের স্মৃতি বহন করেছে ; বারবার পুনর্লিখন করেছে।

উনিশ শতকে মিশর, ভারত ও জার্মানিতে এই বইয়ের যে-সব আরবি সংস্করণ ছাপা হয়েছিল, সেইসব প্রায় সমস্ত অনুবাদের ভিত্তি। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় আমরা যারা আরব্য রজনী পড়েছি, অনুবাদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক যাথার্থ্য সংক্রান্ত কিছু কিছু মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারি না। কিন্তু তার জন্যে চাই স্বতন্ত্র প্রতিবেদন। এখানে আমরা ভাবছি পাঠসমবায় গড়ে ওঠার ক্রমিক ইতিহাস নিয়ে। নবম শতকের একটি বয়ানের কথা জানা যায় যা একটি প্যাপিরাসে পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেটাই আদি-পাঠ (Ur-Text) কিনা তা বলা শক্ত। ঐ ভূর্জপত্রে দিনাজাদ ও শিরাজাদ নামে দুটি চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে যারা পরবর্তী কালে দুনিয়াজাদ ও শেহেরজাদ নামে পরিচিত হয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রথমোক্ত জন শেষোক্ত জনকে একটি গল্প বলতে অনুরোধ করছে। আরব্য রজনীর প্রত্নলেখ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেছেন, তাঁদের মতে উপাখ্যানমালার কেন্দ্রীয় ভরকেন্দ্রটি শুরুতেই মোটামুটিভাবে স্থির হয়ে গিয়েছিল। এর চারদিকে পরিধির বিস্তার ঘটে গেছে ক্রমাগত, যুক্ত হয়েছে স্তরের পরে স্তর। দশম শতকে আল্-মাসুদি ও ইবন্-অন-নাদিম নামে বাগদাদের দু'জন লেখক ঐ প্রত্নলেখের কথা লিখেছিলেন। আল্-মাসুদি (মৃত্যু ৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ) জানিয়েছিলেন, 'আলিফ খুরাফা' (এক হাজার গল্প) বা 'আলিফ লায়লা' (এক হাজার রাত) নামে বিখ্যাত একটি বই সমান্তরালভাবে পারসিক, ভারতীয় ও গ্রিক উৎস থেকে পাওয়া গিয়েছিল। সেই বইয়ের জনপ্রিয় গল্পগুলি বাগদাদে অনূদিত হয়েছিল। কাহিনির রূপরেখাও তিনি জানিয়েছিলেন , এই গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রী হলো এক রাজা, তার উজির, উজিরের মেয়ে ও সেই মেয়ের ক্রীতদাসী। শেষোক্ত দু'জনের নাম হলো শিরাজাদ ও দিনাজাদ। পরবর্তী পর্যায়ে এদের দুই বোন বলে দেখানো হয়েছে। ইবন্-অন-নাদিম (মৃত্যু আনুমানিক ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ) যে গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন করেছিলেন, তাতে তিনি 'হাজার গল্প' নামে পারসিক থেকে অনূদিত একটি বইয়ের উল্লেখ করে এর সংক্ষিপ্ত সারমর্ম দিয়েছিলেন। তবে বইটি তাঁর অনুমোদন পায় নি যেহেতু এর মধ্যে অপরিশীলনের ছাপ

রয়েছে, গল্প বলার ধরনেও কোনো উত্তাপ নেই।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মধ্যযুগীয় আরবি সাহিত্যে আরব্য রজনীর বয়ানকে ঘিরে তৈরি হয়ে গিয়েছিল নিশ্ছিদ্র নৈঃশব্দ্যের বলয়। নইলে প্রায় সাত শতাব্দী ধরে এর অস্তিত্ব কার্যত অস্বীকার করা হবে কেন ? ঐন্দ্রজালিক উপকরণ কি তবে ইসলামি বিশ্ববীক্ষার পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়েছিল ? অথবা, আভিজাত্যগর্বী আধিপত্যবাদী বর্গের কাছে এর নিম্নবর্গীয় লোকায়ত উপাদানের বাহুল্য ছিল অস্বস্তিদায়ক ! এই পর্যায়ে মাত্র দুটি অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ পাওয়া গেছে। মিশরের রাজধানী কায়রোয় বারো শতকে কোনো-এক ইহুদি বই-বিক্রেতা 'সহস্র এক রজনী' নামক বইয়ের উল্লেখ করেছেন। সাম্প্রতিক গ্রন্থনামের এই হলো প্রথম উপস্থিতি। পনেরো শতকের সূচনায় আল্-মাক্‌রিজি (মৃত্যু ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দ) নামে জনৈক মিশরীয় ঐতিহাসিক কয়েকজন লেখকের উল্লেখ করেছেন, যাঁদের মতে এগারো শতকের শেষ দিকে কায়রোয় বইটি সমাদৃত হত। কিন্তু এই দুটি সূত্রের মধ্যে দীর্ঘ তিন শতকের ব্যবধান এই সংকেত দিচ্ছে যে মধ্যযুগের জনরুচি-নিয়ামক শক্তি বইটির প্রতি খুব প্রসন্ন ছিল না। নীরবতার চক্রান্ত ছিল সহস্র এক আরব্য রজনীর বিরুদ্ধে। তার মানে, সাংস্কৃতিক রাজনীতির নিপীড়ন সইতে হয়েছিল বইটিকে। নইলে লোকায়ত কল্পনার তুমুল উৎসারণ ঘটে যে প্রত্নলেখের ক্রমিক বিস্তারে, তা এমন হঠাৎ করে কীভাবে উধাও হয়ে যায় ! আবার পাশাপাশি, ধূসর সামূহিক প্রত্নস্মৃতির নিদর্শনবাহী বয়ানপুঞ্জ যেহেতু অভিজাত 'সরকারি' নিয়ন্তা প্রভুবর্গের অনুমোদন না-পেয়েও লোকমনে জাগ্রত ছিল, ঐশ্লামিক মহা-আখ্যানের (grand narrative) ঢিলে-ঢালা আকরণে তাদের আত্মসাৎ করে নেওয়াই হলো অনিবার্য এবং সবচেয়ে ভালো বিকল্প। তাছাড়া ইসলাম ধর্ম যেহেতু মধ্যপ্রাচ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল, সাংস্কৃতিক প্রতাপকে প্রত্যাহ্বান জানানোর মতো সম্ভাব্য কোনো 'অপর' পরিসর ছিল না কোথাও। তাই আখ্যানের লোকায়ত স্বভাব অটুট রেখেও নিতান্ত বহিরঙ্গ স্তরে ঐশ্লামিক আচারবিধি ও সোচ্চার বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করাই ছিল যথেষ্ট। কেননা মহাআখ্যানের উপস্থিতি মূল আখ্যানের ভরকেন্দ্রকে সামান্যও বিচলিত করেনি।

আরব্য-রজনীর প্রত্নলেখ এবং বিবিধ উৎস-জাত আখ্যান-পুঞ্জের সংশ্লেষণে সম্পূর্ণ পাঠকৃতি হিসেবে তার ক্রমবিকাশ নিয়ে যেসব গবেষণা হচ্ছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, মোট পাঁচটি প্রধান স্তরের মধ্য দিয়ে 'আরব্য রজনী' বিকশিত হয়েছে। প্রতিটি স্তর আসলে কথকতার ঐতিহ্যে নিষ্ণাত লোকায়ত কল্পনার স্নায়ুকেন্দ্র। প্রথম রয়েছে পারসিক স্তর : 'হাজার আফসানা' বা হাজার গল্প ; দ্বিতীয় স্তর হলো এর আরবি সংস্করণ ; তৃতীয় স্তরে 'হাজার গল্প'-এর মূল কাঠামোটি অটুট রেখে তাতে নতুন আরবি কাহিনি যুক্ত করা হয়েছে

; চতুর্থ স্তরে, বারো শতকে, এর সামান্য ভিন্নতর সংস্করণ তৈরি হয়েছে ; পঞ্চম স্তর হলো সিরীয় সংস্করণ যার ষোল শতকীয় পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে আরব্য রজনীর প্রথম ইউরোপীয় অনুবাদ প্রস্তুত হয়েছিল। নাবিয়া এবোট এই কথাপরম্পরার নির্মাণ সম্পর্কে তন্নিষ্ঠ গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে এদের পরেও রয়েছে আরেকটি (ষষ্ঠ) স্তর যা ষোল শতক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। ঐ পর্যায়ে জনপ্রিয় লোক-মহাকাব্য থেকে নতুন উপাদান সমবায়ী বয়ানে সংশ্লিষ্ট হয়েছিল। গবেষকদের মতে প্রাথমিক পারসিক স্তরে ভারতীয় কাহিনি যথেষ্ট পরিমাণে বয়ানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, অন্তত এর হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়ায় ভারতীয় কথা-ঐতিহ্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে বাগদাদের লোকশ্রুতি এবং চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরে মিশরীয় লোককল্পনার ছায়া লক্ষ করেছেন তাঁরা।

তিন

সেইসঙ্গে এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে মধ্যযুগীয় আরবি সাহিত্যে আরব্য রজনীর উপাখ্যানমালাকে সাধারণভাবে তাচ্ছিল্যই করা হয়েছে। ঐশ্লামিক মহা-আখ্যানের নিঃসপত্ন আধিপত্যকে মান্যতা দিয়েও বয়ানপুঞ্জ তার প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি মতাদর্শের বিরূপতা দূর করতে পারেনি। তবু সাধারণ মানুষের মধ্যে এর প্রতি অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ বজায় ছিল বলে বয়ানকে কখনো আস্তিত্বিক সংকটের মোকাবিলা করতে হয়নি। তবে অনুমান করা শক্ত নয়, মহাআখ্যানের প্রতি আনুগত্যের প্রয়োজন লঘু-ঐতিহ্যের কাছে সর্বতোভাবে দায়বদ্ধ আখ্যানের নির্বাধ চলাচলে কোনো-না-কোনো ধরনের জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা নিশ্চয় তৈরি করে থাকবে। এতে কী কী কূটাভাস দেখা দিয়েছে, সেই আলোচনা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ-পরিসর দাবি করে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অবশ্য সেদিকে অভিনিবেশ দিচ্ছে না। বরং এই নিবন্ধকার ভাবতে চাইছে, নির্মীয়মান পাঠকৃতিরও রয়েছে স্বতন্ত্র বাস্তব যার নিজস্ব বিধিবিন্যাস ও প্রকরণ অনুযায়ী আখ্যানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। কল্পকথার ক্রম-বিন্যাসে সেই বাস্তব মান্যতা পায়। প্রতাপের কৃৎকৌশল, আধিপত্যবাদী স্পর্ধা, সাংস্কৃতিক রাজনীতির পরিবর্তমান পরিস্থিতি থেকে যে জাগতিক বাস্তবের আদল তৈরি হচ্ছে, তার সঙ্গে প্রাগুক্ত স্বতন্ত্র বাস্তব নিগূঢ় দ্বিবাচনিকতায় সম্পৃক্ত। কল্পকথার ক্রমিক নির্মাণে এই দ্বিরালাপের কী ভূমিকা, তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করতে পারে সাম্প্রতিক আখ্যানতত্ত্ব। আরব্য রজনীর বিচিত্র উৎস-জাত উপাখ্যানগুলির সঙ্গে ভারতীয় সংশ্লেষণী কথা-পরম্পরার প্রতিতুলনা কৌতূহলব্যঞ্জক হতে পারে। এছাড়া মধ্যযুগীয় আরবি সাহিত্যের প্রেক্ষিতে ঐসব উপাখ্যানের কী কী সামাজিক-সাংস্কৃতিক-নান্দনিক চিহ্নগত মূল্য রয়েছে, তাও বিচার্য নিশ্চয়। তবে এই নিবন্ধকারের মতো পড়ুয়া, যে কিনা মাতৃভাষা বাংলায় ও ইংরেজিতে আরব্য রজনী পড়েছে এবং সেইসঙ্গে অল্পবিস্তর বাংলা-সংস্কৃত-ইংরেজি

কথাসাহিত্যের পাঠ নিয়েছে আর ইংরেজির মধ্য দিয়ে নির্বাচিত বিদেশি ভাষার আখ্যান সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত হয়েছে — তার পরিগ্রহণ ও মূল্যায়ন অন্তত বিশেষ ধরনের পাঠক-প্রতিক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। একথা কিন্তু আত্মপক্ষ সমর্থন নয় মোটেই ; বরং আন্তরিক বাচন। কেননা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানা কালে বিচিত্র সাংস্কৃতিক -ঐতিহাসিক-সামাজিক পরিসরে আখ্যানের যে-সমস্ত বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি ঘটেছে, পাঠকচিত্তে তাদের সামগ্রিক প্রতীতির নিরিখে আরব্য রজনীর পরিগ্রহণ থেকে আলাদা ধরনের তাৎপর্যের ইশারা পেতে পারি।

এই বিপুল পাঠ-সমবায়কে লাতিন ভাষার বাক্‌বিধি ব্যবহার করে বলা যায় 'Omnium gatherium' অর্থাৎ এমন সংকলন যাতে সব কিছু গৃহীত হয়েছে। ফলে কোনো বিশেষ উপাখ্যান কিংবা উপাখ্যানের বিশেষ কোনো অংশ আলাদাভাবে বেছে নিয়ে সমবায়ী পাঠের তাৎপর্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাবে না। বস্তুত আরব্য রজনীর কোনো পাঠকই সমস্ত অংশকে পুরোপুরি পছন্দসই বা অপছন্দসই বলতে পারবেন না। এমনকী, এর প্রকল্পনার অভিব্যক্তিতেও রয়েছে গ্রাম্য ও অভিজাত বর্গীয় বিভাজন, গভীরতা ও অগভীরতা, স্থূলতা ও সূক্ষ্মতার নিঃসংকোচ সহাবস্থান। হেগেল যেমন বলেন, 'The truth is the whole' তেমনই দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হয় আরব্য রজনীর সমগ্রতা সম্পর্কেও। যদি কেউ বলেন, এই বই মধ্যযুগের ঐশ্লামিক সমাজের বিশ্বস্ত দর্পণ— তাহলে সামাজিক সত্যের সংজ্ঞাও পুনর্নির্ধারণ করতে হয়। ধরে নিতে হয় এই দর্পণ এমন যাতে প্রতিচ্ছবির সঙ্গে মিশে থাকে তার বিকৃতিও। আর, সামাজিক বাস্তবের পরিধিও এত দূর বিস্তৃত হয়ে যায় যে তাতে প্রকল্পনাও যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক। তাই অবিশ্বাসকে স্থগিত রাখতে হয় সচেতনভাবে নইলে এই স্বতন্ত্র বাস্তবে জিন এক রাত্রির মধ্যে চিন থেকে দূরপ্রাচ্যে উড়ে গিয়ে ফিরে আসতে পারত না। কিংবা মানুষ জন্তুতে রূপান্তরিত হয়ে আবার মানুষের রূপে ফিরে যেতে পারত না। আমাদের এইসবই বিশ্বাস করে নিতে হয় যে দ্বীপ তিমি হয়ে যেতে পারে কিংবা পর্বতে ও অরণ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে রহস্যময় শক্তি। কখন কোন মুহূর্তে কী হবে তা বলা শক্ত।

এই শক্তির কাছে কেউ যেমন নিশ্চিত ও নিরাপদ নয় তেমনি এই শক্তি আবার হতদরিদ্রকে নিমেষের মধ্যে সম্রাটে রূপান্তরিত করে দিতে পারে। যেহেতু প্রকল্পনার বহুস্তরান্বিত নির্মোকগুলি সরাতে সরাতে পৌঁছে যাওয়া যায় বাস্তবের দ্বিবাচনিক অস্তিত্বেও, এইসব উদ্ভটের সমরোহের অন্তরালে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের সেই লোকায়ত মনটিকে অনুভব করতে পারি যা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতাপের সর্বগ্রাসী উপস্থিতিকে এভাবে বিনির্মাণ করে নিয়েছিল। একে বলা যেতে পারে লোকায়তের কার্নিভালও যা যুগপৎ প্রতিবাদ,

প্রতিরোধ, আত্মরক্ষার কৃৎকৌশল এবং উৎসব-মুখর প্রতিস্পর্ধাও। সরকারি মতাদর্শ ও মহাসন্দর্ভের বিপ্রতীপে সমান্তরাল অপরতার এই লোকায়ত উপস্থাপনা স্বভাবত প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। তাই মধ্যযুগীয় আরবি সাহিত্যে আরব্য রজনী প্রান্তিকায়িত রচনা হিসেবেই রয়ে গেছে। অবাস্তব ও প্রকল্পনার সার্বিক প্রাধান্য সত্ত্বেও তার মধ্য দিয়ে কার্নিভালের স্বতন্ত্র বাস্তবকে যেহেতু অনুভব করতে পারছি, এর গুরুত্ব সাম্প্রতিক পুনঃপাঠে পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছে। কালে-কালান্তরে আখ্যানের বহু প্রকল্প জনসমর্থন হারিয়েছে ; কিন্তু আরব্য রজনী এক্ষেত্রে রয়ে গেছে আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এর অনেক কারণের মধ্যে একটি বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে এর উপাখ্যানগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে লোকায়ত সমাজের আকাঙ্ক্ষা ও ভাবকল্প সমূহের প্রতিনিধিত্ব করেছে। এইজন্যে প্রত্নকথা ও কিংবদন্তির আশ্রয়-ভূমি হওয়া সত্ত্বেও তা লোকসমাজের ধর্মতন্ত্র বহির্ভূত সাংস্কৃতিক তন্ত্রীতে অনুরণন তুলতে পেরেছে। এই বৈশিষ্ট্য এ ধরনের কথা-সমবায়ের মধ্যে খুব বিরল।

চার

আরব্য রজনীর সূচনা হয়েছে রাজা শাহরিয়ার ও তার ভাই শাহজামানের কাহিনি দিয়ে। শাহরিয়ারকে বলা হয়েছে ভারত ও চিন সহ বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধীশ্বর এবং শাহজামান বর্বরদেশ সমরখন্দের অধিপতি। এ ধরনের উপাখ্যানে ভূগোলের তাৎপর্য খুব সামান্য হলেও এই ভৌগোলিক উল্লেখ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্রাগুক্ত প্রাথমিক পারসিক স্তরের সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আরব্য রজনীর পাঠকমাত্রেই জানেন যে শাহরিয়ার ও তার ভাইয়ের কাহিনি রয়েছে নিতান্ত বহির্বৃত আকরণ হিসেবে। বলা ভালো, মূল কথা-বিন্যাসের পক্ষে অর্থাৎ আকরণের গভীরে উপস্থিত আখ্যান-মালায় নিবিষ্ট হওয়ার জন্যে তা আসলে প্রবেশক মাত্র। প্রধান কথক শেহেরজাদকে উপস্থাপিত করার জন্যে তা যেন মঞ্চসজ্জা। যে-ধরনের উৎকট অতি নাটকীয়তার মধ্য দিয়ে শেহেরজাদ আখ্যানে প্রবেশ করেছে, তা বড়ো একটা দেখা যায় না। নিরেট জগদ্দল পাথরের মতো পিতৃতান্ত্রিক হিংস্রতার চাপে আখ্যান যেন বাধ্যতামূলক ভাবে নারীবিদ্বেষের নিরন্ধ্র অন্ধকূপে বন্দি হয়ে পড়েছে — এরকম মনে হয়। এই প্রবেশক আকরণটি কথা-পরম্পরার পরবর্তী পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সরকারি মতাদর্শের তাড়নায় আরোপিত হয়ে থাকবে। যৌন ব্যভিচারের জন্যে একমাত্রিকভাবে নারীকে দায়ী করে ঘোর কালো রঙে কামুকতার ছবি আঁকা হয়েছে। শাহরিয়ার ও শাহজামানের সঙ্গে জিনের দ্বারা অধিকৃত রূপসী নারীর যে যৌন ক্রিয়ার কার্নিভাল বর্ণিত হয়েছে, তাতে এবং সেই নারীর উক্তিতে নারীবিদ্বিষ্ট কাহিনিবিশ্বের অভ্রান্ত প্রমাণ ধরা পড়েছে। ভাষা-প্রয়োগে অনেক সময় শালীনতার মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েছে। এই

নিশ্ছিদ্র একবাচনিক পরিসরে শেহেরজাদ যে কথকতার ইন্দ্রজাল রচনা করে নিশ্চিত মৃত্যুকে জয় করে এবং শেষ পর্যন্ত গৌণত নিজের, মুখ্যত নারী জাতির, জন্যে মর্যাদার পরিসর পুনরুদ্ধার করে নেয় — এর তাৎপর্য অনেকান্তিক। রাতের পরে রাত পেরিয়ে যায় আখ্যানবিশ্বের মায়ায়, শিয়রে ওৎ পেতে বসে-থাকা মৃত্যু ক্রমশ ঝাপ্‌সা হয়ে যেতে থাকে, কল্পকথার বাস্তবে নির্ভর করে জীবনের উৎসব-মুখর প্রাপ্তি ও প্রত্যয়ের দিকগুলি মধ্যমঞ্চে চলে আসতে থাকে। সমাপ্তিবিন্দুতে এসে বুঝতে পারি, শেহেরজাদের কথকসত্তা ও নারীসত্তা প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল আপাত-অনুপস্থিত হয়েও। আর, জয় সম্পূর্ণ হয়েছে সত্তার বহুস্বরিক উন্মোচনে এবং বিশ্বাস ও যৌক্তিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায়।

যেহেতু কল্পকথার ক্রমপাঠ রচনায়, পাঠ্যান্তরের গ্রন্থনায়, লুপ্ত পাঠ পুনরুদ্ধারে অজস্র প্রজন্ম পেরিয়ে গেছে, কথক-স্বরেরও অনিবার্য রূপান্তর ঘটে গেছে বারবার। শুধু যে এক কাহিনির সঙ্গে অন্য কাহিনির সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাই নয় ; বেশ কিছু একক কাহিনির মধ্যেও স্তরে-স্তরে গ্রন্থনা পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। ফলে অজস্র অন্ধবিন্দু রচিত হয়েছে আখ্যানে, দেখা দিয়েছে প্রচুর কূটাভাস। সরকারি মহাসন্দর্ভের সঙ্গে সমঝোতা করার প্রবণতা ধরা পড়ে ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আনুষ্ঠানিক ধরনে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কথকস্বর আরব্য রজনীতে নিয়ামক ভূমিকায় রয়ে গেছে। সম্বোধক হিসেবে তার অভিনিবেশ মূলত সম্বোধ্যমানতা অটুট রাখার দিকে। উপস্থাপনাব ধরনই এমন যে সম্বোধিত সত্তা তাতে স্বতশ্চলভাবে অন্তর্নিহিত। যেমন সম্বোধক-কথক পূর্বানুমান করে নিচ্ছেন, তাঁর উপস্থাপিত তথ্যাবলি ঘটনাসংস্থান নীতিসংকেত সিদ্ধান্ত প্রভৃতির শরিক জনসমুদায় বিনা দ্বিধায় বুঝে নেবেন কোথায় কীভাবে সময়-পরিসরের কোন্ বিন্দুতে শুরু/শেষ হচ্ছে তাঁর আখ্যান। এখানে মনে পড়ে ওয়াল্টার বেঞ্জামিন 'The story Teller' নিবন্ধে লিখেছিলেন : 'The story teller is a man who has counsel for his readers...... Counsel woven into the fabric of real life is wisdom. The art of story telling is reaching its end because the epic side of truth. wisdom, is dying out ...... The story teller takes what he tells from experience — his own or that reported by others. And he in turn makes it the experience of those who are listening to his tale' (২০০০ : ৭৯)। আরব্য রজনীর ভিত্তিমূলে যে লোকশ্রুতি ও মৌখিক সাহিত্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে, বহুবাচনিক কথকস্বর উদ্ভূত হয়েছে সেই পরম্পরার ঐশ্বর্যে। সম্বোধক তাই পাঠ-সমবায় নির্মাণের স্তরগুলিতে সম্বোধিত সত্তার প্রতি তার অপরিহার্য দায় ভুলতে পারে নি কখনও। সামাজিক-ঐতিহাসিক বাস্তবের বাধ্যবাধকতায় যদিও সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু সমঝোতা করতে হয়েছে, অসংখ্য প্রজন্মের যৌথ নিশ্চেতনা থেকে উৎসারিত আখ্যানের প্রকল্প ধ্বস্ত হয়ে যায়নি।

আরব্য রজনীর জন্ম-জন্মান্তর হওয়ার বিচিত্র ইতিহাস তো সাধারণভাবে আখ্যানের, বিশেষভাবে কল্পকথার ক্রমপাঠের, জয়বার্তাই ঘোষণা করছে। প্রমাণিত হয়েছে, বেঞ্জামিন যেমন বলেন, আখ্যান 'Preserves and concentrates its strength and is capable of releasing it even after a long time.' (তদেব : ৮১)। আরব্য রজনীর অজস্র ছোট-বড় কাহিনির মধ্যে যে সিন্দবাদের সাতটি অভিযান, আলাদিন ও তার আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর : এই তিনটে উপাখ্যান অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে — এর কারণ নিহিত রয়েছে আখ্যান-গ্রন্থনার পারিপাট্যে। নিশ্চয় এর মানে এই নয় যে, কোনো-একজন নির্দিষ্ট প্রতিভাবান কথাকার এইসব উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। বরং এতে প্রমাণিত হয় বহু প্রজন্মের পরিশীলিত অধ্যবসায়। বেঞ্জামিনের প্রবাদ-প্রতিম মন্তব্য অনুযায়ী 'Perfect narrative is revealed through the layers of a variety of retellings' (তদেব : ৮৩)। আখ্যান রচনা নিঃসন্দেহে 'is itself an artisan form of communication.' (তদেব : ৮২)। সংযোগের ঐ লোকশিল্পকে আরব্য রজনীর কথকেরা কতখানি উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তা কেবল প্রাগুক্ত তিনটি উপাখ্যানে ব্যক্ত হয় নি। জেলে ও জিনের গল্প, তিনটে আপেলের বৃত্তান্ত, এক মহিলা ও পাঁচ বিবাহ-প্রার্থী বা খলিফা নামে বাগদাদের জেলের গল্প ইত্যাদিও কম চিত্তাকর্ষক নয়। প্রতিটি কাহিনিতে কেবল মায়াই রচিত হয় নি, সানুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে 'স্বতন্ত্র বাস্তব'কে দৃঢ় ভিত্তি দেওয়ার চেষ্টাও হয়েছে। সমস্ত উপস্থাপনা একরকম নয় যে, এতেই কথকের স্বতন্ত্র পরিসর প্রমাণিত। তাই বলা যেতে পারে : 'Traces of the story teller cling to the story the way the handprints of the potter cling to the clay vessel.' (তদেব)

এমন বেশ কিছু কাহিনি রয়েছে আরব্য রজনীতে, দূরবর্তী দেশ-কাল-সংস্কৃতির পাঠক হয়েও যাদের মধ্যে স্পষ্ট উচ্চাবচতা খুঁজে পাই আমরা। কোনো-একটি গল্পের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উৎস থেকে একাধিক অতিরিক্ত গল্প সংযোজিত করতে গিয়ে পাঠক/শ্রোতার প্রশ্নহীন গ্রহিষ্ণুতার ওপর বেশি আস্থা রাখা হয়েছে : এমন মনে হয়। প্রতিবেদনের শুরুতে পিনশোঁর বয়ান-সূত্রে যে 'another world's intrusion into this one' অর্থাৎ জাগতিক বাস্তবে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবের অনুপ্রবেশ জনিত আকল্প লক্ষ করেছি, তা-দিয়ে গ্রাহ্যতার সীমানাকে কতদূর অবধি প্রসারিত করতে পারি? সিন্দবাদের বিভিন্ন অভিযানে সম্ভবত এই উত্তর পাওয়া যাচ্ছে যে, সীমানার ধারণাটাই ভুল। তাই বাস্তব ও অতিলৌকিক যেমন অনায়াসে অন্যোন্যসম্পৃক্ত হয়ে গেছে, লোকমনীষার উচ্চারণ প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া-নীতিচূর্ণিকার রূপ নিয়ে আখ্যানে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে স্থান করে নিয়েছে। প্রাক্-আধুনিক কথকতায়, মধ্যপ্রাচ্যের অসংখ্য লোককবি যেন যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে অনবরত প্রত্যাহ্বান

জানিয়েছেন, জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন, সমান্তরাল প্রতিবাস্তবের সন্ধানে মগ্ন থেকেছেন। এমন কী প্রতিযোগী হয়ে উঠেছেন। আগেই লিখেছি, এই প্রক্রিয়া আসলে অভিজাত সরকারি মতাদর্শের বিরুদ্ধে প্রান্তিক জনসমুদায়ের শিল্পিত প্রতিবাদ। তাঁদের যৌথ নিশ্চেতনায় জীবনের যে-সত্য উদ্‌ভাসিত হয়েছিল, আখ্যানে তা-ই সমস্ত উপাদান সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে : 'There is no outside. All it can do is question from within. It can only problematize... the 'given' or 'what goes without saying." (১৯৮৮ : তেরো।

পাঁচ

সাম্প্রতিক আখ্যানতত্ত্ব অনুযায়ী এমন কোনো পাঠকৃতি হতে পারে না যাতে কিছু-না-কিছু অন্তর্বয়ন নেই। এই নিরিখে আরব্য-রজনীর সমৃদ্ধি অনেকান্তিক। তবে অন্তহীন অন্তর্বয়ন থাকলে পাঠক কি গোলক-ধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেন? প্রতীচ্যের আখ্যান-তাত্ত্বিকেরা যে 'Labyrinthine depth' বা অতলান্ত রহস্যের দূরধিগম্য গভীরতার কথা বলেন, সেই গভীরতা কি আরব্য রজনীর অন্তর্বয়নময় উপাখ্যানগুলিতে পাই ? অথবা গভীরতার বদলে অজস্র অবতলের উন্মোচন শুধু ঘটতে থাকে? নুর আলদীন আলি ও বদর-আল দীন হাসান এর গল্পটি দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। গল্প-মায়ায় যতই অভিভূত হই না কেন, পাঠকের নজরে পড়ে গল্পান্তর্বর্তী গল্প-গ্রন্থনার জন্যে গভীরতা সঞ্চারের ওপর খুব বেশি নির্ভর করা হয়নি। বরং লোকসমাজে প্রচলিত ব্যবহার-বিধি, ভাসমান গল্পবীজ, লোকায়ত বিশ্বাস, নৈতিক চেতনা ও চারণ কবিতার শৈলী ও উপাদান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বয়ানে উপস্থিত হয়েছে। সবশেষে খলিফা হারুণ-অল-রশীদের উপস্থিতি যে আখ্যানকে বৈধতা দেওয়ার জন্যে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই কোনো।

প্রসিদ্ধ চিহ্নতাত্ত্বিক উমবের্তো একো তাঁর বহুচর্চিত উপন্যাস 'The Name of the Rose'-এ দেখিয়েছেন, 'The encoding and decoding of signs and their interrelations' (প্রাগুক্ত : দশ) মধ্যযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেদনে সমানই প্রাসঙ্গিক ছিল। এই সংকেতটি আমরা আরব্য রজনীর উপাখ্যানমালার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি। তাহলে দেখব, অতিলৌকিক মায়া শুধুমাত্র রূপকথার ইন্দ্রজাল নয়। বিবিধ-উৎসজাত অভিজ্ঞতা চিহ্নায়কে রূপান্তরিত হচ্ছে যে-লোকমনে, সে-ই আবার সেইসব চিহ্নায়কদের মধ্যে অভিনব আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ করছে। নতুন যে সমগ্রতা উদ্ভূত হচ্ছে, তার সার্বিক চিহ্নায়ন প্রকরণ থেকে আবিষ্কার করে নিচ্ছে নতুন তাৎপর্য। আখ্যানের বিভিন্ন উপকরণ তাই এমন বিশ্বকোষের জগৎ গড়ে তুলছে যাতে সময় ও পরিসরের কাঠামো পর্যন্ত আমূল বদলে যায়। একটু আগে যে অতলান্ত রহস্যের গোলক-ধাঁধার

প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি, আরব্য রজনী তার সার্থক দৃষ্টান্ত হোক বা না হোক, গোলক-ধাঁধার অবভাস নিশ্চয় তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে উমবের্তো একো কথিত তিন ধরনের গোলক-ধাঁধার অস্তিত্ব আমাদের কাজে লাগতে পারে। গ্রিক গোলকধাঁধায় কেউ হারিয়ে যায় না ; প্রবেশ করাও দুরূহ নয়। প্রবেশ করার পরে কেন্দ্রে এবং কেন্দ্র থেকে নির্গম-বিন্দুতে পৌঁছানোও যায়। দ্বিতীয় ধরনের গোলকধাঁধায় রয়েছে অজস্র কানাগলি এবং একটিমাত্র নির্গম-বিন্দু। বারবাব ভুল করার পরে হয়তো সেই নির্গম-বিন্দু খুঁজে পাওয়া সম্ভব যদি মূল পাঠের চাবিকাঠি সম্পর্কে ধারণা থাকে। তৃতীয় ধরনের গোলকধাঁধাকে অজস্র জালের সমাহার বলা যেতে পারে। এমনভাবে তা গড়ে ওঠে যে 'Every road connects with every other. It has no centre, no periphery. and no exit, and is virtually infinite' (১৯৯৭ : ২৪৮)

এই নিরিখে আরব্য রজনী কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরনের সংমিশ্রণ? আপাতদৃষ্টিতে এর একটি মাত্র নির্গম-বিন্দু রয়েছে। কিন্তু যত গল্প থেকে গল্পান্তরে কিংবা গল্পের অন্তর্বর্তী ভিন্নতর বয়ানে পৌঁছাই, সব কিছু অস্বচ্ছ হয়ে যেতে থাকে। কেন্দ্র-পরিধি-নির্গমবিন্দুর ধারণাও অস্পষ্ট হয়ে যায়। বুঝতে পারি, যাকে আলো ভাবছি, অন্য একটি স্তরে গিয়ে তাকেই ছায়া বলে মনে হবে। আবার প্রগাঢ় ছায়ার ভেতরে পরিক্রমা করতে করতে হঠাৎ এসে পৌঁছাই ফেলে-আসা কোনও পরিসরের আলোকিত ইশারায়। অথচ আখ্যান শেষ হওয়ার পরে এমনও মনে হয় না যে গভীর কোনও মানবিক উদ্ভাসনের পরিচয় পাওয়া গেল। এইজন্যে আখ্যানের মতো গোলকধাঁধার আকল্পটিকেও শেষ পর্যন্ত মরীচিকার মতো অবতল-নির্ভর অগভীর বিন্যাস বলে মনে হয়। শাহরিয়ারকে উপলক্ষ করে শেহেরজাদ আখ্যানে প্রধান কথক হিসেবে উপস্থিত হয়েছিল । অজস্র কথা-পরম্পরার মধ্যে পথ হারাতে হারাতে ও নতুন করে পথ খুঁজে পেতে পেতে আমরা যখন মোহনায় পৌঁছলাম, ঐন্দ্রজালিকের আবির্ভাবের মতোই আবার ফিরে এল শেহেরজাদ। অতিলৌকিকের অন্তহীন বিন্যাসের মধ্যেও তার বাস্তব কথকসত্তা যেমন নিঃশব্দে উপস্থিত ছিল, তেমনি নারী-পরিসরের অপরিহার্য বাস্তবও সক্রিয় ছিল। এক হাজার রাত কেটে গেছে নিশ্চিত মৃত্যুকে স্থগিত রাখার প্রক্রিয়ায়, সেইসঙ্গে জীবনের বিধি-বিন্যাসকে গ্রাহ্য করে তোলাতেও। তাই হঠাৎই পাঠক নিতান্ত এই সংক্ষিপ্ত ঘোষণার মুখোমুখি হন : ইতিমধ্যে শেহেরজাদ তিন পুত্র-সন্তানের জননীও হয়ে পড়েছে।

এভাবে নিছক পরিশিষ্ট বলে যা পরিকল্পিত হয়েছিল, তাতেও প্রকল্পনার অনিবার্য দ্বিবাচনিক অপর পরিসর হিসেবে বাস্তবই লোকমনের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরপর বাকি থাকে শুধু এই ঘোষণা যে মৃত্যুর কালো ছায়া চিরকালের মতো সরে গেছে। এখন জীবনের

ঐশ্বর্য ও পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হবে শুধু। এভাবে কল্পকথার ক্রমপাঠ পৌঁছেছে জীবনের প্রবহমান বাস্তবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, প্রাপ্তির অবাধ অগাধ কার্নিভালের উচ্ছলতায়।

উত্তরপাঠ

ক্রমপাঠ কি শেষ হয় কোনো নির্দিষ্ট বিন্দুতে, হতে পারে কখনো ? একুশ শতকের পাঠক তো বয়ানের কাহিনি-পরম্পরায় রুদ্ধ থাকেন না, তাৎপর্যের স্বাধীন ও মুক্ত বিচ্ছুরণ খোঁজেন তিনি। শেহেরজাদ যে নিশ্চিত মৃত্যু ও অবসানকে অনবরত স্থগিত রেখে যায় সহস্র এক রাত্রি ধরে, এ কি কথকসত্তার মৃত্যুজিৎ শক্তির চিহ্নায়ক নয় ? তাহলে, আরব্য রজনী তো বিবেচিত হতে পারে পাঠক-প্রতিক্রিয়া-তত্ত্বের আকর-রূপক বলে! কাহিনির ভেতরে কাহিনি যেন জীবনের ভেতরে জীবন। যেন একটির পরে একটি অলিন্দ খুলে যায় রহস্যের। কথকসত্তার ইশারায় জীবন মেলে ধরে তার ইন্দ্রজাল। এই তো মৃত্যু ও প্রতাপের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার শৈল্পিক প্রকরণ। প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে কথক/পাঠক এভাবেই একবাচনিক ঘাতক সমাজের মোকাবিলা করে এসেছে। প্রসারিত মরুপ্রদেশের ঔদ্ধত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে পাঠকৃতির অনন্ত বিস্তার, সম্ভাবনা ও সম্বোধ্যমানতা দিয়ে।

আরব্য রজনীর রূপক যে নির্মোক, তা বুঝিয়ে দেয় শেহেরজাদের জননী হওয়ার বৃত্তান্ত। জীবন থেকে জীবনের দীপ-পরম্পরা জ্বলে ওঠে ; কথক/পাঠক জেগে থাকে অতন্দ্র, অনির্বাণ।

হ্যামলেটের অণুবিশ্ব ঃ বিনির্মাণের খসড়া

চার শতাব্দি পরেও হ্যামলেট নিয়ে ভাষ্য-ভাষ্যান্তরের অভাব নেই। নতুন কাল মানে নতুন পাঠ, নতুন চিহ্নতাত্ত্বিক অধ্যয়নের ঘরানা। সেইসব পাঠান্তরের বিনির্মাণ কিংবা তাৎপর্যতাত্ত্বিক খোঁজও বিপুল বিস্ময়ের কারণ। আসলে, ইলিয়াড-ঈনীড-ডিভাইনা কমেডিয়া-প্যারাডাইস লস্ট কিংবা অয়দিপাউস-আন্তিগোনে-ফাউস্ট এর মতো হ্যামলেটও একক পাঠকৃতি নয় আর ; হ্যামলেটকে উপলক্ষ করে আজও প্রসারিত হয়ে চলেছে স্বয়ংসম্পূর্ণ এক সাহিত্যের ভুবন। ১৬০১ সালে হ্যামলেট লেখা শুরু হয়েছিল আর ১৬০২ এর প্রথম দিকে তা শেষ হয়েছিল। এর ঠিক আগে জুলিয়াস সীজার (১৬০০) আর পরে ট্রয়লাস অ্যান্ড ক্রেসিডা (১৬০৩) লেখা হয়েছে। এ সময় শেক্সপীয়ারের সৃষ্টিচেতনায় নতুন-এক পর্যায়ের সূচনা হয়েছে যখন ভাবুক ব্যক্তিসত্তার মননবিশ্ব ও জগতের সম্পর্ক, জ্ঞান ও জ্ঞাতার সম্বন্ধ, ভিন্ন দৃষ্টিকোণের সংঘর্ষ, স্বভাব ও বিকারের দ্বন্দ্ব ইত্যাদির ওপর অন্তর্ভেদী আলো এসে পড়েছে। এইসব কিছুর প্রেক্ষিতে হ্যামলেট-পাঠ কখনও খুব সহজ ছিল না। বস্তুত হ্যামলেট-সাহিত্যে যত বৈচিত্র্য ও মতান্তর রয়েছে, শেক্সপীয়ারের অন্য কোনো নাটকের পাঠ-পাঠান্তরে ততখানি দেখা যায় না। হ্যামলেট-ভাষ্য সম্পর্কে প্রকৃতপক্ষে বহু খণ্ডের বিশ্বকোষ জাতীয় বই হয়ে যেতে পারে। এ নাটকে শেক্সপীয়ার আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন, এর মীমাংসা করতে গিয়ে প্রতিটি যুগের নতুন চিন্তাপ্রস্থান নিজ-গোত্রীয় সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। নাট্যকারের প্রকৃত অভিপ্রায় কী, এ বিষয়ে বিতর্ক নিরর্থক। বরং সাম্প্রতিক বিনির্মাণপন্থী পাঠতত্ত্ব অনুযায়ী চিহ্নসন্ধিৎসু পাঠকের সূক্ষ্ম বোধসম্পন্ন প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করাই কাম্য।

ডেনমার্কের রাজপুত্র হ্যামলেট জ্ঞানী, অনুভূতিপ্রবণ, দ্রষ্টা চক্ষুর অধিকারী। কিন্তু চারদিকে ব্যাপ্ত জগৎ যে প্রতীয়মান আর সত্যভ্রমের সন্ত্রাসে সত্য যে বেপথুমান, এটা জেনেও বিভ্রমেব কাছে স্বেচ্ছায় সমর্পিত হয় মানুষ — এই কেন্দ্রীয় বোধ হ্যামলেটের বিপন্নতার উৎস। মানুষ তার নিজের এবং জগতের নির্মাতা : নির্মাণের মধ্য দিয়েই রচিত হয় চিহ্নায়নের গ্রন্থনা। অথচ জীবনের স্থাপত্য দাঁড়াবে কিসের ভিত্তিতে, কোন্ উপকরণেব নির্ভরতায় : তা নির্ণয় করতে পারে না সত্তা। যা-কিছু যথাপ্রাপ্ত তা-ই যদি প্রমাণিত হয় প্রতিরূপ, এমনকী প্রতিরূপেরও প্রতিরূপ বলে, পুনঃসৃষ্টি ও রূপান্তরের সক্রিয়তা হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে সত্তা —

' And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment.
With this regard their currents turn awry.
And lose the name of action......'

কিন্তু একবাচনিক ভাবে তো দেখা যায় না কিছুই যেহেতু এ জগৎ দ্বিবাচনিকতায় আধারিত আর জীবন দ্বিবাচনিকতার কর্মশালা। তবে বহু-আলোচিত (এবং বহু-বিতর্কিতও) এই স্বগত কথন যেভাবে গভীর দার্শনিক চেতনা-মন্থন দিয়ে শুরু হয়েছিল (To be. or not to be, that is the question), শেষ পর্যন্ত তার পারম্পর্য বজায় থাকল কিনা — এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতণ্ডার অভাব নেই। জীবন-মৃত্যুর দ্বিরালাপ কিংবা সত্তার বৈধতা নিয়ে আদৌ ভাবছিল কিনা হ্যামলেট — এই সংশয়ও প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। মৃত্যু ও ঘুম. ঘুম ও স্বপ্ন নিয়ে ভাবছে যে-মানুষ, উদ্যম বা কৃত্য নয়, হয়তো আত্মহনন-ই অন্বিষ্ট তার। যদি এমন হয়, পুনঃসৃষ্টি ও রূপান্তর তবে কার, কিসের জন্যে ? কোন্ 'enterprise'বা 'action' বা 'resolution' এর কথা ভাবছিল হ্যামলেট : তা কি তার নিহত বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া নয় ? অথবা হনন ও আত্মহনন একাকার হয়ে গিয়েছিল তার চেতনায় !

বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষার পরস্পর-বিরোধিতায় আক্রান্ত যে-মানব- সত্তা, চিন্তার এক স্তর থেকে অন্য স্তরে স্রোতের শ্যাওলার মতো সে কী মুহুর্মুহু ভেসে যায়! ভিন্ন দৃষ্টিকোণের সমান্তরাল অবস্থান যেহেতু অনিবার্য, ঐ ভাসমানতায় কেউ দেখে প্রণালীবদ্ধ উন্মাদনা, কেউ বা আর্ত বিলাপ করে · 'Oh, what a noble mind is here o'erthrown'! একদিকে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা, অন্যদিকে তার সীমাহীন স্খলন : এই দ্বিমেরু-বিষমতার উন্মোচনই জীবন। কিংবা, শুধু উন্মোচন নয় — দ্বিরালাপের উদ্ভাসন; এর শীর্ষবিন্দু যদিও উপলব্ধির আকাশ ছুঁয়েছে, ভালো ভাবে লক্ষ করলে শেকড়ে-লেগে-থাকা মাটির সংকেতও পাওয়া যায়। নইলে হ্যামলেটের বাচনে কখনও 'To grunt and sweat under a weary life' এর মতো অভিব্যক্তি থাকত না। অবশ্য কেউ হয়তো বলতেও পারেন, ঘাম-ঝরানো ক্লান্ত জীবনের দুর্বহ বোঝা-র খবর ডেনমার্কের রাজপুত্রের তো জানার কথা নয়। 'Calamity of so long life' এর বার্তাও জানাতে পারে শুধু প্রান্তিকায়িত নিম্নবর্গীয় জনেরা। তেমনই ওরা জানে কাকে বলে 'the oppressor's wrong. the law's delay. the insolence of office'। রাজপুত্র স্পষ্টত আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতিনিধি, প্রতাপের কৃৎকৌশলে রপ্ত ; তার যথাপ্রাপ্ত অবস্থানে বিবেকের প্রাসঙ্গিকতা নেই কোনো। তাহলে বিবেক-প্রসূত ভীরুতা কাদের উদ্যম থেকে শুষে নেবে একান্ত আপন রঙের সুষমা? প্রান্তিক মানুষদের ভয়ের উৎস অন্তহীন কিন্তু রাজপুত্রের তো তা নয়। সহস্র-এক স্বাভাবিক যন্ত্রণাকে তবু সে রক্তমাংসের শরীরের উত্তরাধিকার বলে মান্যতা দেয় কেন? তার অধিবিদ্যাগত সংকট ও আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত জীবনের সীমানা পেরিয়ে যায় : 'The dread of something after death,/The undiscovered country, from whose bourn/ No traveller returns, puzzles the will' । কিয়ের্কেগার্দ-কথিত আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠার কথা মনে

আসে তখন।

কিন্তু এতে সমস্যা আরও জট পাকিয়ে যায়। মৃত্যু কি তবে জীবনকে বোঝার দ্বিবাচনিক দর্পণ নয় ? এই দার্শনিক প্রশ্ন যুগপৎ আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক নিশ্চয়। কিন্তু তার চেয়েও জরুরি জিজ্ঞাসা হলো, পিতৃঘাতক কাকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মতো ঘোর বাস্তবের মুখোমুখি হওয়ার বদলে অধিবিদ্যার পরিসরে আশ্রয় খোঁজে কেন হ্যামলেট ? তবে কি সে বাবাব প্রেতাত্মাকে ভুলে গেছে অথবা সেই অতিলৌকিক সাক্ষাৎকারে কোনো আস্থা রাখতে পারছে না ! অন্তত এটা ঠিক, দ্বিধা-যন্ত্রণা-সংশয়ের ঊর্মিমুখর সাগরের মুখোমুখি রাজপুত্র বার বার পুনঃপাঠ করছে নিজেকে অর্থাৎ তার অস্তিত্বের ভুবন ও যাবতীয় সম্পৃক্ত পরিসরকে। সমস্ত সম্পর্কের বিন্যাস ও সত্তার অন্বিষ্ট নিয়ে তলিয়ে ভাবছে সে। ফলে কখন ভাবনার অতিরেক তৈরি হয়ে গেছে, নিজে তা টের পাচ্ছে না : প্রকৃত উদ্যম ও উদ্যমের আকাঙ্ক্ষা একাকার হয়ে যাচ্ছে তার কাছে। আকাঙ্খার যে আছে নিজস্ব আয়ুষ্কাল, আছে অদ্ভুত কিছু অন্ধবিন্দু এবং প্রতীত ও প্রকৃত সক্রিয়তার জল-বিভাজন রেখা · সেইসব ঝাপসা যেন। তাই সাগরের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে সে বিশ্বাস করতে থাকে, ঢেউয়ের প্রতীতিই তাকে ঢেউযের মাঝখানে নিয়ে গেছে। যুদ্ধসাজ নিয়ে বা না-নিয়ে যুদ্ধের কথা ভাবতে পারলেই যুদ্ধ হয়ে গেল। 'And by opposing. end them' কথাটার দ্যোতনা এই যে, যন্ত্রণার দহনবেলার বিরোধিতা করতে পারা মানে বহুবিধ কষ্টের প্রতীত অবসান। বার বার যা ফিরে আসে, তা হলো প্রতীতিব সর্বগ্রাসী উপস্থিতি অর্থাৎ অনিবার্যভাবে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের বিলীয়মানতা।

কিন্তু পরস্পর-বিরোধী অনুভূতি ও সীমায়িত চেতনার প্রেক্ষিতে জীবনের বাস্তবকে নেতিবাচক ধারণা দিয়ে নিরাকৃতও করা যায় না। জটিলতার গ্রন্থি খোলা যায় না বলে তাদের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয় অথচ আকাঙ্ক্ষা বাদ সাধে। এ ধরনের উচ্ছৃঙ্খল মানসিক অবস্থাতেই হয়তো নিজেকে নিজেরই বোঝাতে ইচ্ছে করে 'tis a consummation/Devoutly to be wished' ! কিন্তু হ্যামলেট তো জ্ঞানদগ্ধ ফাউস্ট নয় যে ভাববে 'Consummatum est'। এই উচ্চারণে এমন কী 'the rest is silence' দিয়েও পৌঁছানো যায় না। দুইয়ের মাত্রা আলাদা, তাই তাৎপর্যও আলাদা। তামাম শোধ-এর ভাবনা হ্যামলেটের পক্ষে বেমানান, হওয়া আর না-হওয়া এবং করা আর না-করার মধ্যে বেপথুমান থেকেও হ্যামলেটকে বেঁচে থাকার সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হয়। ভেবে নিতে হয় যে বেঁচে থাকা মানে 'bear the whips and scorns of time'। নিজেরই ভেতরে যার অজস্র পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ অহরহ্ সক্রিয়, তার মধ্যে সম্বোধক ও সম্বোধিতের চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে সম্বোধ্যমানতার অনুভব। ফলে বাস্তব ক্রিয়ায় সে লিপ্ত হতে পারে

না, প্রতীত সক্রিয়তায় নিমজ্জিত হয় তার সত্তা। চিন্তা-বিবেক-সংবিদের আতিশয্য আচ্ছন্ন করে দেয় সব কিছুকে। আত্মসৃষ্ট জালে ক্রমাগত যে জড়িয়ে যায় হ্যামলেট, এর মানে কি বিভ্রমের কাছে মানবসত্তার পরাভব ? এই উপলব্ধির সংকেত কিন্তু আগেও ছিল। 'The Merchant of Venice' এর মতো কমেডিতেও পাই এমন দার্শনিক মনন-ঋদ্ধ উচ্চারণ : 'the seeming truth which cunning times put on/to entrap the wisest' (iii. ii. 100-101)। সত্যের প্রতীয়মান অবয়ব হলো ক্রুর সময়ের ফাঁদ যা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীকেও বন্দি করে ফেলে : এই উপলব্ধি যদি আগেই হয়ে থাকে শেক্সপীয়ারের, হ্যামলেট লেখার পর্বে এতে ট্র্যাজিক গাঢ়তা ও সংরাগ কতটা যুক্ত হলো ?

দুই

এই যে প্রতীয়মানতার প্রসঙ্গ, তার শেকড় বহুদূর অবধি ছড়ানো। এখানে সেই আলোচনার অবকাশ নেই। পর্বে-পর্বে শেক্সপীয়ারের লিখনবিশ্বে তার অভিব্যক্তিও রূপান্তরিত হয়েছে। সত্যভ্রমের বিচ্ছুরণ প্রতারক ও প্রতারিত : দু'পক্ষকেই প্রভাবিত করে। আত্মপ্রতারণার ক্ষেত্রে স্বভাবত এই বিচ্ছুরণের ভিন্ন মাত্রা দেখা যায়। যে ছদ্মবেশ দক্ষ ও ধূর্ত এবং যা অনিচ্ছাকৃত অথচ দুর্মোচনীয় — তাদের একই নিরিখে দেখা যাবে কি ? অর্থাৎ হ্যামলেটের অতি সূক্ষ্ম ও জটিল প্রতীয়মান উন্মত্ততা এবং ইয়াগো ও ক্রেসিডার প্রতারণাকে অভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচাব করা যায় কি? অবভাস থেকে তত্ত্ববস্তুকে আলাদা করতে গিয়ে চিন্তার সাধারণ মানদণ্ডকে বিশেষ ধরনের আত্মপ্রতারণা সম্পর্কে প্রয়োগ করা কঠিন। অন্তত হ্যামলেটের মতো সূক্ষ্মদর্শী যখন যথাপ্রাপ্ত আর প্রতিপন্ন জগৎ সম্পর্কে নিশ্চিত অবস্থানে পৌঁছাতে পারে না। সম্ভবত পৌঁছাতে চায় না বলেই পাবে না। জীবন ও জগতের সঙ্গে যে-দ্বিরালাপ কাম্য, সত্যভ্রম বার বার তাতে হস্তক্ষেপ করে। এই পরিস্থিতিকে মান্যতা দিতে না-পারার জন্যেই অনন্বয়ের বোধ, ট্র্যাজিক চেতনার সূত্রপাত। দ্বিবাচনিকতা নেই বলেই প্রতীয়মানের সন্ত্রাস, মুক্তির বদলে রুদ্ধতা, উদ্যানে আগাছার বিস্তার। শেক্সপীয়ারের চিহ্নায়িত বাচন অনুসরণ করে বুঝতে পারি, ডেনমার্কেব উদ্যানে আগাছা ছিল না ; বহুমুখী গুল্মমূল ছড়িয়ে দিয়ে আগাছা যখন দেখা দিল, হ্যামলেটের মনে ও ডেনমার্কের রাষ্ট্রীয় পরিসরে পক্ষাঘাতের লক্ষণ একসঙ্গে প্রকট হতে শুরু করল। এই যুগলবন্দির তাৎপর্যও অনেকখানি।

আগাছা মানে বন্ধ্যাত্ব, কুসুমের ঋতু শেষ হয়ে যাওয়া। ব্যক্তি-জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে হঠাৎ যখন তাৎপর্য ঝরে যেতে শুরু করে, বাস্তব ও রূপক অর্থে পক্ষাঘাতসূচক নৈরাশ্যের সূচনা হয়। এই আগাছার অন্য নাম অমঙ্গল ও সত্যভ্রম : এদের সংক্রেমণে দেখা দেয় অনিবার্য আত্মবিনাশ — 'evil breeding evil, and leading to ruin'। ফলে

আগাছার আক্রমণে একে-একে হ্যামলেটের অণুবিশ্বে ফুটে-ওঠা ফুলগুলি ঢলে পড়তে থাকে। ওফেলিয়া তো নিশ্চয় এর নিদর্শন ; তার আগে হ্যামলেট লক্ষ করে মায়ের মধ্যে মাতৃত্বের অবসান। প্রেতের আবির্ভাব সর্বব্যাপ্ত অমঙ্গলের ছায়া সম্পর্কে তাকে সচেতন করে তোলে : 'Something is rotten in the state of Denmark!' আসলে ডেনমার্ক কেবল রাষ্ট্রপরিসরের নাম নয়, সমগ্র অণুবিশ্বের চিহ্নায়কও। হ্যামলেট আগাছার অস্তিত্ব টের পায় কিন্তু এদের উপড়ে ফেলার উপায় তার জানা নেই। এই অসহায়তার ক্ষোভ ক্রমশ তার মনকে বিকল করে দেয় ; অথচ অবশতার প্রতিষেধক খোঁজার বদলে অনুভব করে, ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে অমঙ্গলের পরিধি। উৎকণ্ঠা ও অবসাদের যুগ্ম-উপস্থিতিতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব নিরাকৃত করার উদ্যম হারিয়ে যেতে থাকে ; তার প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে সে যেন নিজেই আতস-কাঁচের নিচে ফেলে পরখ করতে থাকে। বাস্তব কৃত্যের পরিকল্পিত ব্যবস্থা করার মতো উত্তেজনা তাকে জাগিয়ে রাখতে পারে না ; অবসাদের কুহেলিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় তার আস্তিত্বিক বোধ ও সম্পর্কের মানবিক ভুবন। বাবার হত্যায় ও মায়ের অস্বস্তিকর পুনর্বিবাহে যে বিপুল মর্যাদাহানি ঘটেছে, তা পুনরুদ্ধার করার বদলে হ্যামলেট ক্রমশ তলিয়ে যায় বিশেষ ধরনের আত্মহননে, নিরালোকে। যেহেতু মর্যাদার আকল্প তার কাছে কোনো বিচ্ছিন্ন এককের প্রতিভাস নয়, বরং অস্তিত্বের নানা মাত্রা জড়িয়ে রয়েছে তাতে — এই সর্বগ্রহিষ্ণু প্রবণতা তাকে কোথাও স্থিতিশীল হতে দেয় না। শেষ পর্যন্ত সে নিজেই পৌঁছে যায় মৃত্যুর অনাবিষ্কৃত সেই পরিসরে — 'from whose bourn/No traveller returns!' প্রত্যাবর্তনহীন সেই নৈঃশব্দ্যকে অধিকার করে আগাছার গুল্মজাল, অমঙ্গলের ধ্বংসাত্মক শক্তি। হ্যামলেট তাকে প্রতিহত করতে পারে না।

তাহলে, শেক্সপীয়ার কি দ্বিবাচনিকতার পরাভব দেখাতে চেয়েছেন ? সংক্রামক ব্যাধির মতো অমঙ্গলের দুর্নিবার বিস্তার হ্যামলেটকে সাবলীলভাবে সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যায়। যেন স্বাধীন অস্তিত্ব বলে কোথাও নেই কিছু। বিনাশের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ক্রমাগত নেমে যায় সে ; মনে হয়, অস্তিত্ব এক গোলকধাঁধা আর ধ্বংস এক সচলতা। একবার বিনাশের ক্রমপাঠ শুরু হলে তা ভালো ও মন্দকে সমান নিরপেক্ষতায় আবৃত করে। বিশেষ পরিসর বলে যেন নেই কিছু, সমস্তই নির্বিশেষ অপ্রতিরোধ্য নিয়তির কাছে। তবে কি গ্রিক বিশ্ববীক্ষা অনুযায়ী দৈবশক্তিকে শেক্সপীয়ারও মান্যতা দিয়েছেন ? এরকম প্রশ্নের পরে প্রশ্ন প্রতিটি পাঠে উঠে আসে বয়ান থেকে। এমন নয় যে শুধুমাত্র হ্যামলেটের স্বগতকথনই সমস্ত জিজ্ঞাসার উৎস, যদিও পাঠকৃতিতে এদের বিশেষ গুরুত্ব মনে না-রাখলে চলে না। নিজের গভীরে অসাড়তার বলয়কে যে প্রসারিত হতে দেখে হ্যামলেট, তা তো নিছক পর্যবেক্ষক সূত্রধারের চোখে নয়। এই প্রপঞ্চের ঘটমানতায় জড়িয়ে গেছে

বলেই তো সত্তা রক্তাক্ত হচ্ছে তার। চূড়ান্ত বিবমিষা জাগছে জগৎ- প্রক্রিয়ার দিকে তাকিয়ে, যেহেতু এর সঙ্গে মিশে গেছে মাতৃপ্রতিমার শোচনীয় স্খলন : 'O, most wicked speed, to post/ With such dexterity to incestuous sheets'। গ্রিকদের যৌন-নৈতিকতা থেকে এলিজাবেথীয় যুগ বহু দূরবর্তী। সমর্থন বা বিরোধিতার কথা নয়, অগম্যগমন সম্পর্কে চরম বিতৃষ্ণা সমাজমনে দৃঢ়প্রোথিত হয়ে গেছে। সৃষ্টিশীল কল্পনাতেও অয়দিপাউসের প্রত্নকথাকে ব্যবহার করা চলে না আর। এমন কী, আদিকল্পের ইশারাকেও প্রত্যাখ্যান করার তাগিদে মায়ের প্রতি অন্য কারও যৌন আকাঙ্ক্ষাকে বরদাস্ত করা যায় না — এই বার্তা উঠে আসছে স্পষ্টভাবে। পরিব্যাপ্ত অমঙ্গল ও বিদূষণের বড়ো প্রমাণ ঐ wicked speed । তাই হ্যামলেট নিজের অতি-সংলগ্ন পরিসরে 'rebellion hell' -কে লক্ষ করে অভিশাপ দেয় যৌন-বাসনার উত্তাপকে : 'To flamming youth let virtue be as wax/And melt in her own fire.'

ধুলো-মাটির বাস্তবে রক্তমাংসের নারী নিশ্চয় শরীরী তৃষ্ণা নিয়ে থাকে। কিন্তু সে তো শৃঙ্গারপিপাসু রমণী, কারও মা নয় কখনও। বিদূষণের নরককুণ্ডে দাঁড়িয়ে যে-মানুষটি শুদ্ধতা ও পূর্ণতা খোঁজে, সেই হ্যামলেটের মা তো কারও সম্ভোগ-বাসনা পরিতৃপ্তির ইচ্ছুক শরিক হতে পারে না। একদিকে আদর্শায়িত ভুবন, অন্যদিকে ভাবাদর্শরিক্ত ধৃষ্টচতুর জগৎ : এই দুইয়ের মধ্যে প্রলম্বিত হ্যামলেট কী করতে পারে ? তার জ্ঞানদীপ্ত কবিমন পাশবিকতা থেকে মানবসত্তার উত্তরণ খোঁজে 'discourse of reason'-এ। অথচ তার নিজের মায়ের মধ্যে নেই যৌক্তিক সন্দর্ভের উপস্থিতি। অতএব আত্মগ্লানিতে, জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতি ধিক্কারে শতধা-বিদীর্ণ হয়ে গেছে তার মন : 'O ! that this too Solid flesh would melt./ Thaw and resolve itself into a dew...? কিন্তু চাইলেই কি আর শান্ত শিশিরের কণায়-কণায় মিলিয়ে যেতে পারে শরীরী উত্তাপ ! অধোগতি হয়েছে যে-নারীর, তারই রক্তকণিকায় হ্যামলেটের জন্ম : অতএব বিদূষণ অনিবার্য; এই বিদূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে অনেকটা পরিমাণে নিজেরও বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে যথাপ্রাপ্ত হিসেবে অর্জিত নিজস্ব অন্ধবিন্দুর জন্যে গ্লানিবোধ ও তিক্ত ধিক্কারের উচ্চারণ। ওফেলিয়ার সঙ্গে বিখ্যাত সেই সংলাপ ('Get thee to a nunnerry')-এর প্রেক্ষিত ঐ বিদূষণ-বোধে সম্পৃক্ত। শরীরী অস্তিত্ব যখন শারীরিক তৃষ্ণার মোহে আচ্ছন্ন হতে বাধ্য, প্রেম কীভাবে সৌন্দর্য ও সততায় সম্পৃক্ত থাকবে ? নিবন্ধের সূচনায় যে-প্রবঞ্চনার প্রসঙ্গ' উত্থাপিত হয়েছে, তারই প্রচ্ছায়ায় সম্পর্কগত বিদূষণের আরেকটি বিন্যাস তৈরি হবে। লুকিয়ে-থাকা পোলোনিয়াসের উপস্থিতি টের পেয়েছিল হ্যামলেট ; অতএব ওফেলিয়ার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সে দেখতে পেয়েছে বাজিকরের সুতোয় গাঁথা পুতুলকে। মা তার বাবাকে

প্রতারণা করে দাম্পত্যের সৌন্দর্য ও আন্তরিকতাকে হত্যা করেছে ; তেমনই ওফেলিয়াও অসম্মান করছে হ্যামলেটের প্রেমকে : তাহলে, সম্পর্ক কেবলই প্রতীয়মানের বিন্যাস আর প্রবঞ্চনার শিল্প !

এই বোধ থেকে খানিকটা হেঁয়ালির ধরনে কথা বলে হ্যামলেট। যখন সংযোগই বিধ্বস্ত, সংযোজক ভাষা তো সাধারণ মাপে ও ধরনে ব্যবহৃত হতে পারে না। ওফেলিয়ার মধ্যেও যে প্রতারক নারীর আদল দেখতে পায় হ্যামলেট, তাতে মায়ের প্রতি অনুভূত বিতৃষ্ণা ফিরে আসে আবার : '.. .. the power of beauty will sooner transform honesty from what it is to a bawd'! আর, সেই সূত্রে আসে পুঞ্জীভূত আত্মগ্লানি, নির্বেদ ও ঘৃণার উদ্‌গীরণ : পারস্পরিক প্রবঞ্চনাময় জীবনে অভ্যস্ত হওয়া মানে অবভাসের পুষ্টি। প্রেম ও বিবাহের মধ্যে লুকিয়ে থাকে মৃত্যুফাঁদ। প্রতীয়মানের এই প্রপঞ্চ ছেড়ে সন্ন্যাসিনীদের সঙ্ঘে আশ্রিত হওয়া অনেক ভালো। নৈতিকতার বালাই নেই যেখানে, পাপের পরিধি ক্রমাগত বেড়ে যায়। প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে অক্ষুণ্ণ থাকে পাপের পরম্পরা। ওফেলিয়াব বিয়ে হলে সেও পাপীদের জননী হবে। তীব্র আত্মধিক্কারে হ্যামলেট জানায়, তার মা যদি তাকে জন্ম না দিত, সে-ই ছিল ভালো, কেননা তাহলে প্রতীয়মান সংসারেব বিদূষণ উত্তরাধিকার হিসেবে তাকে বইতে হত না। এই অংশে তার বাচনের অন্তিম অংশ খুব লক্ষণীয় : 'We are arrant knaves all, believe none of us. Go thy ways to a nunnery.' এই উচ্চারণের বহুবাচনিক উত্তম পুরুষ সর্বনামটি তাৎপর্যপূর্ণ। এ কোনও কথার কথা নয়, এ হলো সর্বজনীন যন্ত্রণার অভিব্যক্তি। আসলে এই বিন্দুতে আভাসিত হয়েছে জীবন থেকে নিষ্ক্রমণের বিন্দুটিও। প্রতীয়মানে অভ্যস্ত ও অজস্র মুখোশে আবৃত সভ্যতার কাছে হ্যামলেটের অভিব্যক্তি উন্মাদের পাঠকৃতি; কিন্তু আসলে এই সবই বিপ্রতীপের দর্পণে বিদূষণক্লিষ্ট অপজীবনের সমালোচনা। এখান থেকে হয় জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে অথবা দুর্নিবার আত্মহনন বা অবসানের দিকে স্খলিত হতে হবে।

মানুষ হয়ে ওঠাই মানব-অস্তিত্বের প্রধান ও চূড়ান্ত উপলব্ধি : এরকম কথা আমরা শুনেছি দার্শনিকদের কাছে। মানুষ কতটা স্বাধীন এবং নিজের উপলব্ধি-প্রসূত উদ্যমের ব্যবস্থাপনায় তার মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতা ও স্বাধীনতা কতটা প্রকাশ পায় : এ সব নিয়ে চুল-চেরা তর্কেরও অভাব নেই। মানুষ নিজেকে তার কর্ম থেকে আলাদা করে নিতে পারে এবং শুধু কর্ম নয়, সত্তাকেও চেতনার গভীর থেকে উঠে-আসা আলোয় রঞ্জিত করে : এই প্রতীতিও মানবিক পরিসরের চিহ্নায়ক। তাহলে, হ্যামলেট কি নিজেকে এই চিহ্নায়ন প্রকরণের বাইরে নিয়ে যেতে চেয়েছে? অথবা, তির্যক পথে, বিপ্রতীপের দর্পণে

একবাচনিকতার প্রতিষেধক দ্বিবাচনিক চিহ্নবিশ্বকে বুঝে নিতে চেয়েছে ! মানুষের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হয় না কখনও, হ্যামলেটের যন্ত্রণা ঐ অসম্পূর্ণতার জন্যে। উদ্যমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক পরিসরকে তবে কি অসমাপ্ত রেখে দিয়েছে হ্যামলেট? নাকি, তার জীবন পাঠ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, অস্তিত্বের বোধ চূড়ান্ততাহীন! যেভাবে রচিত হোক না কেন পাঠকৃতি, স্তরে-স্তরে জেগে ওঠে শুধু প্রশ্নের পরে প্রশ্ন : প্রত্যুত্তরযোগ্যতা অর্জন করা যেমন বয়ানের সূত্রধারের দায় তেমনই বয়ানের পাঠকেরও। হ্যামলেট প্রত্যুত্তরযোগ্যতার জ্ঞান চেয়েছে, ক্রিয়া নয়, অথচ ক্রিয়াশূন্য জ্ঞান পরিণামে রিক্ত ও স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। চিন্তাও অস্বচ্ছতা ও কূটাভাসে আক্রান্ত হয়। হ্যামলেটের তা-ই হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হলো, জ্ঞান থেকে ক্রিয়াকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না; তাই জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বতঃসিদ্ধ ভাবে দ্বিবাচনিক । আবার, সংলগ্ন বাস্তব জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। হ্যামলেটের প্রকৃত সমস্যা ও সংকট ঐখানে। তার কাছে বাস্তব মানে নিছক প্রতীয়মানের মিছিল ; এরা আসলে 'obstacles which impede man's full humanization.' (পাওলো ফ্রাইরে : ১৯৭০ : ৯১)।

তিন

জীবন যখন রক্তক্ষরণ করায় মুহুর্মুহু, আস্থার আধার খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও, হ্যামলেট বিচিত্র সব কূটাভাসের মুখোমুখি হয়ে আত্মিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়। অপরতার প্রান্ত থেকে বলা যেতেই পারে, 'His madness is poor Hamlet's enemy' ; কিন্তু হ্যামলেট নিজে জানে, পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের সময় এক অস্বাভাবিকতা অন্য অস্বাভাবিকতার জন্ম দেয় — 'As if increase of appetite had grown/ By what it fed on.....' এমনই হয়, এমনই হয়ে থাকে অপ্রেমে, অবিশ্বাসে, অনুদ্যমে, যৌন অনাচারে, চক্রান্তের বিস্তারে। কী আর করতে পারে হ্যামলেট, প্রক্রিয়াকে যতটা সম্ভব দীর্ঘ-বিলম্বিত করে দেওয়া ছাড়া। এইজন্যে কেউ কেউ নাটকটিকে ভেবেছেন বিলম্বিত ক্রিয়ার বয়ান ; কিন্তু এত সহজিয়া সমাধান-সূত্রকে মনে হয় বড়ো বেশি সরলীকৃত। এতে অন্তর্বয়নের যুগপৎ সমৃদ্ধি ও জটিলতা বোঝা যায় না। হ্যামলেট মানবিক নির্যাস-শূন্য জগতে প্রতিটি প্রতীয়মান সম্পর্কের মুখোস ছিঁড়ে দেখতে চায়, কী আছে ভেতরে। কোন্ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত অস্তিত্বের শেকড়বাকড়, সত্তার আলো-অন্ধকার ; কোন্ উৎস থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে কোন্ অজ্ঞাত পরিসরে ফিরে যায় সব কিছু ! বাস্তব মানে প্রত্যাহ্বানের পরম্পরা, এই জেনে কিছু-কিছু প্রত্যাহ্বান তৈরি করে নিতে হয় নিজেকেই। যৌনতার প্রতাপ কত অপ্রতিরোধ্য, এই উপলব্ধিতে রক্তাক্ত হ্যামলেটের মেধা ও হৃদয়। তবু মনন দিয়ে সে

মোকাবিলা করতে পারে না। কাকা ক্লডিয়াসের সঙ্গে তার মায়ের শরীরী সম্পর্ককে ঘৃণায় বিবৃত করে বলে হ্যামলেটের বাচনও নেমে আসে প্রায় গালাগালির পর্যায়ে। প্রথম স্বগতকথনে সে যে 'Hyperion to a Satyr' এর তুলনা দিয়েছিল, বাচনের উচ্চাবচতায়ও ঠিক তা-ই ঘটে। 'Frailty, thy name is woman' এর মধ্যে যে বাচনিক উচ্চতা আছে, মায়ের প্রতি সরাসরি উচ্চারিত ধিক্কারে ঠিক তার বিপরীত স্তর দেখতে পাই যেন।

অথচ এ-কোনো কিশোরের উচ্চারণ নয়। শেক্সপীয়ার জানিয়েছেন, হ্যামলেটের বয়স তখন তিরিশ। ইতিমধ্যে প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের পাঠ নিয়েছে সে, জীবন সম্পর্কে উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা নিশ্চয় কম হয়নি। প্রৌঢ়া মায়ের যৌনতৃষ্ণা তখনও অতৃপ্ত, এই বোধ হ্যামলেটের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় আঘাত করেছে। কিন্তু এহ বাহ্য। মানব-অস্তিত্বের সীমায়িত পরিস্থিতি (ফ্রাইরে-কথিত 'limit-situations' : ১৯৭০ : ৯২) থেকে নিষ্ক্রমণের ব্যর্থ আর্তি-ই কি তাকে বিচলিত ও সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল? মা যেহেতু তার শারীরিক অস্তিত্বের উৎস, মাতৃ-প্রতিমার বিদূষণ তাকেও অসুখের শরিক করে দিয়েছে। অতএব ঐ প্রতিমাকে ভেঙে দিয়ে সে প্রতীকী ভাবে নিজেকে অসুখ ও বিদূষণ থেকে মুক্ত করতে চায়। এইজন্যে মায়ের প্রতি হ্যামলেটের এই উক্তি বহুস্বরিক তাৎপর্যমণ্ডিত : 'You go not till I get you up a glass/ Where you may see the inmost part of you'। এই আয়না নিছক তার মায়ের জন্যে নয়, নিজের জন্যেও প্রয়োজন। কী আছে ভেতরে — সত্তার ও অপরতার যাবতীয় প্রতীয়মানতার নির্মোক ভেদ করে দেখতে চায় হ্যামলেট। সত্তা ও শূন্যতার সীমানাকে সে রূপান্তরিত করতে চায় সত্তা ও উত্তরোত্তর জায়মান মানবিক পরিসরের সীমানায়। দৃশ্য ও অদৃশ্য প্রতাপের সমস্ত কৃৎকৌশল পরাভূত করতে পারি যখন ঐ রূপান্তরের জিজ্ঞাসা সম্পর্কে নিজেদের যোগ্য করে তুলি। হ্যামলেট জীবন ও জগৎকে যেহেতু অবভাসের বন্দিশালা বলে অনুভব করে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্নতার বোধ উদ্ভূত হয়। এতে সম্পৃক্ত হয়ে যায় নানা ধরনের পীড়া, বিকার ও বিদূষণের জটিল আকরণ।

দার্শনিক ফ্রাইরে বলেছেন, 'To exist humanly... is to name the world. to change it.' (১৯৭০ : ৭৬)। বিদূষণ-ক্লিষ্ট ডেনমার্কে মানুষের মতো বেঁচে থাকার তাগিদেই নতুন এক জটিল অণুবিশ্বের নির্মিতি-প্রকল্প ভেবে নিতে পারত হ্যামলেটের মতো মনন-বিত্তে সম্পদশালী ব্যক্তি। তার ঈপ্সিত জগৎকে দিতে পারত নতুন অভিধা, দ্বিবাচনিকতার প্রকরণে বিন্যস্ত করে পরিবর্তনের উত্তরণে যুক্ত করতে পারত। দ্বিরালাপ যেহেতু আস্তিত্বিক প্রয়োজন, এর অভাবে হ্যামলেটের জগৎ চূর্ণ হয়ে গেল। ক্লডিয়াসের বিরুদ্ধে রণকৌশল নির্ণয়ে দ্বিধা ও গড়িমসি, সুনির্দিষ্ট প্রতিশোধ গ্রহণে অকৃতকার্যতা ইত্যাদি ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গ

কারণ মাত্র, এ কথা না-লিখলেও চলে। 'God-like reason' সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও কোন্ কূটাভাসের ছায়ায় নির্বেদ-তিক্ততা-আত্মঘৃণা-বিবিক্ততা তাকে গ্রাস করে : এর বহুধাব্যাপ্ত মীমাংসা-প্রয়াস সত্ত্বেও আস্তিত্বিক ট্র্যাজেডি আজও প্রহেলিকা হয়ে রয়েছে। প্রহেলিকা, কেননা হ্যামলেট অসচেতনভাবে আত্মসৃষ্ট আবর্তে বন্দী হয় নি। এর বহু প্রমাণের মধ্যে একটি পাচ্ছি নিম্নোধৃত বয়ানে :

'Of thinking too precisely on the event,—
A thought which, quartered, hath but one part wisdom
And ever three parts coward, — I do not know
Why yet I live to say 'This thing's to do',
Seth I have cause, and will, and strength, and means
To do't'.

গভীর অনুভূতি যার আছে, শুধুমাত্র সেই মানুষই গভীর চিন্তাশক্তির অধিকারী। কিন্তু চিন্তা যখন উদ্যমের প্রতিদ্বন্দ্বী, সত্তা দ্বিধাবিভক্ত, এমন কী, অন্তরে-বাহিরে অনন্বয়-দীর্ণ হয়ে যেতে পারে। সেই অবস্থায় জ্ঞান ও ক্রিয়ার মধ্যে সঙ্গতি থাকে না। অসঙ্গতি ট্র্যাজেডির পথকে প্রশস্ত করে ; অন্বিষ্টের আকাঙ্ক্ষা, অর্জনের শক্তি ও পথনির্দেশক জ্ঞান অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়। এ আসলে বিশেষ ধবনের পক্ষাঘাতগ্রস্ত চেতনার বোধ যা হ্যামলেটেব প্রতিটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় সঞ্চারিত হয়ে গেছে।

অর্থহীনতার ক্রমব্যাপ্ত বলয় ও সত্তাকে অসাড় করে-দেওয়া-বোধ নাট্য-পাঠকৃতির ভরকেন্দ্র। নাটকের শেষে রাজা-রানি-লেয়ারটেস ও স্বয়ং হ্যামলেট যে মৃত্যু-উপত্যকাব অনিবার্য পথিক হয়ে পড়ে, তা বৈনাশিক কাল ও পরিসরের নাটকীয় অভিব্যক্তি। মূল চিহ্নায়ন প্রকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত এইসব মৃত্যু কায়িক মৃত্যু নয় কেবল, সম্পর্কেরও শোচনীয় অবসান। পোলোনিয়াস ও ওফেলিয়ার আকস্মিক ও অপঘাত মৃত্যু যদিও একই গোত্রের নয়, প্রতীয়মান অবয়ব থেকে আরোপিত মুখোশ সরিয়ে দেওয়ার জন্যে এরা সংকেত হিসেবে কার্যকরী। হ্যামলেট ওফেলিয়াকে উপলক্ষ করে প্রকৃতপক্ষে সত্যভ্রমে আচ্ছন্ন সমগ্র জগতের বিরুদ্ধে অভিযোগের তর্জনি নির্দেশ করে বলে — 'God has given you one face, and you make yourselves another !' এখানে হ্যামলেট খুব তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বহুবচন ব্যবহার করেছে (yourselves)। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবেই নিছক ওফেলিয়া তার লক্ষ্য নয়। সম্বোধক হিসেবে তার ভর্ৎসনাও সম্বোধিত সত্তাকে খোঁজে। কিন্তু সেই সত্তার অনুপস্থিতি দ্বিবাচনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেয় না। ট্র্যাজেডির গভীরতম সংবেদনার উৎস এখানেই। তবু হ্যামলেটের আপাত-ব্যর্থ উদ্যমহীনতাও একেবারে লক্ষ্যহীন হয়নি। সম্বোধ্যমানতার প্রক্রিয়াই কেন্দ্রীয় গুরুত্বসম্পন্ন ; শেক্সপীয়ার এই সত্যকে বহুস্বরিক

ও অনেকার্থদ্যোতক নাট্য-পাঠকৃতির মধ্যে নিঃসন্দেহে শিরোপা দিয়েছেন। মনে পড়ে এই দার্শনিক সূক্তি: সমস্ত সত্যই সত্যভ্রম থেকে নিষ্ক্রমণের এবং ধূসর নিরালোক থেকে উদ্ভাসনে পৌঁছানোর বার্তা।

এর আগে হ্যামলেটের বাচনে যে লক্ষ করেছি — 'I do not know/why yet I live to say 'this things to do' — এই বিমূঢ়তা এলিজাবেথীয় যুগে যে-সমস্ত বস্তুগত, নৈতিক ও অধিবিদ্যাগত পরিস্থিতির ফলে উদ্ভূত হয়ে থাকুক না কেন, আমাদের সাম্প্রতিক অনন্বয়ক্লিষ্ট জগতেও তা পুনরুচ্চারিত হতে পারে। জ্ঞান-কৃত্য-জীবনকে ঘিরে-রাখা রহস্যকুহেলি ভেদ করে মূল্যমান নির্ণয়ের প্রক্রিয়ায় বৈধতার উপলব্ধিতে পৌঁছানো খুব কঠিন। মৃত বাবার প্রেতাত্মা যে বিস্ফোরক সংবাদ দিয়ে যায় এবং মৃত্যুজনিত দেনা শোধ করার জন্যে আরও শোচনীয় মৃত্যু-পরম্পরার সূত্রপাত করতে হয় : এই গুরুতর ব্যাপারটিও কেন্দ্রীয় ভাববীজের তুলনায় গৌণ। যৌন সম্পর্কের শুচিতা যারা অমান্য করেছে, হ্যামলেটের সেই মা ও কাকার শাস্তির ব্যবস্থা কীভাবে হবে : এই বিষয়টিও গৌণ। আমরা জানিনা কেন, বিপুল পাতকের অনিচ্ছুক পর্যবেক্ষক হয়েও, বেঁচে থাকতে হয় এবং বেঁচে থাকি বলেই কর্তব্য-অকর্তব্য সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় : নানা বাচনে নানা ভাবে ফিরে-ফিরে এসেছে মীমাংসাহীন প্রশ্নের বিচ্ছুরণ। শুধু স্বগত কথনেই নয়, সম্বোধিত নাট্য-চরিত্রের সঙ্গে কথোপকথনেও, হ্যামলেট অবিরত নিজের মুখোমুখি হয়। নিজেকেই প্রশ্ন করে : জীবন কী, বেঁচে থাকা কাকে বলে, বাঁচাকে মর্যাদাময় করতে হলে কীভাবে সর্বব্যাপ্ত বিকার ও বিদূষণবোধের সঙ্গে লড়াই করে যেতে হয়? জ্ঞান যদি বিষাদ ও নিঃসঙ্গতা এনে দেয় শুধু, উদ্যম সম্পর্কে সংশয়ী করে তোলে — নিরর্থকতা ও অসাড়তার বোধ থেকে পরিত্রাণ কি নেই তবে? সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় যে-মানুষ বিধুর, তাকে প্রেত-অস্তিত্ব কখনও স্বচ্ছ দিবালোকে চলার মতো উদ্যমের পথ নির্দেশ করতে পারে কি? আমরা যেভাবে বাঁচি, আমাদের জ্ঞান ও কৃত্য তো সেই প্রক্রিয়ার উদ্ভাসন ও অন্ধবিন্দুর দ্বিরালাপে গ্রথিত হবেই। বাঁচার অর্থ খুঁজতে খুঁজতে, ঐ গ্রন্থনার অভাবেই কি, হ্যামলেটের বাঁচার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল?

চার

মানুষের সম্ভাবনার যে শেষ নেই, ট্র্যাজেডির ভারাক্রান্ত আবহেও একথা লিখতে ক্লান্ত হননি শেক্সপীয়ার। হ্যামলেট নাটকে স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির অভাব নেই যদিও, তাদের মধ্যেও মানুষের এই বন্দনা চমৎকার :

> 'What a piece of work is a man! how noble in reason!
> how infinite in faculty! in form and moving how express

and admirable! in action how
Like an angel! in apprehension how like a god!'

মানুষের চেয়ে বড়ো শিল্পকর্ম আর কী আছে : এই উপলব্ধির সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য তুলনাহীন। কিন্তু হ্যামলেট শুধুমাত্র এই আদর্শায়িত ভাবনার দৃষ্টান্ত নয় যে, তা রোজেনক্রানৎস্ ও গিল্ডেনস্টার্নের প্রসঙ্গে স্পষ্ট। সম্মান যখন বিপন্ন, মান্যতা কী পেয়ে যায় 'to find quarrel in a straw' ! কিন্তু এই বিষয়টি এখানে বিশদ করছি না। এই সবই প্রমাণ করছে যে প্রধান চলার পথ থেকে ক্রমাগত বিচ্যুত হয়ে হ্যামলেট সরে যায় শাখা-পথে অথবা বিপথে। রাজা ক্লডিয়াসের প্রতারক জগতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয় নাট্য-প্রপঞ্চের মধ্যে সমান্তরাল প্রপঞ্চ তৈরি করে। অর্থাৎ ঘাতকের ছদ্মবেশ খুলে ফেলার জন্যে নিজেকে ছদ্মবেশ পরে নিতে হয়। যেহেতু হ্যামলেটের জগৎ স্বভাবধর্মে মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক জগৎ, পাপ-পুণ্য প্রতাপ-লালসা উৎসারিত হয় মঙ্গল-অমঙ্গলের দ্বৈততা থেকে। ক্লডিয়াসের মধ্যে রাজকীয় প্রতাপ ও যৌন লালসা যেমন একাকার হয়ে গেছে, তেমন-ই বিপ্রতীপ অবস্থানে হ্যামলেটের সত্তায় অন্য ধরনের দ্বৈততা জটিল প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। প্রতীয়মানের প্রবঞ্চনা ও বিদূষণের বিকার জনিত অধিবিদ্যাগত সংকট সম্পর্কে বেশি মনোযোগী হওয়ার ফলে তার স্বভাবের ভারসাম্য বিচলিত হয়ে গেছে। এক ধরনের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য, মাত্রাতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া, নিষ্ক্রিয়তার তাত্ত্বিক সমর্থন সন্ধান :এই সবই আস্তিত্বিক ট্র্যাজেডি অর্থাৎ বিনাশের দহনবেলার প্রতি ইঙ্গিত করে। 'I must be cruel only to be kind' যেন আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো শোনায় ; আসলে এ তার আত্মপ্রতারণা যার আরও একটি বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ করি তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে। সেখানে প্রার্থনারত ক্লডিয়াসকে হত্যা না-করার পক্ষে যুক্তি ক্যাথলিক ভাববিশ্বের মধ্যে খুঁজে নেয় হ্যামলেট :

'that his heels may kick at Heaven,
And that his soul may be as damn'd and black ?
As Hell, where to it goes.'

কিন্তু তাতে মানুষের প্রাগুক্ত শিল্পসুষমা কি আচ্ছন্ন হয়ে যায় না ? এই আচ্ছন্নতা আপাত, কেননা মানুষের অস্তায়মান সত্তার একবাচনিক উপস্থাপনা কাম্য নয় শেক্সপীয়ারের ; তিনি লক্ষ করেন অস্তাচলগামী সূর্যের বিষণ্ণ মহিমা। নাটকের শুরুতে যে উত্তুঙ্গ বেদনাবোধে বাঁধা হয়েছিল বয়ানের সুর — 'How weary, stale, flat and unprofitable,/ Seem to me all the uses of this world' — তারই বিচ্ছুরণ বজায় থেকেছে আগাগোড়া। শেষ পর্যন্ত যখন সমে পৌছেছে পাঠকৃতি, নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে চরাচরে। সম্বোধিত জগতের প্রতিনিধি হয়ে হোরেশিও বিদায় জানিয়েছে মহিমান্বিত মানুষকেই, বিচূর্ণিত টুকরো-

মানুষকে নয় :

'Now cracks a noble heart. Good
night. sweet prince :
And flights of angels sing thee to thy rest'!

নৈঃশব্দ্যময় এই চিরবিশ্রামের জন্যে কী ধরনের প্রস্তুতি নিতে পারে পতনশীল মানুষ? পতনের চিহ্নায়িত বাচন ব্যবহার করেছিল স্বয়ং হ্যামলেট এবং কথাটা বলেছিল হোরেশিও-কেই :

'There's a special providence in the fall of a sparrow. If it be now. 'tis not to come — if it be not to come, it will be now — if it be not now. yet it will come — the readiness is all'। এই যে বলা হলো বাচনের অন্তিম অংশে, প্রস্তুতিই সব, এর সঙ্গে কিং লীয়ারের একটি প্রবাদ-প্রতিম কথার কী আশ্চর্য সাদৃশ্য : 'Ripeness is all'। অর্থাৎ প্রস্তুতিই পরিণতি : এই দ্যোতনা স্পষ্ট। প্রশ্ন এই, হ্যামলেটের আপাত-দ্বিধা ও নিষ্ক্রিয়তা কি ছদ্মবেশ, সত্তার পরিণতির আড়াল করার জন্যে? তাহলে, পথ হারিয়ে পথ ফিরে পাওয়ার কেন্দ্রীয় রূপক প্রচ্ছন্ন রয়েছে কি প্রাগুক্ত ঐ 'readiness'এর মধ্যে! কিন্তু বাস্তব নামক গোলকধাঁধা হ্যামলেটের আত্মিক সংকট বাড়িয়ে দেয় শুধু ; তার স্বভাব থেকে মানবিক মাধুর্য ও উত্তাপ ক্রমশ ঝরে যেতে থাকে। জি. উইলসন নাইট যেসব 'obvious symptoms of spiritual atrophy' (১৯৬৪ : ২৪) এর কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের প্রভাবে ঈপ্সিত প্রস্তুতির প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয় বার বার।

হ্যামলেটের মনে যে নিরবচ্ছিন্ন আত্মহননের প্রক্রিয়া শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে, তা তাকে নেতিবাচক চেতনার অন্ধপথে চালিত করে। ক্রিয়া থাকে না, ক্রিয়ার ভান থাকে কেবল; জ্ঞান থাকে না, জ্ঞানের বিচূর্ণায়ন থাকে। বিদূষণের হেতুকে যদি আঘাত করতে পারত, হ্যামলেটের আত্মপীড়ার সঙ্গে ডেনমার্কের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পরিসরের বিকার থেকেও আরোগ্য হত। কিন্তু নেতি-চৈতন্য হ্যামলেটকে আরোগ্য ও পুনঃসৃষ্টির পথে যেতে দেয় না। অর্থাৎ মৃত্যু ও ক্ষয় থেকে জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে পারে না সে। শেক্সপীয়ারের চিহ্নায়ন প্রকরণকে বিশদ করে এই পাঠ আমরা, সাম্প্রতিক বিকার ও নির্মাণবায়নে ক্লিষ্ট প্রতীত বাস্তবের পরিধিতে, নিতে পারি : অসুখ, তিক্ত নৈরাশ্য ও মৃত্যু-এষণা দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজের বহুমাত্রিক পীড়ার উপশম করা যায় না। আরোগ্যে পৌঁছাতে হলে জীবনের পাণ্ডুলিপিতে আস্থা রাখতে হয়। এলিজাবেথীয় যুগেও তো পুনর্নির্মিত-ই হয়েছিল হ্যামলেটের আখ্যান। স্যাক্সো গ্রামাটিকাসের (১১৮০-১২০৮) এবং 'হিস্টরিয়া ডেনিকা'য় হ্যামলেটের প্রতিশোধমূলক উপাখ্যান আদিম যুগের রক্তপিপাসা থেকে উদ্ভূত

হলেও শেক্সপীয়ার তার গদ্যরূপ (Hystorie of Hamlet) ও প্রত্ন-নাট্যরূপ থেকে ভিন্ন ধরনের সংকেত নিশ্চয় পেয়েছিলেন। আর, তাঁর নিজস্ব কালের মূল্যবোধ ও আপন সৃষ্টিশীল সূক্ষ্ম কল্পনা অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্তও করে নিয়েছিলেন। প্রতিবার পুনঃপাঠে তাৎপর্য রূপান্তরিত হয়ে যায়। অতএব এখনকার পাঠকেরাও শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট থেকে নতুন ধরনের চিহ্নতাত্ত্বিক বিন্যাস খুঁজে নিচ্ছেন। এর নির্যাস নিয়ে বিতর্ক হোক ; বিতর্ক থেকেই বুঝে নেব, চার শতাব্দী আগের পাঠকৃতি থেকে কীভাবে জীবনের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে নেওয়া যায়।

হ্যামলেট জীবনকে বন্দিশালা ভেবে নিজেই নিজের রুদ্ধতার হেতু হয়েছিল। তার চেতনা পক্ষাঘাতগ্রস্ত; তাই অসাড়, মৃত্যু-ক্ষয়-বিকারের নিষ্করুণ অনুশোচনায় জীবন্মৃত হয়ে বেঁচেছিল বলে মুক্তি সে পায় নি। 'thoughts beyond the reaches of our souls' তাকে পীড়িত করেছিল বলে চিন্তা-পীড়া থেকে আরোগ্য এল না। এ সময় আমরাও চারদিকে দেখতে পাই স্বয়ংবৃত রুদ্ধতার অচলায়তন ; নিজেরাই নিজেদের চেতনাকে অসাড় ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলি। আমাদের যাবতীয় বয়ানের লক্ষ্য যদি হয় নির্মাণবায়নের আশঙ্কায় বিপন্ন মানুষের মানব-প্রকল্প পুনরুদ্ধার করা, হ্যামলেটের পতনকে দেখব উদ্ভাসনের বিপ্রতীপ উপস্থাপনা হিসেবে। অন্তিম বাচন থেকে আহৃত নিগূঢ় সংকেত অনুযায়ী মৃত্যু ও উৎসবে (felicity) তখন, বাখতিনের প্রসিদ্ধ তাৎপর্যতত্ত্ব-বিষয়ক আকল্প অনুযায়ী, মৃত্যুর দ্বিবাচনিক দর্পণে দহনক্লিষ্ট জীবনের নতুন পাঠ শুরু হবে। হোরেশিও-র মধ্য দিয়ে প্রতিটি উত্তর-প্রজন্মে নবায়িত হচ্ছে এই বার্তা : 'Absent thee from felicity awhile,/ And in this harsh world, draw thy breath in pain/ To tell my story.....'

হ্যাঁ, হ্যামলেটের কাহিনি প্রতিটি নতুন প্রজন্ম দেশে-দেশে তার যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযায়ী নতুন ভাষায় নতুন ভাষ্যে বলবে। বলবে, 'because the word has power to disclose a world variously expressed as a new mode of being or new forms of life.' (ম্যাক্‌করমিক : ১৯৮৮ : ১৯৪)।

ফাউস্ট : একটি পাঠ-প্রস্তাবনা

প্রতিটি নতুন প্রজন্ম বিশ্বসাহিত্যের কালোত্তীর্ণ পাঠকৃতিকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করে নেয় পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে। মহাসময়ের তাৎপর্য বুঝে নিতে চায় নিজস্ব খণ্ডসময় ও খণ্ডপরিসরের দর্পণে। এইজন্যে আমাদের হোমার-ভার্জিল-সফোক্লিস-দান্তে-শেক্সপীয়ার-মিল্টন নিশ্চয় পিতামহ-প্রপিতামহদের চেতনা অনুযায়ী আবিষ্কৃত হন না। এমনকি সমসাময়িক কালেও একই ধ্রুপদী পাঠকৃতি গ্রহীতা-পাঠকের অবস্থান অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন তাৎপর্যের দ্যোতনা নিয়ে আসে। তা যদি না হত, নারীচেতনাবাদী কিংবা উপনিবেশোত্তরচেতনাবাদী পাঠ অন্য সব গতানুগতিক পাঠ থেকে আলাদা হত না। জোহান হুলগ্যাঙ্গ ভন গ্যয়ঠের অমর নাট্যসন্দর্ভ ফাউস্ট সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। শুধু তাঁর নিজের দেশ জার্মানি বা মহাদেশ ইউরোপের পাঠকদের এই অভিজ্ঞতা নয়, পুরোপুরি ভিন্ন ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিসরের বাসিন্দা বাঙালিদেরও উপলব্ধি সময়ের পর্ব থেকে পর্বান্তরে বদলে যেতে বাধ্য। ফাউস্টের মতো ধ্রুপদী পাঠকৃতিতে এত অজস্র স্তর, কৌণিকতা, অন্তর্বয়ন এবং প্রবেশবিন্দু ও নির্গমবিন্দুর সমাবেশ ঘটেছে যে উমবের্তো একো কথিত 'aesthetic dialectics between openness and closedness of texts' (১৯৮৪ : ৩৯) এর সাধারণ বিধি দিয়ে বহুস্বরিক তাৎপর্যের নাগাল পাওয়া শক্ত। গ্যয়ঠের ফাউস্ট একক পাঠকৃতি নিশ্চয় ; কিন্তু কিছুতেই এই তথ্য ভুলতে পারি না যে তা বহুরৈখিক ও বহুতলযুক্ত ফাউস্ট-আখ্যান-পরম্পরার কল্পনানিষিক্ত পরিণত ফসল। গ্যয়ঠে সর্বতোমুক্ত পাঠকৃতিতে দেশ-কালগত পরিমিতি পেরিয়ে গেছেন।

এইজন্যে, একোর বাচনে, বাঙালি পাঠকেরাও অন্য সব দেশের পড়ুয়াদের মতো বলতে পারেন : 'We see it as the end product of an author's effort to arrange a sequence of communicative effects in such a way that each individual addressee can refashion the original composition devised by the author.' (তদেব : ৪৯)। সংযোগসূচক পরিণামের ক্রম-বিন্যাসে লেখকের প্রয়াস হিসেবে যদি পাঠকৃতিকে গ্রহণ করি, প্রত্যেক নতুন গ্রহীতাই লেখক-রচিত মূল পাঠের তাৎপর্যকে পুনর্বিন্যস্ত করতে পারেন। কিন্তু ধ্রুপদী সন্দর্ভের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা থেকেই যায়। যেমন ফাউস্টের তাৎপর্য শুধুমাত্র গ্যয়ঠের মতো মহাকবির উত্তুঙ্গ কল্পনাপ্রতিভার ওপরও নির্ভর করছে না। এই ভাববস্তুর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ ও নিরন্তর বিনির্মাণ কীভাবে হলো, সতর্কভাবে পাঠককে তা বিবেচনা করতে হয়। নানা দেশে নানা কালে নানা অবস্থানে পড়ুয়ারা মুক্ত পাঠকৃতির দিগন্তকে যত প্রসারিতই করুন, ক্রমবিকশিত ও বিনির্মিত ভাববস্তুর

সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত মনে রেখেই তাঁদের এগোতে হয়। বাখতিনীয় সমালোচনা ধারায় যাকে সম্বোধ্যমানতা বা প্রত্যুত্তরযোগ্যতা বলি, ধ্রুপদী পাঠকৃতির অনুশীলনে তা সম্ভবত বেশ জরুরি। আরো একবার একোর কাছে ফিরে যেতে পারি আমরা, যেখানে তিনি সম্বোধিত পাঠকের সংবেদনশীল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে লিখেছেন: 'As he reacts to the play of stimuli and his own response to their patterning, the individual addressee is bound to supply his own existential credentials, the sense conditioning which is peculiarly his own, a defined culture, a set of tastes, personal inclinations and prejudices. Thus his comprehension of the original artifact is always modified by his particular and individual perspective. In fact, the form of the work of art gains its aesthetic validity precisely in proportion to the number of different perspectives from which it can be viewed and understood.' (তদেব)

ফাউস্টের পাঠকৃতিও যদি একক সম্বোধিত পাঠকের মধ্যে নিজস্ব ধরনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে থাকে, তাহলে তাতে গ্রহীতার একান্ত অনুভূতি-লালিত অস্তিত্বের অভিজ্ঞানই খুঁজব আমরা। এই প্রতিক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি নেই কেননা নিজের ব্যক্তিগত রুচি-প্রবণতা-সাংস্কৃতিক বোধ-পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী তা চেতনা ও অবচেতনার গ্রন্থনায় গড়ে ওঠে। একেকটি পাঠ মানে একেকটি প্রেক্ষিত। প্রেক্ষিত যেমন নির্দিষ্ট, উপলব্ধির মাত্রাও তেমনি। একজনের জীবন যেমন অন্য কেউ যাপন করতে পারে না, তেমনি একজনের মনন ও চেতনা মথিত তাৎপর্য আরেকজনের উপলব্ধিতে হুবহু আসতে পারে না। ফাউস্টের মতো মহৎ শিল্পকর্মের অন্তর্বস্তু ও প্রকরণ কোন্ ধরনের নান্দনিক মান্যতা পাবে, তা গ্রহীতার কালপর্ব ও সামাজিক পরিসর একান্ত নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী নির্ণয় করে। প্রেক্ষণবিন্দু যত বাড়ে, অর্থোপপত্তির ধরনও তো বেড়ে যায়। বাঙালির মধ্যে অগ্রণী পড়ুয়া রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কোনো পাঠকৃতির বিচার করেছেন, আজকের বাঙালি পাঠক নিশ্চয় সেভাবে দেখবেন না। তাঁর জগৎ আমূল বদলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে প্রতিবেদনের অণুবিশ্বও। প্রতিটি নতুন পাঠ মানে নতুন অর্জন, নতুন ভাষ্য, তাৎপর্যের নতুন আলো ও ধুপছায়া। তাই 'Every reception of a work of art is both an interpretation and a performance of it, because in every reception the work takes on a fresh perspective for itself' (তদেব)। আমরা যারা মূল জার্মানে ফাউস্ট পড়ার সুযোগ পাই নি, ইংরেজি অনুবাদে পড়েছি— অনিবার্য খেদ সত্ত্বেও ঐ যুগপৎ 'interpretation' ও 'performance' হওয়ার মধ্যে অসামান্য পাঠকৃতির আশ্চর্য সজীবতার কারণ খুঁজে পাই। এ এমন সন্দর্ভ যেখানে পাঠক হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার অংশীদার

নন কেবল, অন্যতম কুশীলব না-হয়ে তাঁর উপায় থাকে না। যত পড়ি, দ্রৌপদীর শাড়ির মতো অন্তহীন মনে হয় বয়ানকে, মনে হয় দুরধিগম্য। একদিকে ফাউস্ট মানব-স্বরূপের জন্যে শ্রেয় ও প্রেয়োমার্গের ব্যবধান সম্পর্কিত জ্ঞানতাত্ত্বিক আকল্প তুলে ধরছে, অন্যদিকে তাকে প্রতিপন্ন করছে অজ্ঞেয় রহস্যের গ্রন্থনা বলে। কতদূর যেতে পারে মানুষ এবং কতটুকু পর্যন্ত ঔচিত্যের সীমা — গ্যয়ঠে কি দেখাতে চেয়েছেন? অথবা মানবতাকে তিনি আসলে কল্পনাপ্রতিভার নির্মিতি বলে বোঝাতে চান? জ্ঞান ও প্রতাপের জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিষয়ে ফাউস্ট কি তাঁর প্রতিবেদন মাত্র?

সাইরাস হ্যামলিন 'Reading Faust' নিবন্ধে মন্তব্য করেছেন : 'The true subject of our greatest works, held up to us as if in a magic mirror to transform the image which we project onto them, is the ideal of our own humanity'। কিন্তু ফাউস্টে মানবতার কোন্ আদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়েছে? ঐন্দ্রজালিক দর্পণ হয়ে কোন্ ভাবমূর্তিকে রূপান্তরিত করেছে? মানুষকে আমরা বুঝতে চাই সংযোগের জন্যে নিয়ত ব্যাকুলতায়। কিন্তু সেই মানুষ যখন বিয়োগের পথে যায়, নিজের অস্তিত্বের মধ্যে অনন্বয়ের বিষবীজাণু নিজেই সংক্রামিত করে — অতলান্ত ট্র্যাজেডি থেকে কোন্ নির্যাস আহরণ করি! প্রাজ্ঞজন যখন শয়তানের সঙ্গে আত্মাবলুপ্তির চুক্তি করে, এই অ্যালিগরি কি কেবল মধ্যযুগের আবহে সীমিত হয়ে যায়, নাকি, নতুন-নতুন তাৎপর্য নিয়ে পৌঁছে যায় একুশ শতকের জটিল বেলাভূমিতেও! ফাউস্ট যেন দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশিখরের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাদের। প্রভূত পাঠ-অভিজ্ঞতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছাড়া ঐ শিখর আরোহণের দুর্গম পথে অভিযাত্রী হওয়ার কথা ভাবাই যায় না। বিপুল প্রত্যাশার ভার শুরুতেই আমাদের উপর চেপে বসে। কারণ, রচনায় নিহিত আকরণ-চেতনা ও অর্থগত ঐক্যপ্রতীতিতে নিজে থেকে ধরা দেয় না, তাদের আবিষ্কার করে নিতে হয়। অভ্যস্ত পূর্বানুমান দিয়ে তা সম্ভব হয় না। এছাড়া এ বিষয়ে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা তৈরি করেছে পূর্বজদের পাণ্ডিত্য ও ধীমান সমালোচনা। অর্থাৎ গ্রহীতা-পাঠকদের ফাউস্ট-পরিশীলনের দীর্ঘ ইতিহাস মূল পাঠকৃতির উপর অনিবার্য প্রভাব ফেলেছে। আমরা ঐ ইতিহাস যদি বা সামান্যমাত্র জেনে থাকি, ফাউস্ট-পাঠ-পরম্পরার দীর্ঘায়িত ছায়া আমাদের পক্ষেও এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্যভাবে বলা যায়, ঐসব পরিশীলন মূল পাঠকৃতিতে প্রচ্ছায়ার মতো সংলগ্ন। প্রশ্ন এই, প্রতিটি পাঠক-প্রজন্ম কিংবা পাঠক-পরিসর যদি নিজের মনন-কল্পনা-বিশ্লেষণ-ইচ্ছাপূরণ দিয়ে পাঠকৃতিকে রঞ্জিত করে থাকে এবং পড়ার প্রাক্-প্রস্তুতি সমাধা করতে গিয়ে ঐ রঞ্জন ক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়— তাহলে তো ফাউস্টের তাৎপর্য সর্বদাই গ্রহীতার নিজস্ব সময়ের অনুগামী হবে।

কিন্তু সময়ে সবটাই তো সূর্যালোক থাকে না, কুয়াশা আর ধূপছায়াও থাকে। ফলে

ফাউস্ট-পাঠেও তার ছাপ পড়তে বাধ্য। একটু আগে 'interpretation' ও 'performance' এর কথা লিখেছি। এই দুই প্রবণতার যুগলবন্দি শুধু পাঠকের নয়, স্বয়ং গ্যয়ঠে ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁর সৃষ্টিচেতনায় এদের দ্বিরালাপ অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। কতবার নির্মিতির উপকরণ ও আকল্প পুনর্গঠিত হয়েছে, তা ভেবে বিস্মিত হতে হয়। পাঠকৃতির হয়ে ওঠার এই দীর্ঘ, অনন্য ও ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেহেতু জরুরি — ধৈর্য, অধ্যবসায় ও মেধাশ্রম ছাড়া ফাউস্টের মুখোমুখি হওয়া যায় না। যাঁরা জার্মান ভাষায় বইটি পড়েননি কিংবা যাঁরা নবার্জিত কৌতূহলে পড়তে শুরু করেছেন — তাঁরা কেউই বহুপ্রজন্মব্যাপী পাঠপরম্পরা, পাঠকৃতির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত এবং পাঠকৃতির হয়ে ওঠার ইতিহাস সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেন না। তার মানে, ফাউস্ট পড়া মানে পাঠকেরও হয়ে ওঠা ; নিছক পাঠকসত্তার নির্মিতির কথা বলছি না, এ আসলে নিয়ত- গ্রহিষ্ণু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নির্মাণ। এভাবে গ্যয়ঠে আমাদেরও চেতনা থেকে অনেক অদৃশ্য ও অজ্ঞাত পর্দা সরিয়ে দেন; জীবনের চিরকালীন নাট্যমঞ্চে জ্ঞান ও প্রতাপ, অস্তিত্ব ও আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও নৈতিকতা, একক নির্জনতা ও সামাজিক চর্যার জটিল গ্রন্থনা সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। যুগপৎ জিজ্ঞাসু ও বিপন্ন হই হয়তো কিংবা ত্রস্ত ও বিহ্বল — কিন্তু এই পাঠকৃতি গহন নীল অরণ্য, ঊর্মিমুখর বিশাল সমুদ্র আর দুর্গম উত্তুঙ্গ পর্বতের মতো অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণও তৈরি করে। সাইরাস হ্যামলিন ঠিকই লিখেছেন : "The drama invites a constant revision of response because the unique history of its own composition so clearly involved the same kind of activity. The great books move through time like ships upon the sea, accumulating the effects of scholarship like barnacles and seaweed. Though the structure remains unimpaired, the appearance changes."

যাকে 'প্রতিক্রিয়ার পুনর্বিবেচনা' বলা হলো, তা নিরন্তর ঘটমান পাঠ-প্রক্রিয়ার ঈপ্সিত ফসল। কিন্তু সমালোচক যাকে 'appearance' বলছেন, তা তত্ত্ববস্তু না অবভাস ? কোনো বিশেষ ধারার পাঠক যে-তাৎপর্যে পৌঁছাচ্ছেন, তা কি নির্বিশেষ সত্য হতে পারে ? অথবা নির্বিশেষ সত্যের ধারণাও সত্যভ্রম মাত্র ! ফাউস্টের মতো কালজয়ী ধ্রুপদী পাঠকৃতি নিরন্তর বিশেষ সত্যের বিচ্ছুরণ ঘটিয়ে যাবে। সেখানে তাৎপর্য-সঞ্চরণের কোনো নির্বিশেষ ভরকেন্দ্র খুঁজে লাভ নেই। এই নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্ক হতে পারে নিশ্চয়, কিন্তু আপাতত তার প্রয়োজন নেই। আমরা লক্ষ করি, মোটামুটি তিনটি প্রধান ধারায় বিবর্তিত হয়েছে ফাউস্ট-ভাষ্য : দার্শনিক ব্যাখ্যা, ফাউস্ট -প্রত্নকথার উৎস বিষয়ে প্রাচীনপন্থী গবেষণা এবং ফাউস্টের সঙ্গে জার্মানির নিবিড় সম্পর্ক। গ্যয়ঠের সমসাময়িক চিন্তাবিদেরা যেসব দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলেন, মূলত তাঁদের লক্ষ্য ছিল রচনার বিভিন্ন তাত্ত্বিক

অন্বীক্ষাগত বিমূর্ততা। ফ্রিডরিখ শ্লেগেল, শেলিং ও হেগেলের ভাষ্য সেই সময়কার তত্ত্ববিশ্ব সম্পর্কে আলোকপাত করে নিশ্চয়, কিন্তু ধ্রুপদী সাহিত্যের সাম্প্রতিক পাঠে এদের প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি দেখা যায় না। ঐ দার্শনিক ব্যাখ্যাগুলির পরাপাঠ-প্রসঙ্গে একটু পরে আসতে চাই। আপাতত ফাউস্ট-প্রত্নকথার উৎসভূমি এবং তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে, সেদিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

ঠিক কবে যে ফাউস্ট -কিংবদন্তির সূত্রপাত হয়েছিল এবং কী ছিল তার প্রাথমিক রূপ— এখন তা আর নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। অপরিমেয় জ্ঞান ও প্রতাপের বিনিময়ে নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে কেউ — বিষয়টি খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের দুনিয়ায় একমাত্রিক ছিল না কখনো। নানা অনুষঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে মূল ভাববীজ বিভিন্ন তাৎপর্যে অঙ্কুরিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। প্রাচীনতর পর্যায়ে যিনি হয়তো ছিলেন প্রাচ্যদেশ থেকে আগত যাদু-পুরোহিত ও সম্মানিত জ্ঞানী পুরুষ, খ্রিস্টিয় পরিমণ্ডলে তাঁর ভাবমূর্তি ক্রমাগত ম্লান ও জীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভণ্ড ও ভানসর্বস্ব হাতুড়ে বৈদ্যতে রূপান্তরিত হলো। এই ভ্রষ্ট মানুষটিকে ইহজীবনে যেমন শাস্তি পেতে হয়, তেমনি মৃত্যুর পরেও অনন্ত কালের জন্যে নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। মধ্যযুগ জুড়ে ডাইনি, যাদুকর, অপরাসায়নিক ও ভোজবাজি-প্রদর্শকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের মনে যে সম্ভ্রম ও আতঙ্ক বিরাজ করত — সেই প্রবণতায় ফাউস্টের চরম দুর্বিপাক কল্পিত হয়েছে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে কিংবদন্তির উৎস কেবল ঘৃণা ও ভয় ; কেননা অমিতশক্তিধর মানুষটির পথ গোপনে অনুসরণ করার তাগিদও কম ছিল না তখন। সমাজ-মনের এই স্ববিরোধিতা থেকেই ফাউস্ট-কিংবদন্তি কালে-কালান্তরে শাখা-প্রশাখায় বিবর্তিত হয়েছে। বহুস্বরিক সত্তায় আত্মহনন ও কূটাভাসের পরিসর সন্ধান করেছে নানা যুগের মানুষ, তবে অবশ্যই তাদের নিজস্ব পরিভাষায়।

সাধারণত অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনতার মধ্যে অলৌকিক ও লোকনৈতিক উপাদান সম্বলিত জনপ্রিয় লোককথা হিসেবে বহুল প্রচারিত ছিল ফাউস্ট-আখ্যানমালা— তা সহজেই অনুমান করা যায়। সতেরো শতকের সংস্কারবাদী ও ডাইনি শিকারীরা ঐসব কিংবদন্তিকে বেছে নিয়েছিল নিজেদের প্রয়োজনে। সাধারণ মানুষকে যা পাওয়ার অনুমতি দেওয়া যায় না, এমন কি যা চাওয়াও গর্হিত, কালো যাদু দিয়ে সেই জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলে ন্যায়ের রুদ্র দীপ্ত দণ্ড নেমে আসবে অবধারিত ভাবে — এই ছিল বার্তা। ফাউস্ট যত গুণী হোন না কেন, শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে তিনি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বিধিবিন্যাস লঙ্ঘন করেছেন। অতএব তাঁর উপর বর্ষিত কঠোর দণ্ডাজ্ঞা ও শোচনীয় পরিণাম লক্ষ করে আমজনতা যেন জীবনে পালনীয় চর্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে।

এভাবে ফাউস্ট হয়ে উঠেছেন অবিস্মরণীয় আদিকল্প। কেউ কেউ ভেবেছেন, ষোল শতকের শুরুতে জার্মানিতে সত্যিই একজন ব্যক্তি ছিলেন। পরে পূর্বতন সময়ের লোককথা ও কিংবদন্তি তাঁর জীবনকথার সঙ্গে জড়িয়ে যায় এবং নতুনভাবে পল্লবিত হতে শুরু করে। আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি, ইতিহাস কেবল তথ্যের বয়ন করে না ; কখনো কখনো প্রকল্পনা ও প্রণালীবদ্ধ কুহক দিয়ে সমান্তরাল প্রতিবেদনও তৈরি করে নেয়। ফাউস্ট-কথামালার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। স্যান্ডি সুলমান লিখেছেন : 'The historical Faust may be regarded as little more than a pebble round which has gathered the moss of later legend' (১৯৮৫ : ৯২২)। এক সময় ভাবা হত, জোহান ফুস্ট (বা ফাউস্ট) নামে মুদ্রাকর যাঁর জন্ম ১৪০০ সালে এবং ১৪৬৬তে প্লেগ রোগে যাঁর মৃত্যু, ঐসব কিংবদন্তির ভিত্তি। কিন্তু সেই বক্তব্য পরে বাতিল হয়ে গেছে। মুশকিল এই যে, কুশাগ্রধী ও তথ্যসচেতন পণ্ডিতেরা অজস্রবার চুলচেরা বিশ্লেষণ বা বিতর্ক করেও 'বাস্তব' ফাউস্ট সম্পর্কে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। এখনও তথ্যানুষঙ্গগুলি অস্পষ্ট এবং রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা। প্রকল্পনা ও ইচ্ছাপূরণ যখন সূক্ষ্মভাবে বাস্তবকে নির্মাণ করতে থাকে, নথিপত্রগুলির বিপুল পরস্পর-বিরোধিতা কেবল সংশয়ের পরিধি বাড়িয়ে দেয়।

সমাধান হিসেবে ইদানীং বলা হচ্ছে, দু'ধরনের আপাতগ্রাহ্য পূর্বানুমান বিবেচনা করা যেতে পারে। সম্ভবত ফাউস্ট নামের 'বাস্তব' মানুষটি ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাউডেব মতো দ্বৈত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন :একদিকে ধর্মতত্ত্বের সম্মানিত প্রচারক ও অন্যদিকে অশ্রদ্ধেয় কালো যাদুর সৌখিন অনুগামী। কিংবা ফাউস্ট উপাধি বিশিষ্ট দুজন আলাদা মানুষ ছিলেন ; তাঁদের একজন জর্জিয়াস, অন্যজন জোহান। ই.এম. বাটলার 'The Fortunes of Faust' বইতে (কেমব্রিজ : ১৯৭৯) এই তত্ত্ব দিয়েছেন যে জর্জিয়াস ও জোহান সম্ভবত যমজভাই। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা গেছে, কোনো এক ফাউস্ট জানিয়েছিলেন, তাঁর নাম হলো জর্জিয়াস স্যাবেলিকাস ফস্টাস জুনিয়র। এই ব্যক্তি দাবি জানাতেন, তিনি প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে দক্ষ, জ্যোতিষী, অপরাসায়নিক, ভবিষ্যৎ-বক্তা এবং অলোকদৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। জার্মানির স্পানহাইমের অ্যাবে ট্রিথাইম পদবিযুক্ত জনৈক ধর্মযাজক ১৫০৭ সালের একটি চিঠিতে ঐ ফাউস্টকে বিপুল ঘৃণার সঙ্গে 'নির্বোধ, বুজরুক, শূন্যগর্ভ, আত্মম্ভরী ও হাতুড়ে' বলে বর্ণনা করেছিলেন। ঐ সময়কার আরো কয়েকজন লেখক এই মানুষটি সম্পর্কে একই ধরনের খারাপ ধারণা পোষণ করতেন। তথ্য থেকে জানা যায়, চূড়ান্ত নিন্দনীয় লাম্পট্যের দায়ে অভিযুক্ত এই লোকটি স্কুলশিক্ষকের পদ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আবার ১৫২৮ সালে হেল্‌ম্‌স্টেড্‌থের ডাঃ জর্জিয়াস ফাউস্ট জ্যোতিষী হিসেবে উদ্ভট সব ঘোষণা করছিল বলে জানা যায়। পরে ভবিষ্যৎ

কথনের দায়ে ইঙ্গোলস্টাড্‌ৎ থেকে তাকে নির্বাসিত হতে হয়। আরো একটি নথিতে দেখা গেছে, ১৫৩২-এ নুরেমবার্গ নগরের কর্মকর্তারা ডাঃ ফস্টাস নামক প্রেতাত্মার সঙ্গে সংযোগস্থাপনকারী ও পায়ুকামী ব্যক্তিকে চারিত্রিক শংসাপত্র দিতে অস্বীকার করেছিলেন।

সে-সময়কার অন্য নথি থেকে জানি, ১৫৩৯ সালে কোনো-এক জোহান ফাউস্ট হাইডেলবার্গ থেকে ধর্মতত্ত্বে ডিগ্রি লাভ করেন। পাণ্ডিত্য ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষের জন্যে ইনি যথেষ্ট সুখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। অথচ চার বছর পরে ১৫৪৩ সালে, জর্জিয়াস ফাউস্ট নামে এক ব্যক্তি হাইডেলবার্গের অধিদেবতা হিসেবে বর্ণিত হচ্ছেন। তাহলে, এসময় জোহানের কী হলো? নাকি জর্জিয়াস আসলে জোহান? এও জানা যাচ্ছে, সে-সময় এলাকার নানা সরাইখানায় ফাউস্ট উপাধিধারী কোনো ব্যক্তি অর্থহীন বাগাড়ম্বর ও বাড়াবাড়ি রকমের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছে। ১৫২০ থেকে ১৫৪০ এর মধ্যে লিখিত বেশ কিছু নথিপত্রে ফাউস্টের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে সংশয় ও অনিশ্চয়তা বেড়েছে কেবল। জোহান ও জর্জিয়াসের মধ্যে কে যে আসল ফাউস্ট এবং কীভাবে অভিজ্ঞান নির্ণীত হবে, এইসব প্রশ্নের কোনো মীমাংসা হয় না। একটু আগে যে দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কথা লিখেছি, এসব কি তার প্রমাণ? নাকি নথিপত্রে দু'জন আলাদা মানুষের বিবরণ পাচ্ছি আমরা? লক্ষণীয় ভাবে ১৫৪০ এর পরে কোনো বাস্তবভিত্তিক অনুপুঙ্খ পাই না ; গুজব ও কিংবদন্তি বাস্তবের মানুষকে পুরোপুরি সরিয়ে দিয়েছে। সম্ভবত এই পর্যায়ে লোককথার স্রষ্টা নিম্নবর্গীয় সমাজ-মন ফাউস্টকে কায়াবান থেকে ছায়ামানুষে রূপান্তরিত করতে শুরু করে। উচ্চবর্গীয় অভিজাত চেতনায় স্বভাবত এই রূপান্তর ছিল গ্রহণের অযোগ্য। এই সূত্রে অত্যন্ত জরুরি একটি কথা বলা যেতে পারে। ফাউস্ট -কিংবদন্তি বা কথামালায় আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতাপবাহিত জ্ঞানতত্ত্বের কৃৎকৌশল যখন কৃতকার্য হয়েছে, পাঠকৃতিতে তথাকথিত নান্দনিক পরিসর গড়ে উঠেছে। আর, ধারাবাহিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ঐ কৃৎকৌশল যখন নিম্নবর্গীয় লোকায়ত মানুষের কাছে পরাভূত হয়েছে — ফাউস্টের অবনমন নথিবদ্ধ হয়েছে গাঢ় কালো রঙে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তখন ঐ প্রক্রিয়া আর অভিজাতসেব্য নান্দনিক পরিসরের বিষয় নয়; প্রান্তিকায়িত লোকসমাজ আখ্যানকে ভিন্ন খাতে বইয়ে নিয়ে গেছে। এই আখ্যানের গভীরে এত অসংখ্য সূক্ষ্ম পর্বসন্ধি ও স্তরবিন্যাস রয়েছে শুধুমাত্র রূপান্তর-প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী বর্গনির্ভর টানাপোড়েন ও ধুপছায়ার প্রভাবে। ফাউস্ট তো প্রতীকী অস্তিত্ব, যা আসলে বহুধা-অস্থির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সমাজের মিথষ্ক্রিয়ার গড়ে-ওঠা 'rallying point' !

সুতরাং ফাউস্টের নামে যতটুকু বাস্তব বিধৃত হয়ে থাকুক না কেন, তার কার্যকলাপে উচ্চবর্গীয়দের অনুমোদন না থাকার ফলে ঐ বাস্তবের এবং সমান্তরাল প্রকল্পনারও শ্রেণিচরিত্র হয়ে গেছে ইতিহাস-নির্দিষ্ট। পরবর্তী পর্যায়ের কিংবদন্তিতে ফাউস্ট উপেক্ষিত

ও ঘৃণিত অন্তেবাসীদের একজন। তাদের সঙ্গে মিশেছেন সেইসব ব্রাত্য পল্লিতে, ভাঙা সরাইখানায় যেখানে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি গাঢ়। ভণ্ড পণ্ডিত, হাতুড়ে, বৈদ্য, বাজিকরদের ছায়াচ্ছন্ন জগতে ফাউস্ট নিজের ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা নিয়ে গর্ব করতেন, আশ্চর্য সব অলৌকিক কাজ করে দেখাতেন। এমনও হতে পারে, সেই ছায়াচ্ছন্ন জগতে কায়ার চেয়ে ছায়া দীর্ঘতর এবং একই কারণে অবয়বও রহস্যে-মোড়া। বাস্তবের সঙ্গে ইন্দ্রজাল মিশে গিয়ে সত্যভ্রম ও সত্য একাকার হয়ে গেছে। লোকমনে ক্রমশ তাতে যুক্ত হয়েছে আরো বিচিত্র উপাদান। এভাবে অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয় লোকসমাজেই ফাউস্টের অলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বভাবত কিছু দিনের মধ্যেই এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো যখন প্রত্যেকে নিজের বিজ্ঞতা প্রমাণ করার জন্যে ফাউস্টের ভুতুড়ে কাজ করার শক্তি, ডাইনিবিদ্যায় পারঙ্গমতা, যাদুবিদ্যা ও ভোজবাজির ক্ষমতার বেশ কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে লাগলেন। তখনকার জনমানস বিনা প্রশ্নে এইসব কল্পকথা মেনে নিয়েছিল। উদ্ভট ও অযৌক্তিক বিষয়ের সহাবস্থান যখন স্বাভাবিক, উচ্চবর্গীয়দের জটিল ধর্মতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার কোনো প্রাসঙ্গিকতা থাকে না। ধীরে ধীরে জনচিত্তে মান্যতাপ্রাপ্ত লোকযান-লোকশ্রুতি-লোককথা হিসেবে তাই ফাউস্ট -কিংবদন্তিমালার অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। কিন্তু সমাজের উঁচুতলার বাসিন্দাদের বিশ্ববীক্ষায় এইসব প্রতিভাত হলো অপরিশীলিত অপর পরিসরের সীমাহীন স্থূলতা ও অজ্ঞতার অভ্রান্ত নিদর্শন বলে। এইজন্যে যাদুবিদ্যা সম্পর্কিত পরিশীলিত প্রতিবেদনে ফাউস্টের স্থান প্রায় হলোই না। অলৌকিক বিষয়কে যাঁরা প্রত্ন-যুক্তিবাদী বা প্রত্ন-মানবতন্ত্রী অবস্থান থেকে প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় সম্পৃক্ত করে নিয়েছিলেন— তাঁদের কাছে ফাউস্টের 'অলৌকিক' কার্যকলাপ ছিল অন্ধজনদের দৃষ্টিহীনতার প্রম্যাণমাত্র। একজন জালিয়াত নিজেকে বাগাড়ম্বর দিয়ে বিরাট যাদুকর বলে জাহির করতে গিয়ে সমস্ত সীমা পেরিয়ে গেছে। নইলে কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তি কি দাবি করতে পারে যে তার অলৌকিক ক্ষমতার কাছে, এমন কি যিশুখ্রিস্টও তুচ্ছ ? কিংবা, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের রচনা যদি কোনোদিন হারিয়েও যায় — সেসব কেবল পুনরুদ্ধারই করবে না ফাউস্ট, আরো উৎকৃষ্টও করে তুলতে পারবে!

তিন

ষোড়শ শতকের মোটামুটি বিশ্বস্ত তথ্যপঞ্জীয়ক ও দানবতত্ত্ববিদ জোহানেস হ্বিয়ের (১৫১৫-১৫৮৮) 'ডে প্রেস্টিজিস ডের্মোনুম' বইতে লিখেছেন, ফাউস্ট ভণ্ড পণ্ডিত, হাতুড়ে আর ছদ্ম-যাদুকর ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাধারণ মানুষদের বিভ্রান্ত করার জন্যে সে প্রচার করেছে, স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এতে ধূসর অতীতের কিংবদন্তিতুল্য যাদুকরদের ধারায় তার প্রতিষ্ঠা জনমানসে প্রোথিত হয়ে গেছে। কিন্তু আসলে

ফাউস্ট হলো ভবঘুরে মাতাল ; সে ক্র্যাকো শহরে যাদু শিখে জার্মানির সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়ে চালাকি, প্রতারণা ও মিথ্যা কথার জাল বুনে গেছে। এসময়কার ধ্রুপদী বিদ্যার গবেষক জোয়াকিম ক্যামেরিয়াস (১৫০০-১৫৭৪) ফাউস্টের ভোজবাজি কুশলতার কথা বলেছেন। আর, ১৫৩৯ সালে বেগার্ডি নামে এক চিকিৎসক ফাউস্টকে 'ধূর্ত, দুষ্ট, অকর্মণ্য, অশিক্ষিত, হাতুড়ে বৈদ্য' বলে বর্ণনা করেছেন। এরকম নিন্দাসূচক বয়ানের অভাব নেই। তাহলে, শেষ পর্যন্ত ফাউস্ট-কথা মান্যতা হারাল না কেন? উচ্চবর্গীয়দের নৈঃশব্দ্যের চক্রান্ত' যুগে-যুগে দেশে দেশে কত পাঠকৃতির ধারাকে আমূল রূপান্তরিত করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। শাদা হয়েছে কালো, কালো হয়েছে শাদা; সোচ্চার হয়েছে নিরুচ্চার, নিরুচ্চার হয়েছে সোচ্চার। সুতরাং ফাউস্টের কাহিনিও অভিজাত উচ্চবর্গীয় চেতনায় নিরাকৃত হয়েছে। অথচ তার জনপ্রিয়তা বিরক্তির কারণ হওয়া সত্ত্বেও উপেক্ষা করা যাচ্ছিল না। এভাবে হয়তো তা জার্মানির লোককথা-ভাণ্ডারে আত্তীকৃত হয়ে যেত। নস্ত্রাদামুস, পারাসেলসুস, আগ্রিপ্পার মতো বিখ্যাত যাদুকর ও ভবিষ্যৎ-বক্তাদের প্রতিতুলনায় ফাউস্ট হয়তো ততটা উজ্জ্বল হতে পারতেন না, কিন্তু তবু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁর নাম আধুনিক কালে পৌঁছে যেত ঠিক। প্রাগুক্ত তিনজনও শয়তানের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিয়েছিলেন, এমন জনশ্রুতি রয়েছে। সুতরাং কোথায় সেই অনন্যতা কিংবা ইতিহাসের বাধ্যবাধকতা — যার ফলে প্রবল বিরোধিতাও ফাউস্ট-কথাকে ক্রমশ পরিশীলিত আখ্যানবীজে রূপান্তবিত হতে বাধা দিতে পারল না?

এর অন্যতম বড়ো কারণ সম্ভবত এই যে, নিম্নবর্গীয় মানুষদের কাছে ফাউস্ট-কথা শুধুমাত্র কিংবদন্তি বা যাদুবিশ্বাসের ব্যাপার ছিল না। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের নানা দৃশ্য ও অদৃশ্য আয়তন ছুঁয়ে যেত ফাউস্ট-কথার চর্চা, গভীরে আলোড়িত করত। এছাড়া উচ্চবর্গীয়দের সবাই প্রতিরোধে শামিল হয়েছিলেন, তা কিন্তু নয়। প্রোটেস্টান্ট চেতনার উন্মেষ হলো যখন, ঐতিহ্যবাহিত ধর্মতত্ত্বের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়ে ঐ মতাবলম্বীরা ফাউস্টের জ্ঞানতৃষ্ণা ও অনন্ত শক্তির আকাঙ্ক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিব্যক্তি দেখতে পেলেন। এছাড়া সমাজের নিচুতলার মানুষদের নতুন মতের প্রতি আকৃষ্ট করার সহজ উপায় তাঁরা ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন। আজকের পরিভাষায় যাকে আমরা বলি সাংস্কৃতিক রাজনীতি, ষোল শতকের জার্মানিতে তারই অভিঘাতে ফাউস্ট-কথায় যুক্ত হলো তাৎপর্যের নতুন মাত্রা। এই প্রেক্ষিতেই সুইজারল্যান্ডের জোহান গাস্ট নামে জনৈক প্রোটেস্টান্ট যাজক প্রথম ফাউস্টের মধ্যে যথার্থ অলৌকিক ক্ষমতার বিভা লক্ষ করলেন। ১৫৪৮ সালে ধর্মমত প্রচারের এক সভায় তিনি ফাউস্টের সঙ্গে আহার করার সময় তাঁর আশ্চর্য অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন।

এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য পরিবেশিত হয়েছিল, যা তখন পাওয়ার কথাই নয়। ফাউস্টের অলৌকিক শক্তি না-থাকলে তা সম্ভব হত না। ফাউস্টের ঘোড়া ও কুকুর প্রয়োজনমতো ভৃত্যের রূপ ধারণ করত কেননা এরা আসলে ছিল দৈত্য। না-লিখলেও চলে, লোকায়ত বিশ্বাসকে ব্যবহার করে প্রোটেস্টান্ট ধর্মমত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। শয়তানের সঙ্গে ফাউস্টের সম্পর্ককে তাঁরা ব্যাখ্যা করেছিলেন প্রাতিষ্ঠানিক প্রতাপের উপযুক্ত বিকল্প চর্যা হিসেবে। লুথার এবং বিশেষত তাঁর অনুগামী মেলাঙ্কথোন পুনঃকথনের মধ্য দিয়ে ফাউস্ট-কথাবৃত্তকে নতুন ধরনের মান্যতা দিলেন। শেষোক্ত জন বলেছিলেন, ফাউস্ট একবার তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী যাদুকরকে পুরোপুরি খেয়ে ফেলেছিলেন। অবশ্য ভেনিসে উড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টায় তিনি ব্যর্থ হন।

বোঝাই যাচ্ছে এ ধরনের প্রচারে সাক্ষ্য-প্রমাণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা উৎসুক শ্রোতারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বিশ্বাসের ভাণ্ডারে আরো রোমাঞ্চকর ও নতুন তথ্যের যোগান চায়। এজগতে বিশ্বাসই শেষ কথা, তর্ক বা সংশয় অবান্তর। সুতরাং ফাউস্টের মৃত্যু-বর্ণনায় দেখা গেল, স্বয়ং শয়তান তাকে পরলোকে নিয়ে যেতে এসেছিল। তখন সমস্ত ঘরদোর থরথর করে সশব্দে কেঁপে উঠেছিল। কেউ বা বললেন, ফাউস্টের শরীর বহুখণ্ড হয়ে গিয়েছিল ; কারো মতে, শবদেহ পাঁচবার উপুড় হয়ে গিয়েছিল যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রাণপণে চিৎ করে রাখতে চাইছিলেন। এই সব অনুপুঙ্খই প্রমাণ দেয়, ফাউস্ট ইতিহাস ও বাস্তবের অনেক বাইরে ইতিমধ্যে চলে গেছেন ; তিনি হয়ে উঠেছেন জনগণের যৌথ সম্পত্তি যাকে যে-যেমন-খুশি ব্যবহার বা রঞ্জিত করতে পারে। কিন্তু এতসব পুঞ্জীভূত উপকরণের ভার সত্ত্বেও ফাউস্ট যে আসলে ঠিক কোন্ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন — সে-বিষয়ে তাঁর নিজের শতকই নিশ্চিত ছিল না। এই যে মৌল কূটাভাস—তা কথাবৃত্তের পরিণত পর্যায়েও অটুট থেকেছে। গ্যয়ঠের নাট্য- পাঠকৃতি তাই এত রহস্যময়, এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দ্যোতনা সম্পন্ন। কয়েক শতকের ব্যবধানে ফাউস্ট এখন প্রত্নকথার নির্ঝর নিশ্চয় ; কিন্তু এই প্রবণতাও সূচনাপর্বে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাই ১৫৭০ থেকে ১৫৭৮ সালের মধ্যে পাঁচটি ফাউস্ট-কথার-পাণ্ডুলিপি সংকলন বেরিয়েছিল। তবে এই কথামালার সর্বত্রব্যাপ্ত খ্যাতির সূচনা হয় অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ফাউস্ট বুক' প্রকাশের পরে। ১৫৮৭ তে জোহান স্পাইস ফ্রাঙ্কফুর্টে বইটি প্রকাশ করেন। গবেষকেরা জানিয়েছেন, এই বইয়ের কিছু কিছু বৃত্তান্ত হেগেলের 'এরফুর্ট ক্রনিকল' থেকে সরাসরি তুলে নেওয়া হয়েছে। আর, ভার্জিল-মেলিন-পোপ দ্বিতীয় সিলেভেস্টার আলবের্তুস ম্যাগনাস, সিমোন ম্যাগাস প্রমুখ কিংবদন্তি তুল্য ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রচলিত অতিলৌকিক কাহিনি এই বইতে ফাউস্টের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে কৃষ্ণকথা যেমন নানা জনগোষ্ঠীর সম্মিলিত

অবদানে কার্যত দুই সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে বিকশিত হয়েছে এবং বিভিন্ন উৎসজাত অজস্র পরস্পরবিরোধী উপাদানের সংশ্লেষণ ঘটেছে তাতে তেমনি ফাউস্ট-কথাও নির্দ্বিধায় সব কিছু আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এদের মধ্যে মাত্রা ও আয়তনগত পার্থক্য রয়েছে — তবু প্রবণতার দিক দিয়ে সাদৃশ্য রয়েছে।

ফাউস্ট-বুকের সাহিত্যিক মূল্য হয়তো খুব বেশি নেই। কিন্তু পরবর্তী যুগের বহু সার্থক রচনার তা প্রেরণাস্থল। ফাউস্টের ভোজবাজি ও চাতুর্য সম্পর্কে যে পরিহাস বিজল্পিত প্রকাশভঙ্গি লেখক গ্রহণ করেছিলেন, তখনকার পরিবেশে সেই ভঙ্গিই ছিল তাঁর সমালোচনা। এর বেশি কিছু করা তখন সম্ভব ছিল না। কেননা তাহলে ঠিক উল্টো মেরুতে অর্থাৎ উচ্চবর্গীয় সুলভ প্রত্যাখ্যানসূচক মনোভঙ্গিতে চলে যেতে হত। অবশ্য একথাও লেখা প্রয়োজন যে অজ্ঞাতনামা লেখক স্পষ্টতই তাঁর বিবৃত কাহিনির সত্যতায় আন্তরিক ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। কারণ, তিনিও তো মূলত ঐতিহ্যের পরম্পরাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছেন ফাউস্ট-কথাবৃত্তের প্রণালীবদ্ধ পুনর্নির্মাণ করে। তাঁর কৃতিত্ব এখানেই যে অত্যন্ত সীমিত সুযোগ সত্ত্বেও নরক বর্ণনার স্বাচ্ছন্দ্যে এবং যাদুকরের উদ্বেগদীর্ণ মনের চমৎকার উপস্থাপনায় তিনি নিজেকে প্রত্ননাট্যকার বলে চেনাতে পেরেছেন। ট্রয়ের হেলেনকে নরক থেকে ডেকে আনার মধ্য দিয়ে ফাউস্টের আত্মিক সর্বনাশ চূড়ান্ত হওয়ার প্রকল্পটি ইংরেজ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লোর কল্পনা-প্রতিভাকে উদ্দীপিত করেছিল। 'ডক্টর ফস্টাস' নাটকের প্রাসঙ্গিক পঙক্তিগুলি রচনালাবণ্যের বিচারে সমগ্র ইংরেজি সাহিত্যের মধ্যে অবিস্মরণীয় অভিব্যক্তি ও চিরস্থায়ী সম্পদের অন্যতম .

'Was this the face that launched a thousand ships.
And burnt the topless towers of Ilium ?
Sweet Helen. make me immortal with a kiss !'

এছাড়া আধুনিক জার্মান উপন্যাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থপতি টমাস মানও 'ডক্টর ফস্টাস' (১৯৪৭) এর পাঠকৃতিতে মূল 'ফাউস্ট বুক' এর বেশ কিছু অংশ ব্যবহার করেছেন।

ফাউস্ট-কথাবৃত্তে মেফিস্টোফিলিসের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আঠারো শতকে তার নাম ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছে। মেফিস্টোফিলিসের ভীতি-উদ্রেককারী ব্যক্তিত্ব গহনশায়ী খ্রিস্টিয় ধর্মবিশ্বাসের সমর্থনে সাহিত্যে-শিল্পে নিজস্ব পরিসর গড়ে নিয়েছে। 'ফাউস্ট-বুক' এর অসামান্য জনপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে প্রথমত বিভিন্ন ভাষায় তার অনুবাদ প্রকাশে এবং দ্বিতীয়ত একাদিক্রমে আরো কয়েকটি 'ফাউস্ট বুক' রচনায়। আদি গ্রন্থটি হাই জার্মান থেকে লো জার্মান, ড্যানিশ, ওলন্দাজ, ইংরেজি , ফরাসি , পোলিশ ও চেক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। এছাড়া আরো কয়েকটি গদ্য-সংস্করণ ও একটি পদ্য-সংস্করণও ক্রমশ জার্মানির বিভিন্ন শহরে প্রকাশিত হয়। ১৫৯৯-এ বেরোল রুডল্‌ফ্ হিডম্যান রচিত আরেকটি 'ফাউস্ট

বুক'। মূল গ্রন্থনার খানিকটা শিথিলীকৃত রূপ দেখি এখানে। লেখক ধর্মীয় প্রচারমূলক বেশ কিছু অংশ যোগ করেছেন ; এতেক্যাথলিক-বিরোধী ইহুদি-বিদ্বেষী অবস্থান তীব্রভাবে প্রকট। জোহান পিফিট্‌জের ১৬৭৪-এ বইটির সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৭১২ সালে এই পুঁথির সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং জনপ্রিয়তায় তা এজাতীয় সমস্ত পুঁথিকে ছাড়িয়ে যায়। কোনো-এক অজ্ঞাতনামা লেখক 'খ্রিস্টবিশ্বাসী' অভিধার আড়ালে থেকে 'The League with the Devil Established by the World-Famous Archnecromancer and Wizard Dr Johann Faust' নামক বইটি লেখেন। অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা অচিরেই আদি ফাউস্ট-পুঁথিকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দেয়। তবু, ইতিমধ্যে লক্ষ করেছি, সেই পুঁথির ইংরেজি অনুবাদ (১৫৯২) পড়ার পরেই মারলো তাঁর অসামান্য নাটকটি লেখেন। তিনি অবশ্য অতলান্ত ট্র্যাজেডির মধ্যেও খানিকটা কমেডিব সুর যোগ করে দিয়েছিলেন। যাঁরা মারলোর মতো প্রতিভাশালী নন এবং 'intricate symmetry of art' কে বয়ানে বজায় রাখার মতো সংবেদনশীলতা যাঁদেব ছিল না — পরবর্তী কালে তাঁদের হাতে ফাউস্ট-কাহিনির প্রহসনাত্মক সংস্করণ রচিত হয়। এদেব মধ্যে উল্লেখ্য উইলিয়াম মাউন্টফোর্টের 'Life and Death of Dr Faustus with the Humours of Harlequin and Scaramouche' এবং জন থাবমোণ্ডেব মূকাভিনয় সংস্করণ 'Harlequin Dr. Faustus' যা ১৭২৪-এ দর্শক সাধাবণেব কাছে পরিবেশিত হয়েছিল।

মারলোর নাটক সতেবো শতকেব সূচনাপর্বে ভ্রাম্যমান ইংবেজ নাট্যগোষ্ঠীদের দ্বারা জার্মানিতে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু খুব কম মানুষই যেহেতু ইংবেজি ভাষায় রচিত সংলাপের কাব্যিক সূক্ষ্মতা বুঝতে পারত, অনুষ্ঠানের চটজলদি সাফল্যের জন্যে নাটকেব প্রযোজক, পরিচালক এবং অভিনেতারা বিষমানুপাতিক ভাবে কমেডির উপাদানে বেশি জোর দিচ্ছিলেন। এর ফল দাঁড়াল এই যে এতে প্রভাবিত হয়ে প্রচুর জার্মান পাঠ তৈরি হয়ে গেল যেখানে ফাউস্ট-কথার ঐতিহ্য খোদ জার্মানিতেই গভীর ভাবে অনুসৃত হলো না। বরং সরলীকৃত সাফল্যের পথ ধরে চলতে গিয়ে লিখিয়েরা উৎস-পাঠ থেকে বিচ্যুত হলেন। বলা ভালো বয়ানে বিকৃতি ঘটালেন। প্রহসন ও অলৌকিকতার অভিনব মিলনে উদ্ভূত হলো বকচ্ছপ মূর্তি যা কিনা জনমনোরঞ্জনের ফাঁদে পড়ে জনচিত্তে ফাউস্ট পরিগ্রহণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করল। ইউরোপের মঞ্চগুলিতে দুশো বছব ধরে ফাউস্ট বিষয়ক নাট্যবিনোদন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। মারলোর নাটকের নবগৃহীত অবয়ব ও চরিত্র কেন এত নিরবচ্ছিন্ন জনসমর্থন পেয়ে গেছে, এর তাৎপর্য অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সেই কৃত্য এখানে নয়। এইটুকু শুধু বলা যেতে পারে, সময়-সংবিদের ভ্রান্ত পাঠ চিরকালই

কুহক ও শিল্পকে সমার্থক করে তোলে। অন্যভাবে একে বলা যেতে পারে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে কুহকি সময়ের অন্তর্ঘাত। আবার এই নতুন প্রকরণে হয়তো বা অন্বিষ্ট সেই মাধ্যমিক মার্গ যেখানে উচ্চবর্গীয়েরা গজদন্তমিনার থেকে নেমে এসে নিম্নবর্গীয় শিল্পচেতনার সঙ্গে বেশ খানিকটা সমঝোতা করে নিতে পেরেছেন। আর, নিম্নবর্গীয়েরা নিজেদের কথন-প্রকরণ বজায় রেখেই শ্লেষ-প্রহসন-পরিহাসের সূত্রে উচ্চবর্গীয় চেতনা-পরিসরে অনেকখানি ঠাঁই করে নিয়েছেন। প্রশ্ন নিশ্চয় পুরোপুরি প্রকরণের নয়, অন্তর্বস্তুরও; কিন্তু সতেরো শতকের শেষে ও আঠারো শতকের গোড়ায় প্রকরণের আয়নায় ভাববিশ্বকে যাচাই করা ও পুনর্জীবন দেওয়ার প্রক্রিয়াকে দেখাই বড়ো হয়ে উঠেছিল। তাই ১৭২৮-এ ইংরেজি পুতুল-নাচের অনুষ্ঠানে ফাউস্ট-কথা বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। গোটা ইউরোপ জুড়ে এ-ধরনের অনুষ্ঠান বহুদিন খুব জনপ্রিয় ছিল। যদিও এতে প্রাকরণিক বাধ্যবাধকতার জন্যে ক্যাসপার নামক বিদূষকের ভাঁড়ামি মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য পেত, তবু ফাউস্টের ট্র্যাজেডির কারুণ্য ও নরকের দহন দেখানোয় কোনো ত্রুটি থাকত না।

চার

নাটকে এবং সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমে ফাউস্ট- কথামালার ক্রমবিকাশ যেহেতু বহুরৈখিক ও বহুমাত্রিক, এদের তাৎপর্য-অন্বেষণের জন্যে বিদ্বজ্জনদের প্রয়াস অনেকান্তিক নয় কেবল—কার্যত তা অনন্তে পৌঁছে গেছে। ব্যালে এবং অপেরায় এর পুনঃপ্রয়োগও অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এছাড়া অল্পমেধা ব্যক্তিদের মধ্যে ঐন্দ্রজালিক গ্রন্থরচনার তাড়না ফাউস্ট নামক কামধেনুতুল্য নামকে আশ্রয় করে এমন উৎকটভাবে ব্যক্ত হয়েছিল যে সতেরো ও আঠারো শতক জুড়ে প্রবাহিত হলো উদ্ভট ও অর্থহীন ঘোলা জলের স্রোত। কূট প্রতারণা ও অন্ধ কুসংস্কারের সংযোগ ঘটল ঐসব ছদ্মপ্রতিবেদনে। ইন্দ্রজাল -ভাবনা থেকে সূক্ষ্মতা ও মনন তখন পুরোপুরি নির্বাসিত। এই ধারাটিও লক্ষ করতে হয় আঠারো শতকের প্রেক্ষিতকে তার সমগ্রতায় বুঝতে চাই বলে। ১৭৪৯ সালের ২৮ আগস্ট জন্ম হলো যাঁর, সেই জোহান হুলগ্যাঙ্গ ভন গ্যয়ঠে এই প্রেক্ষিত ও ঐতিহ্যকে আপন সত্তায় শুষে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকে ছিলেন লেসিং এর মতো লেখকও যিনি ফাউস্ট-কথার বহিরঙ্গে গুরুত্ব দেন নি; বরং অন্তর্বৃত তাৎপর্য সন্ধান করে ঐ কথাবীজে পুরোপুরি নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। লেসিং এবং গ্যয়ঠে ছিলেন যথার্থ অর্থে আলোকপ্রাপ্ত সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিত্ব। তাই ঐতিহ্যবাহিত উপকরণ সম্পর্কে অবহিত হয়েও ইন্দ্রজালের মায়ার প্রতি মোটেই আকৃষ্ট হন নি। তাঁরা ফাউস্টকথায় খুঁজেছিলেন মানবসত্তার অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা-সংশয়-সমাধানের প্রতিবেদন। এইজন্যে ফাউস্টের ক্রমিক বিপর্যয়-পরাজয়-নরকপ্রাপ্তিতে থেমে যান নি তাঁরা, ঈশ্বরের হস্তক্ষেপে নায়কের মুক্তিও দেখিয়েছেন। লেসিং

যুক্তিবাদী মন নিয়ে ভেবেছিলেন, মানবজাতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে জ্ঞানের সন্ধানই মানুষকে সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়েছে। তিনি ফাউস্টকে নিয়ে একটি নাটক লিখেছিলেন যার অংশবিশেষ মাত্র আমাদের হাতে পৌঁছেছে। এর ভিত্তিতে বলা যায়, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে যাদুকরের অন্বয় পুনঃস্থাপনই কেন্দ্রীয় বার্তা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর কাছে। চোখ-ধাঁধানো মন-ভোলানো ভানুমতীর ভেল্কি দেখানো তো সাহিত্যিকের প্রাথমিক কৃত্য হতে পারে না। বরং পুঞ্জীভূত সত্যভ্রমের ভিড় থেকে সত্যকে আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে কালজীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তরণ ঘটে তাঁর, কালোত্তর বয়ান নির্মাণ করে তিনি নশ্বরতা থেকে বিষয়বস্তুকেও মুক্তি দেন।

এই উপলব্ধি বেশ কিছু উত্তরসূরি লেখকদের আলোড়িত করেছিল, যাঁদের মধ্যে গ্যয়ঠে প্রধান। ফাউস্ট-কথার বারবার পুনর্লিখন ও পুনর্বিন্যাস করে তিনি 'ফাউস্ট' এর মৃত্যুহীন পাঠকৃতিতে পৌঁছেছেন। বইটির প্রথম খণ্ড ১৮০৮-এ এবং দ্বিতীয় খণ্ড, লেখকের মৃত্যুর পরে, ১৮৩২-এ বেরিয়েছিল। প্রথম খণ্ডের পূর্বলেখে মুক্তির প্রতিশ্রুতি আভাসিত হয়েছে; আর, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অঙ্কে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই অমর সাহিত্য কীর্তি নিছক ভিন্নভাবে প্রস্তাবিত বহুসমাপ্তি বিশিষ্ট প্রাচীন কিংবদন্তিব পুনর্লিখন মাত্র নয়। এ আসলে মানবজীবনের নিয়তি সম্পর্কে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্য। ফাউস্ট হচ্ছেন জ্ঞানপিপাসু মানবাত্মার প্রতীক। জ্ঞানসন্ধানেব পথে বিভ্রান্ত মানুষ যত পাপই করুক না কেন, জ্ঞান ও সত্যের জন্যে অনুসন্ধিৎসাই তাকে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের ক্ষমা ও মুক্তির অধিকারী করে তোলে। বস্তুত গ্যয়ঠের ফাউস্টে এই কিংবদন্তির অন্তর্বর্তী শিল্প-সম্ভাবনা চূড়ান্ত শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। অবশ্য অন্য খ্যাতনামা লেখকেরা সবাই যে লেসিং ও গ্যয়ঠের পথ অনুসরণ করেছিলেন, তা কিন্তু নয়। এঁরা মূলত পরম্পরাগত চিন্তাপ্রস্থানের অনুসারী; বিশেষত মারলো যেভাবে নিরয়-প্রাপ্ত ফাউস্টের ট্র্যাজিক পরিণতি চিত্রিত করেছেন— তা তাঁদের শিল্পবোধের প্রেরণা ছিল। তাই সেসব পাঠকৃতিতে নায়কের মুক্তির কোনো সম্ভাবনাই নেই। এইসব লেখকেরা গ্যয়ঠের রচনার উপসংহার মেনে নিতে পারেন নি। ফাউস্টের জগৎ তাঁদের কাছে নিরন্ধ্র অন্ধকারের জগৎ বলে প্রতিভাত হয়েছিল; অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত কোনো আলোর রেখা তাঁদের কল্পনায় ধরা দেয় নি।

১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'মন ফাউস্ট' বইতে পল ভালেরি বিশেষ ভাবে জোর দিয়েছিলেন সেই অপূরণীয় ক্ষতির ওপর যা চূড়ান্ত জ্ঞান অর্জন করতে গেলে অবধারিত, কারণ তা অফুরন্ত শক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত। তেমন শক্তির কাণ্ডজ্ঞানহীন অপপ্রয়োগও অনিবার্য। তার মানে ব্যক্তিগত ও সামূহিক স্তরে অভাবনীয় বিপর্যয়, সমস্ত সামঞ্জস্যবোধের অবসান। ইতিমধ্যে টমাস মানের অসামান্য উপন্যাস 'ডক্টর ফস্টাসে'র কথা উল্লেখ করেছি। এই

জটিল উপন্যাসের প্রতীকীবিশ্বে ইতিহাসের মৌল তাৎপর্য যেমন পরীক্ষিত হয়েছে, তেমনি শিল্পস্রষ্টার স্বভাবে ও জীবনে নিহিত কূটাভাসগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে। মানের উপন্যাসবিশ্বের প্রধান কুশীলব আদ্রিমান লিভারকুহন্ চিরাগত ফাউস্টকথার সময়োচিত পুনর্নির্মাণের সূত্রধার। ফাউস্ট ও মেফিস্টোফিলিসের অত্যন্ত জটিল সম্পর্ক মানের প্রতিবেদনে খানিকটা কার্নিভালের সুরে বেজে উঠেছে। যুগের প্রয়োজনে শয়তানেরও রূপবদল হয়েছে। আভাঁগার্দ সঙ্গীতের পুঁজিপতি ইম্প্রেশারিও সাউল ফিটেলবের্গ পার্থিব ও ব্যঙ্গাত্মক ভূমিকায় শয়তানকে বিনির্মাণ করে নিয়েছেন যেন। ধর্মতত্ত্ব থেকে সঙ্গীতের জগতে চলে এসে আদ্রিয়ানও চিন্তাশৈত্য ও অবসাদের শিকার। সাধারণভাবে শিল্পকলা ও বৌদ্ধিক পরিসরের এবং বিশেষভাবে সঙ্গীত জগতের সাম্প্রতিক বাস্তব পরিস্থিতি তার অজানা নয়। বর্তমান সময় প্রতিটি অনুষঙ্গের শিল্প ও সঙ্গীত সৃষ্টির প্রতিকূল; তাহলে সময় নামক পিঞ্জর থেকে মুক্ত না-হয়ে এবং সক্রিয় ও দৃঢ়ভাবে তাকে প্রত্যাখ্যান না-করে কীভাবে যথার্থ উঁচুদরের সঙ্গীত সৃষ্টি করা সম্ভব? পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষে মানানসই স্পেকুলেটর হিসেবে শয়তানের প্যারডিকৃত অবস্থানে সাউল ফিটলবের্গের ভরসা হলো 'the scandalous today which tomorrow will be the fashion the dernier cri the best seller in short art'। সে আদ্রিয়ানের জন্যে কিছু করার প্রস্তাব দেয় : 'And still figures-vous, I have come to tempt you away to betray you to a temporary unfaithfulness, to bear you on my mantle . Through the air and show you the kingdom. of the earth and the glory of them today them. at your feet' অর্থাৎ সময়ের সঙ্গে বাস্তবের চেহারা বদলে যাবে, বাস্তবের সঙ্গে বাচন ; কিন্তু নির্যাস একই থাকে।

আদ্রিমান অবশ্য সাউলের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ, সে আত্মগত ধরনে বিশ্বাস করে ; তার শিল্পের বাস্তব সামাজিক ভিত্তি আছে কি নেই, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে সে রাজি নয়। কিন্তু প্যারডির সঙ্গে শ্লেষ ও বিষাদ মিশে যায় যখন দেখি ঐ ঘৃণা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও তার শিল্পও শেষ পর্যন্ত সামাজিক ভিত্তি ও সাংস্কৃতিক আবহেরই ফসল। আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে অনিবার্য নিয়মকে সে এড়িয়ে যেতে পারে না। অথচ আদ্রিয়ান এই অবভাসের মধ্যে থেকে তর্ক করে যায় যে সমসাময়িক সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ঘটনাবলি থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো কিছুই সে মেনে নিচ্ছে না বা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য তার বিপরীত। জীবনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন কূটাভাস সম্পর্কে অবহিত বলেই আদ্রিয়ান সব কিছুর মধ্যে প্যারডির ছায়া দেখতে পায়। প্রশ্ন করে নিজেকেই : 'Why does almost everything seem to me like its own parody, why must I think that almost all, no, all the methods and contentions of art today

are good for parody only'? অত্যন্ত মৌলিক এই জিজ্ঞাসা আধুনিক শিল্পকলা ও সাহিত্য সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আধুনিকীকৃত ফাউস্টেরও কোনো প্রতিরক্ষাব্যূহ নেই ; তাকেও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় সময়ের নিষ্ঠুর সাঁড়াশি-আক্রমণে। গিয়র্গ লুকাচ আদ্রিয়ানের প্রতিবেদনে আধুনিক শিল্পকলার ট্র্যাজেডি লক্ষ করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন : 'Why this defencelessness? Whence this impotence of insight. conviction and sentiment ?' (Essays on Thomas Mann : 1964 : 91).

নিজেই অবশ্য উত্তর দিয়েছেন লুকাচ, নির্দিষ্ট সময়পরিধির ভাবাদর্শগত অবস্থানই সাহিত্যে ও শিল্পে নানা রূপকে ও চিহ্নায়কে ব্যক্ত হয়। নতুন ফাউস্টের ট্র্যাজেডি আসলে কালস্রোতে ভেসে-যাওয়া সেই জাতির সামূহিক বিপত্তির সন্দর্ভ যারা 'deliberate rebarbarization' এর শিকার। এখন কোন্ উৎকেন্দ্রিক শিল্পকলার পক্ষে কথা বলা যাবে ? আদ্রিয়ান তো এক দর্পণ যার চিন্তায় সেরেনুসের মতো আমরাও কঠোর ঐতিহাসিক সত্য প্রতিফলিত হতে দেখি : 'how near aestheticism and barbarism are to each other. aestheticism is the herald of barbarism'! রাজনৈতিক সময়ের হলাহল যখন কোনো জাতির ইন্দ্রিয়চেতনাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেয়, চিত্তবিদারক হাহাকারের মতো বেজে ওঠে সেরেনুসের আর্ত বিলাপ : '....liars and lickspittles mixed us a poison draught and took away our senses. We drank–for we Germans perennially yearn for intoxication–and under its spell through years of deluded highliving. we committed a superfluity of shameless deeds. which must now be paid for.'। এই উচ্চারণে আধুনিকীকৃত ফাউস্ট-কথার অসামান্য রাজনৈতিক সম্ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। নবীন ফাউস্ট হিসেবে আদ্রিয়ান এমন-এক সময়ের সূত্রধার যখন পৃথিবীতে নেমে এসেছে অদ্ভুত আঁধার। চিন্তায় অনুভূতিতে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন জার্মানির সর্বোত্তম বুদ্ধিজীবীদেরও প্রতিরক্ষাহীন করে দিয়েছিল। তাঁদের মানবিক ও নৈতিক ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গিয়েছিল। আত্মিক বন্ধ্যাত্বের সেই পর্যায়ে সাউল ফিটেলবেটের মতো নব্য-মেফিস্টোফিলিসের কাছে আত্মবিক্রয়ই তো অবধারিত। টমাস মানের পুনর্নির্মিত ফাউস্ট বৃত্তান্ত সম্পর্কে লুকাচের এই মন্তব্যটি দিগ্‌দর্শক : 'The intellectual dramatis personae of his writing are the disintegrating bourgeois humanism and the reactionary. mystifying demagogic powers which utilise this disintegration on behalf of monopoly capitalism.' (প্রাগুক্ত : ৯৬) প্রশ্ন এই, মানবসত্তার যাবতীয় আদিকল্প কি দুর্নিবার ট্র্যাজেডির অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ? এই কি তবে একালের ফাউস্ট-চর্চারও সিদ্ধান্ত, যে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কেবল বিভ্রম মাত্র ! না, অন্তত মান এরকম ভাবেননি। নইলে চূড়ান্ত ট্র্যাজিক অন্তর্দৃষ্টি-

প্রসূত সংবিদ নিয়ে আদ্রিয়ান, ভবিষ্যৎ কালকে সম্বোধন করেই যেন, একথা বলত না : '......instead of shrewdly concerning themselves with what is needful on earth that it may be better there. and discreetly doing it, that among men such order shall be established that again for the beautiful work living soil and true harmony be prepared. man playeth the truant and breaketh autan hellish drunkenness, so giveth his soul thereto and cometh among the carrion.'

তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনামুহূর্তে, নিরবচ্ছিন্ন ভোগ ও বিনোদনের কুহকে উন্মাদ, তথাকথিত আধুনিকোত্তর মানুষজনেরাও কি ঐ 'hellish drunkenness'-এ স্বেচ্ছাবন্দি নয় ? তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় বিস্ফোরণে জ্ঞান হোক বা না হোক, তথ্যের প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় ভার পুঞ্জীভূত হচ্ছে। এইসব তথ্যের অংশীদার করা বা না-করা পুরোপুরি নির্ভর করছে উপগ্রহ-প্রযুক্তির একচ্ছত্র অধিপতি বিশ্বপুঁজিবাদের ওপর। অর্থাৎ তথ্য এখন প্রতাপের কৃৎকৌশল। গ্রহীতা-ভোক্তার ইচ্ছা অবান্তর ; কাকে কতটুকু দেওয়া হবে তা ঠিক করে দিচ্ছে নব্য-মেফিস্টোফিলিসেরা। জ্ঞান নয়, তথ্যের অধিকার পাওয়ার জন্যে লালায়িত তৃতীয় বিশ্বের নব্য ফাউস্টেরা ; কারণ, এর মধ্যে ওরা দেখতে পায় মর্যাদার, সমৃদ্ধির, প্রতাপের পঙ্‌ক্তিভোজনে বৃত হওয়ার ছাড়পত্র। এভাবে ফাউস্ট-কথার আকরণ কালে-কালান্তরে বিনির্মিত হচ্ছে, আধার রূপান্তরিত হচ্ছে ; কিন্তু প্রতিবেদনের নির্যাস ও আধেয় কালোত্তর চিহ্নায়িত হিসেবে পুনর্গৃহীত হচ্ছে। একটি আপাত-মোহানায় দাঁড়িয়ে যখন উৎসের দিকে ফিরে তাকাই, পাঠ থেকে পাঠান্তরে ফাউস্ট-কথার নিরবচ্ছিন্ন যাত্রাকে মনে হয় মানব-ইতিহাসের চিরসঙ্গী। মানুষের মৃত্যু হলেও মানব বেঁচে থাকে ; যন্ত্রণার তীব্র দহন সইতে সইতে কিংবা পরাজয়ের মাত্রা-বদল দেখতে-দেখতে অভিযাত্রী মানবসত্তার উপলব্ধি গাঢ়তর হয়। কিন্তু তার নির্মোককে নির্মোক বলে চেনার প্রক্রিয়া থাকে না, সময়ের প্রয়োজনে পথের বদল হয় মাত্র। এখানে মনে করতে পারি স্যান্ডি শুলম্যানের প্রাজ্ঞ সিদ্ধান্ত : 'From the shadowy reality of a despised charlatan. whose posthumous career took him through great as well as tawdry works of art. emerges not only the character of the legendary black magician, but also the apotheosis of mankind's dilemma. There are two choices of thought open to those who wish to delve into the tangled skein of Faustian legend: either that of the traditionalist who believes that man is inescapably doomed to destroy himself through his thirst for knowledge and power, or that of the salvationist, who must believe that no matter what transgressions mankind commits in his attempt to attain wisdom. God has vowed to redeem him.' (প্রাগুক্ত : ২৭)

পাঁচ

অর্থাৎ সেই আদি ও অকৃত্রিম পুনরুচ্চারণ : ধ্রুপদী পাঠকৃতির মুখোমুখি হব কীভাবে ? কোন্ তাৎপর্য বা নির্যাস পাওয়ার আশায়! ফাউস্ট-কথার উত্তরোত্তর শিল্প-পরিণতির দিকে যাত্রা মূলত মৌলিক ও উদ্দীপক চিহ্নায়ন প্রকরণ নির্মাণের প্রক্রিয়া যা 'allows for a greater interplay and mutual convergence of concept, life-views and attitude' (একো : ১৯৮৪ : ৫৩)। প্রসঙ্গত আরো-যা বলা হয়েছে, গ্যয়ঠের ফাউস্ট পাঠের ক্ষেত্রেও তার প্রাসঙ্গিকতা যথেষ্ট রয়েছে : 'When a work offers a multitude of intentions, a plurality of meaning and above all a wide variety of different ways of being understood and appreciated, then under these conditions we can only conclude that it is of vital interest.' (তদেব)। এই অন্তর্বৃত অনেকার্থ-দ্যোতনার জন্যে অনিবার্যভাবে ফাউস্টের বহু দার্শনিক ভাষ্য উপস্থাপিত হয়েছে। গ্যয়ঠের জীবৎকালে দার্শনিক জিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল। কবি স্বয়ং অবশ্য দার্শনিক তাৎপর্য অন্বেষণকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চান নি। কিন্তু পাঠকৃতির গভীরে নিহিত ছিল বিভিন্ন জিজ্ঞাসার বীজ যেহেতু বহু শতাব্দীর লোকমানস নিজেদের উপলব্ধি দিয়ে আখ্যানবৃত্তকে নানা দিকে নানা মাত্রায় প্রসারিত করে গেছে। সুতরাং গ্যয়ঠে নিজে যা-ই বলে থাকুন না কেন, বিষয়কে প্রয়োজনীয় আধার হিসেবে ধরে নিয়ে পাঠকেরা নিজেদের সময় ও পরিসরের দাবি অনুযায়ী অন্তর্বস্তুর নিয়ত পুনর্বিন্যাস করে গেছেন। ফলে ফাউস্ট-কথার বলয়ে জন্ম নিয়েছে অজস্র সম্ভাব্য জগৎ — 'Cultural universe of meanings' (একো : ১০২)।

তবু গ্যয়ঠের বক্তব্য জানার জন্যে আমরা তাঁর চিঠি ও কথোপকথনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারি। তাঁর শেষ জীবনের প্রগাঢ় সাহচর্যের ভিত্তিতে জোহান পিটার একেরমান (১৭৯২-১৮৫৪) 'Conversations with Goethe' প্রকাশ করেন। ১৮২৭ সালের ৬ মে কথাপ্রসঙ্গে খানিকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে গ্যয়ঠে বলেছিলেন, 'জার্মানরা নিশ্চিতই অদ্ভুত। তারা সব সময় সব কিছুতে গভীর চিন্তা আর দার্শনিক ধারণা খোঁজে এবং সেসব আরোপ করে। এতে তো তারা জীবনকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দুর্বহ বোঝা করে তোলে। তোমাদের ধ্যানধারণাগুলি একবার সাহস করে ছেড়ে দাও, নিজেদের একটু অন্তত আনন্দ পেতে, আলোড়িত ও উদ্দীপিত হতে দাও। বা, মহৎ কিছুর জন্যে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত হও। কিন্তু দোহাই তোমাদের, বিমূর্ত চিন্তা বা ধারণা খুঁজে না পেলে এটা কল্পনা করে নিয়ো না যে সমস্তই শূন্যগর্ভ, ব্যর্থ।' তারপর তিনি বলেন যে সমগ্র রচনার ভিত্তি হিসেবে একটি মাত্র পূর্বনির্দিষ্ট ধারণাকে খুঁজে লাভ নেই কিংবা এমনও নয় যে প্রতিটি দৃশ্যে কোনো

চিন্তাবীজের উপস্থিতি রয়েছে। ফাউস্টের বিপুল বৈচিত্র্যসম্পন্ন ও বহুস্তরান্বিত জীবনকথায় কোনো একবাচনিকতার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। গ্যয়ঠে জানিয়েছিলেন : 'It was, in short, not in my line as a poet, to strive to embody anything abstract. I received in my mind impressions, and those of a sensuous, animated, charming, varied hundred-fold kind–just as a lively imagination presented them, and I had, as a poet, nothing more to do than to round off and elaborate artistically such views and impressions, and by means of a lively representation so to bring them forward that others might receive the same impression in hearing or reading any representation of them...... I am rather of the opinion, that the more incommensurable and the more incomprehensible to the understanding, a poetic production is, so much the better it is.'

এই বক্তব্যে নিঃসন্দেহে গ্যয়ঠের নিজস্ব নন্দনচিন্তা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বহুস্বরিক ধ্রুপদী বয়ানের গ্রন্থনায় দুর্বোধ্যতা ও অমেয়তার প্রসঙ্গ যেভাবে উত্থাপিত হলো, তার নিবিড় বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নইলে বিতর্কসূচক প্রতিপ্রশ্ন উঠে আসবে নিশ্চয়। লেখকের বক্তব্য সর্বদা পাঠ-প্রতীতির সহায়ক হয় না, অনেক সময় আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করলে সমস্যাও দেখা দেয়। যেমন ১৮২০ সালের ৫ জুলাই কথাপ্রসঙ্গে জার্মান সমালোচকদের সম্পর্কে পরিহাস বিজল্পিতভাবে গ্যয়ঠে বলেছিলেন : 'Imagination has its own laws, to which the understanding cannot and should not penetrate. If imagination did not originate, things that must ever be problems to the understanding there would be but little for the imagination to do . It is this which separates poetry from prose –in which understanding always is, and always should be, at home.'। তাহলে মোটামুটি দু'মাসের ব্যবধানে, গ্যয়ঠে কি রচনার প্রতীতি ('understanding') সম্পর্কে কার্যত দুটি ভিন্ন সুরে কথা বললেন? আসলে, কবিসত্তা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় ব্যাপৃত থাকার সময় প্রতীতি নিয়ে ভাবিত হয় না, হয়ে ওঠার আনন্দ-বেদনায় মগ্ন থাকে। প্রতীতির ভাবনা আসে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া থেকে তাঁর বিযুক্তির পরে। তখন ঐ পাঠকৃতির স্রষ্টা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কার্যত পাঠকসত্তার অধিকারী। অন্য সংবেদনশীল পাঠকদের মতো তিনিও প্রতীতি বিষয়ে ভাবছেন, এই মাত্র। বস্তুত অনুরূপ ভাবনায়, অন্য আরেক যুগে অন্য আরেক দেশে, বাল্মীকিও উচ্চারণ করেছিলেন : 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া' : এ আমি কী বললাম ! কিন্তু বাচনের তাৎপর্য যে খোঁজে, সে কবিসত্তা নয়, পাঠকসত্তা। তাই ভিন্ন-ভিন্ন মুহূর্তে ভিন্ন-ভিন্ন চিন্তার বিচ্ছুরণ হওয়া স্বাভাবিক। গ্যয়ঠে বিভিন্ন চিঠিতে এবং কথোপকথনে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে যা বলে গেছেন, তার নিবিড়

পাঠ নিশ্চয় জরুরি কৃত্য। শুধু মনে রাখতে হবে, পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকদের কাছে তাঁর পাঠকৃতি যেমন অনুশীলনের বিষয়, তেমনি বিভিন্ন সময়ের বয়ানও। কোনো-একটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখব না আজ, বিষমানুপাতিক গুরুত্বও দেব না প্রসঙ্গ-নির্ধারিত কোনো উচ্চারণকেও।

এই প্রতীতির সূত্রেই আরো একটি জিজ্ঞাসা জাগে। ফাউস্ট-কথা ও কিংবদন্তিমালার বহুস্তরান্বিত বিবর্তন সম্পর্কে কিছুমাত্র অবহিত না-হয়ে কি গ্যয়ঠের 'ফাউস্ট' পড়া সম্ভব নয়? ইতিহাস-নিষ্পন্ন আরো অনেক সাহিত্যিক সন্দর্ভের কথা আমরা জানি, যাদের গভীরে প্রবেশ করার জন্যে দক্ষ ইতিহাসবিদ না হলেও চলে। কিন্তু সমগ্র জাতির চেতনা ও অবচেতনা, আলো ও অন্ধকার, সংস্কৃতি ও সমাজ যে মহাসন্দর্ভের কোষে-কোষে সঞ্চারিত হয়ে যায় বহুকাল ধরে, তাকে ঠিকমতো পড়তে হলে ঐ প্রক্রিয়া সম্পর্কে উদাসীন থাকা সম্ভব কি? বলা ভালো, প্রশ্নটা ঔচিত্যেরও। অতএব সাইরাস হ্যামলিনের মন্তব্য — 'The burden of scholarship ....can mislead the unwary reader' সাধারণভাবে মেনে নিয়েও বলব, যে-কেউ চাইলেই হঠাৎ একদিন 'ফাউস্ট' পড়তে পারে না। সেইজন্যে দীর্ঘ অনুশীলন ও অধ্যবসায় আবশ্যিক। অতএব তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে মোটেই একমত হওয়া যাচ্ছে না : 'We must never forget that Faust is the masterpiece of a poet writing during the Romantic era and that we need not actually know anymore about the legend than Goethe did in order to understand his drama.' (তদেব)। যখন বহুস্বরিক ঐতিহ্যের আয়তন আবহমণ্ডলের মতো স্বাভাবিক, তাতে সম্পৃক্ত হওয়া বা না-হওয়া কোনো মহামনীষীর পক্ষেও তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। তিনি অনুপম কল্পনা-প্রতিভার কিরণ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐ আয়তনকে আলোকিত করেন। যে-মুহূর্তে তিনি সবচেয়ে বেশি সম্পৃক্ত, সেই মুহূর্তেই তিনি সর্বাধিক স্বাধীন পরিসরের সূত্রধার। এই দ্বিবাচনিকতাই প্রভাবের প্রতীতিকে সৃষ্টির উদ্ভাসনে রূপান্তরিত করে। গ্যয়ঠের ফাউস্টের ক্ষেত্রেও এরকম ঘটেছে। কোথায় ও কীভাবে তিনি নতুন জগতের নির্মাতা, নতুন বিশ্ববীক্ষার স্থপতি — তা উপলব্ধির জন্যে ঐতিহ্যের আয়তনকে বুঝে নিতে হয় বৃহৎ বা উচ্চবর্গীয় এবং লঘু বা লোকায়ত বা নিম্নবর্গীয় পরম্পরার নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে, অনন্বয়-অন্বয়ে এবং পরম্পরায় হস্তক্ষেপের বিচিত্র ও জটিল প্রক্রিয়ায়।

এমন কি, ফাউস্টের গ্যয়ঠে-কৃত রূপ তৈরি হওয়ার পরেও ইতিহাস বারবার পাঠকৃতির উপলব্ধি ও পরিগ্রহণ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে। এমন একটি অভিমতও প্রচলিত যে ফাউস্টের ভাগ্য অনেকটা পরিমাণে জার্মান জাতির ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের ক্রমাগত উত্থানের পর্বে ফাউস্টের ভাষ্য যা ছিল,

বিশ শতকে সেই জাতীয়তাবাদ ফ্যাসিবাদে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পাঠকৃতির তাৎপর্য গ্রহীতার কাছে বদলে গেল। এছাড়া নানাধরনের সাংস্কৃতিক ও নান্দনিক চিন্তাপ্রস্থান যত পাঠতত্ত্বের খোলনল্‌চে পাল্‌টে দিয়েছে, গ্রহীতা পাঠকেরা ততই নতুন-নতুন তাৎপর্যের উপকূলরেখা তৈরি করে নিয়েছেন। পর-পর দুটি বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি যখন বিধ্বস্ত, মেফিস্টোফিলিসের কাছে ফাউস্টের আত্মবিক্রয় এবং পরিণামে সার্বিক বিনাশ ব্যাখ্যাত হলো রাজনৈতিক চেতনার পরিভাষায়। নিছক অসামান্য সাহিত্যকীর্তি হিসেবে পরিগ্রহণের ধারাটি স্তিমিত হয়ে গেল। জার্মান রাষ্ট্রের ধ্বংস ও জার্মান জাতির আত্মিক বিনাশের সমান্তরাল উপস্থাপনা হিসেবে ফাউস্ট হয়ে উঠল অদ্বিতীয় চিহ্নায়ক। এমন কি, 'জার্মান সংস্কৃতি ও চিন্তাধারার ফাউস্টীয় বৈশিষ্ট্য' জাতীয় শব্দবন্ধও উঁচুদরের গবেষণাকর্মে দেখা গেল। ইতিমধ্যে টমাস মানের 'ডক্টর ফস্টাস' নামক উপন্যাস-প্রসঙ্গে দেখেছি, কতটা গভীরে ও ব্যাপকতায় ফাউস্ট-কথার বিনির্মাণ হতে পারে! বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী জার্মান ইতিহাসেও এই পাঠকৃতির বিনির্মাণপন্থী ভাষ্য অব্যাহত রয়েছে। ব্যক্তি-প্রতীক যখন জাতীয় প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের নতুন নতুন অনুষঙ্গে পাঠকৃতি পুনঃগৃহীত হতে থাকে। বিশ্বসাহিত্যে ফাউস্টের মতো এমন বয়ান অল্পই আছে, যাকে জাতীয় ইতিহাসের আলো-অন্ধকার ও উত্থান-পতন শুধু পুনর্নির্মাণই করে না — এই রূপান্তর প্রকরণ উপলব্ধির সূচক হিসেবেও যাকে গ্রহণ করা যায়।

ছয়

কিন্তু আমরা যারা তৃতীয় বিশ্বের অপর পরিসর থেকে, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের বাঙালি-পরিসরে ক্রমাগত ঘটমান আত্মহননের প্রেক্ষিত থেকে, 'ফাউস্ট' পড়ছি — আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতির পাঠ কি তাতে নিজস্ব চিহ্নায়ক খুঁজে নিচ্ছে না? শুধু কেন্দ্রীয় রূপকের কথা বলছি না, বিভিন্ন অনুপুঙ্খের ভাষ্য করতে গিয়েও আমাদের অবস্থানগত দূরত্ব দিচ্ছে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র চিন্তার সুযোগ। এছাড়া এমন-এক মুক্ত সংযোগের অবতল আমাদের অনুভূতিতে ধরা দিচ্ছে, যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সম্ভবত আরো প্রত্যক্ষ ও জোরালো ভাবে নিজেদের অভিজ্ঞতাকে ফাউস্ট-কথার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারব। বারবার সামূহিক বাঙালি-সত্তা মেফিস্টোফিলিসের নানা অভিব্যক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাজনের পেছনে যে দ্বিজাতিতত্ত্বের কুহকি মায়া ছিল, তা গত দুই দশকের মৌলবাদী তৎপরতায় বিকট থেকে বিকটতর ভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রতাপের পঙ্‌ক্তি-ভোজনে ঠাঁই পাওয়ার তাড়নায় বাঙালি সত্তা মেনে নিয়েছে বানিয়ে-তোলা হিন্দুত্বের সন্ত্রাস কিংবা ঐস্লামিক মৌলবাদের বিষবাষ্প। ধাপে-ধাপে নেমে গেছে

বাঙালিত্বের বোধ, বিশ্বপুঁজিবাদের সাম্প্রতিক মগজ-ধোলাইয়ের পর্বে সামনে এখন কেবল গোলকধাঁধার অন্তহীন সিঁড়ি। ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম অঙ্কে দেখি, গভীর রাত্রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নায়ক বলছে :

'The shine and glance of stars is veiled,
The flames are dwarfed, the fire has paled ;
A creeping wind the embers lifts
And brings me smoke and reek in drifts.
Command too rash too soon obeyed !
What means this shape of hovering shade ?'

রূপকের এই পর্যায়ক্রমিক গ্রন্থনা এবং সেই গ্রন্থনার অন্তর্বর্তী বেদনা ও নিয়তিবোধ আশ্চর্যভাবে আমাদের সামূহিক সত্তার তিমিরায়নে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। পর্বে-পর্বান্তরে বাঙালিরাও নানা মোহে স্বাভাবিক চলার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে ; ছদ্মবেশী মেফিস্টোফিলিসদের অতি স্থূল ও অতি চতুর অনুরাগকে কোনো বিবেচনা ছাড়াই অতি দ্রুত মান্যতা দিয়েছে। জাতির আকাশ থেকে হারিয়ে গেছে তারার আলো, আগুন ক্রমশ নিভে গিয়ে ধোঁয়ার আড়াল তৈরি করেছে। সঞ্চরমান ছায়ায় সমস্ত অবয়বই প্রেতায়িত এখন। এই ছায়ার মানে কী : আমরা তা বলতে পারছি না।

ফাউস্টের তবু চেতনা অবশিষ্ট ছিল। মধ্যরাত্রে রুদ্ধকক্ষে নিজে অতলান্ত সর্বনাশের মুখোমুখি হয়ে সে অন্তত এই উচ্চারণটুকু করতে পেরেছিল :

'A hollow, muted note of spectral night
I'm left to struggle still towards the light :
Could I but break the spell, all magic spuring.
And clear my path, all soveeries unlearning,
Free then, in Nature's sight, from evil ban,
I'd know at last the worth of being man.'

সর্বব্যাপ্ত অন্ধকার রাত্রির বোবা নিস্তব্ধতা যখন গ্রাস করছে বাঙালি সত্তাকে, হাঁসজারু ও বকচ্ছপদের ভিড়ে আত্মাবলুপ্তির মাদকতা বিনা বাধায় প্রসারিত হয়ে চলেছে — তখন কেউ কি কোথাও বলছে : আলোর দিকে যাওয়ার লড়াই থেকে সরে আসিনি এখনো ! মানুষ হয়ে জন্মানোর মূল্য শেষ পর্যন্ত জানব— ফাউস্টের এই উচ্চারণের মতো বলতে কি পারব : বাঙালি হয়ে জন্মানোর অর্থ শেষ পর্যন্ত আমরা ঠিক খুঁজে নেব! কিন্তু তবু কেন এমন হয় যে অদৃশ্য ছিদ্রপথে 'black care' ঢুকে পড়ে, সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অকার্যকরী হয়ে যায় ? ঐ ভৌতিক অস্তিত্ব ফাউস্টকে জানিয়েছিল যে তার শয়তানি প্রভাবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত থাকে না, থাকে শুধু অন্তহীন নারকীয় অন্ধকার। এ যেন 'অসূর্যা

নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা' (ঈশোপনিষদ : ৩) এর প্রভাবে :

'Though in his outward senses whole,
He harbours darkness in his soul ;
No matter what the treasure is,
He lacks the power to make it his.
.....
Faced with bliss or faced with sorrow,
He defers it to the morrow.
Always on the future waiting,
Nothing ever consummating.'

এই বয়ানের প্রতিটি অনুপুঙ্খ যেন নিয়তিতাড়িত বাঙালি -সত্তার হুবহু প্রতিকৃতির একেকটি উপকরণ। আমাদেরও শুধু বাহ্যিক সমগ্রতা, আত্মায় অন্ধকার। ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা যতই থাকুক না কেন, তাদের নিজের করে নেওয়ার মতো ক্ষমতা বা অধ্যবসায় নেই। আনন্দ বা বিষাদ, সব কিছুকে আমরা আগামী কালের বিষয় করে তুলি। অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের জন্যে প্রতীক্ষা করি কিন্তু বাস্তবে সব সোনার হরিণ। এভাবে সব কিছু মুছে যায় আমাদের, ভূগোল এবং ইতিহাস, পড়ে থাকে কেবল কাঁটাতার ঘেরা মানচিত্র। যা আছে, তাকেও ধরে রাখতে শিখি নি। শিখিও না কখনো।

কেয়ারের ভাষায় বলা যায় : 'Ever straying, ever thwarted/ He beholds a world distorted'! বিকৃত ও পঙ্গু জগতের মুখোমুখি হয়ে দেখি, আমরাও কখন যেন ঈপ্সিত ইতিহাসের ধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছি। কারণ, চোখ থাকলেও কার্যত অন্ধ ছিলাম আমরা 'For mortal men through all their life are blind'। কেয়ারের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে অন্ধই হয়ে গিয়েছিল ফাউস্ট। বলেছিল, 'Deep falls the night, in gloom precipitate'। তবে ঐ দৃশ্যে ফাউস্টের শেষ কথাগুলি আমাদের বর্তমান পাঠের জন্যে বিশেষ সংকেতবহ, কারণ সেখানে বুঝি, মানুষ পরাজিত হলেও পর্যুদস্ত হয় না। ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যেও জাগিয়ে রাখে তিমিরবিনাশের আকাঙ্ক্ষা। সামূহিক বাঙালি সত্তার জন্যে এ মুহূর্তে এই উচ্চারণের প্রয়োজনই বেশি ; বিশেষত অন্তিম পঙক্তিতে রয়েছে আবশ্যিক আয়ুধের ইশারা :

'Man all the tools, spade, shovel , as is due,
The work marked out must straight carried through.
Quick dilligence, firm discipline,
With these the noblest heights we win.
To end the greatest work designed,
A thousand hands need but one mind.'

অথচ আমাদের হাজার হাতের সঞ্চালক হাজার মন। অজস্র চিন্তাকেন্দ্র কিংবা কেন্দ্রের অবভাস। বস্তুত এই বহুত্ব মেকি বলেই অবভাসের সূত্র ধরে পর্বে-পর্বে মেফিস্টোফিলিস এবং তার পার্শ্বচরদের আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের সত্তাকে অধিকার করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। অথচ একদেশদর্শী ও অপরিণামদর্শী হয়ে আমরা নিজগৃহপথ তস্করকে দেখিয়ে গেছি বারবার। শুধু আমাদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদ ছিল না কোথাও। ছিল না কোনো জ্ঞানী ফাউস্টও, জীবনের শেষ সংলাপে যে এই উপলব্ধি-মথিত উচ্চারণ করতে পারে :

'None is of freedom or of life deserving
Unless he daily conquers it anew.'

এবং এই দুটি পঙ্ক্তি হতে পারে সেই মোহানার সূচক যে-বিন্দুতে দাঁড়িয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি গ্যয়ঠে-পরিকল্পিত কথনবিশ্বের উৎসে। তাৎপর্যের পুনঃগ্রন্থনাও শুরু হতে পারে এখানে। প্রত্যেক পাঠক প্রত্যেকের পরিসর মতো এই অভিযাত্রার অংশীদার হয়ে উঠতে পারেন। লেখা বাহুল্য যে অনেকান্তিক ও বহুরৈখিক এই প্রক্রিয়া। ফলে ফাউস্ট-পাঠও বহুমাত্রিক না হয়ে পারে না। হতে পারে একাধিক দার্শনিকের পাঠ, একাধিক সমাজতাত্ত্বিকেরও, তেমনি সাংস্কৃতিক রাজনীতির পড়ুয়াও অজস্র পাঠের কথা বলতে পারেন, যাদের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন দেশে-কালে প্রস্তাবিত নান্দনিক পাঠের সম্পর্ক না-ও থাকতে পারে। তবে, এতক্ষণে একথা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে ফাউস্ট চিরকালই থাকবে সম্পূর্ণ আবিষ্কারের বাইরে। অতএব সংশ্লেষণী পাঠ ছাড়া অন্য বিকল্প নেই।

বস্তুত প্রতিটি দৃশ্যে রয়েছে এমন বাচন যা আমাদের বহুস্বরিক ব্যক্তিসত্তা ও সামূহিক জীবন সম্পর্কে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। তাই ফাউস্ট দেশে-দেশে পর্বে-পর্বে সাহিত্য-সমালোচক ও ভাষ্যকারদের আলোচনাকে উস্‌কে দেয়নি শুধু, দার্শনিকদেরও উদ্দীপিত করেছে। ফাউস্ট স্বয়ং এবং মেফিস্টোফিলিস, গ্রেটচেন, হেলেনা, সম্রাট, হ্বাগনের তো বটেই, নিতান্ত ক্ষণিকের উপস্থিতি যাদের — সেইসব নাট্যকুশীলবদের বাচনও অণুবীক্ষণিক ব্যাখ্যার জন্ম দিয়েছে। ফাউস্টের নাটক এদিক দিয়ে নিশ্চয় দার্শনিক প্রতিবেদন। এছাড়া এর প্রাকরণিক দিক নিয়ে (আকরণ, দ্বিরালাপ, একক বাচন, পর্বসন্ধি, ভাষাবিন্যাস প্রভৃতি) যাঁরা আলোচনা করেছেন, সন্দর্ভের দার্শনিক স্তরপরম্পরার কথা মনে রেখেই তাঁদের এগোতে হয়েছে। সাইরাস হ্যামলিন লিখেছেন, সব কিছুর নিয়ামক হলো - 'The problem of Faust which Goethe is exploring in his drama indeed constitutes a profound dilemma of the self as it struggles to live in the world and to achieve understanding of itself in relation to the world.' (প্রাগুক্ত :৩৭২)। আর, হয়তো, এইজন্যে অসামান্য এই সাহিত্যকীর্তিরও উদ্দিষ্ট পাঠকবৃত্ত খুব বড়ো নয়।

দার্শনিক ও নাটকীয় প্রেক্ষিতের অন্তর্বয়ন উপলব্ধির জন্যে যে পূর্বপ্রস্তুতি আবশ্যিক, তা সর্বসাধারণের অধিগত নয়। এভাবে আরো-একটি মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় আমাদের। ফাউস্ট-কথার আদি পর্যায়ে উদ্দিষ্ট নিম্নবর্গীয়জনেরা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বয়ানের শরিক হতে পারত, বিদ্যাবত্তার কোনো প্রয়োজন তখন অনুভূত হত না। কিন্তু গ্যয়ঠের পাঠকৃতি হয়ে উঠল মুখ্যত বিদ্বজ্জন-মুখাপেক্ষী; স্বভাবত সেখানে পাঠক-সাধারণের পৌঁছানো কঠিন, কিংবা অসম্ভব।

কোনো সন্দেহ নেই যে গ্যয়ঠের কল্পনাপ্রতিভা বহুলাংশে পাঠকের কল্পনাকেও উদ্বোধিত করে যাতে কবিতা, সংস্কৃতি, প্রকৃতি, সত্তার রহস্য, সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রার সীমানা এবং অন্যোন্য-সম্পর্ক তা আবিষ্কার করতে পারে। 'ফাউস্ট'কে যে 'Cosmic drama' বলা হয়েছে, তা যথার্থ। প্রতীকিতা বা প্রত্ন-উল্লেখের ধরন যত জটিল হোক না কেন, নাট্য-পাঠকৃতির অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। এত বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী উপাদানের সহাবস্থান সত্ত্বেও মানুষের মৌল মানবস্বরূপ সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিশ্বাস কখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায় না। পাঠকৃতি যেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক সমুদ্র, যার এক উপকূল থেকে অন্য উপকূলে যাওয়ার জন্যে সাহসী নাবিকের মতো পাঠককে ভেলা ভাসিয়ে যেতে হয়। জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত তাৎপর্য-সন্ধানের জন্যে আমাদের সচেতন বা অর্ধচেতন যাত্রাকে যেন আমরা চিনে নিই। গ্যয়ঠে শুধু আমাদের কর্ম ও মননের সীমার প্রতি, চূড়ান্ত ব্যর্থতার মধ্যেও প্রতীতির উদয়মুহূর্তের প্রতি, তর্জনি সংকেত করে যান। এই বৃত্তান্ত যতটা সাহিত্যের, ততটা দর্শনের। অন্বিষ্ট শুধু দেশাতীত কালাতীত মানবপরিস্থিতির সত্য। ঠিকই লিখেছেন হ্যামলিন : 'Like all great myths of the self, Faust constitutes a drama of discovery moving through the totality of its lifetime with limited means and with compromising commitments, accompanied by the devil and ultimately failing to achieve fulfilment or satisfaction, perhaps failing even to secure the validity of its own convictions' (তদেব : ৩৭৯)

মানুষের জীবনে আরম্ভ আছে, সমাপ্তি আছে, সাফল্য আছে ; তবু তা সমগ্র হয় না কখনো : এই প্রতিপাদ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই কি 'ফাউস্ট' পড়ব, এমন কি, আমরাও ?

নীৎশে ও প্রত্ন-আধুনিকোত্তর পরানন্দন

নীৎশে 'The Will to power' বইতে লিখেছেন 'That the value of the world lies in our interpretation ..... that every elevation of man brings with it the overcoming of narrower interpretations ; that every strengthening and increase of power opens up new perspectives and means believing in new horizons — this idea permeates my writings.' (১৯৬৭ : ৩৩০)

জগতের মূল্য নির্ভর করে আমাদের বিশ্লেষণী ভাষ্যের ওপর — বয়ান হিসেবে এ যেন আমাদের সমকালীন উচ্চারণের সঙ্গে মিলে যায়। সংকীর্ণতর ভাষ্যের বৃত্ত যখনই ভাঙে মানুষ, উত্তরণের নতুন সোপানে পৌঁছে যায়। ক্রমাগত নতুন প্রেক্ষিত, উপকরণ ও দিগন্ত উন্মোচিত করেই মানুষ নিজেকে প্রসারিত করতে পারে। হঠাৎ করে যখন পড়ি, যে- কোনো উদ্ধৃতিযোগ্য বাচনের মতোই মনে হয় এই বক্তব্যকে। তাহলে সময়ের অভিজ্ঞান-নিরপেক্ষ ভাবেই কি ভাষ্যের ওপর ভরসা করব আমরা? বিশেষত সাম্প্রতিক নির্মাণবায়ন প্রক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত প্রতিজগতে বাস করে আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর সঙ্গে এর সঙ্গতিসূত্র কীভাবে খুঁজব ! এই খোঁজার প্রশ্ন উঠছে এইজন্যে যে ফুকো, লিওতার ও বদ্রিলারের মতো আধুনিকোত্তর তত্ত্বদ্রষ্টাও সরাসরি বা পরোক্ষভাবে নীৎশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।

সত্তরের দশকে মিশেল ফুকো চিন্তার প্রত্নতত্ত্ব থেকে বস্তুর উদ্ভবক্রম বিষয়ক ভাবনায় বিবর্তিত হচ্ছিলেন এবং বিভিন্ন বস্তুগত প্রতিষ্ঠান ও প্রতাপের প্রকরণ সম্পর্কিত তাত্ত্বিক সন্দর্ভ তৈরি করছিলেন। ফলে, সব মিলিয়ে দেখা দিচ্ছিল প্রতিবেদনের নতুন আদল। ১৯৭১ সালে 'Neitzsche, Genealogy and History' নিবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন নীৎশের ভাববীজ কীভাবে আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর পক্ষেও প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ অনেক পুরোনো তত্ত্বচিন্তারও যুগোপযোগী পুনর্নির্মাণ সম্ভব — তা তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন। তাঁর প্রত্নতত্ত্বাশ্রয়ী বিশ্লেষণ ঐ পর্যায় থেকে পরিচালিত হবে 'in relation to the will to knowledge' (১৯৭৭ : ২০১) এবং তার প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত প্রতাপের বিচ্ছুরণ পরিমাপের জন্যে — এরকম একটা বিবৃতি দিলেন তিনি। নৈতিকতা, সাধুতা, বিচার ও শাস্তির উদ্ভবক্রম সম্পর্কে নীৎশের বয়ান অনুসরণ করে ফুকো অপরিচিত, বিস্মৃত, বর্জিত ও প্রান্তিকায়িত প্রতিবেদন গড়ে-ওঠার ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন। উন্মত্ততা, ভেষজবিদ্যা, শাস্তিপ্রকরণ ও যৌনতার প্রতিবেদনে স্বতন্ত্র ইতিহাস ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি যেভাবে পর্যালোচনা করেছেন তিনি, তাতে কেউ কেউ নীৎশের দূরবর্তী ছায়া দেখতে পেয়েছেন। ফুকো যখন জানান যে তিনি চান 'insurrection of subjugated

knowledges' (১৯৮০ : ৮১) আর তিনি 'tyranny of globalizing discourses' (তদেব : ৮৩) এর বিরোধী — বিস্মিত হই। কিন্তু সম্ভবত এও আধুনিকোত্তর চিন্তা-প্রণালীর কেন্দ্রস্থিত অপরতা কিংবা অপরতার সম্ভাবনার প্রতি তর্জনি সংকেত। নীৎশে বিপ্রতীপ দর্পণ হিসেবে সেই পরিসরের বার্তাবহ যেন।

বদ্রিলার ইদানীং আমাদের যে চিহ্নখচিত অধিবাস্তবের মায়াজগৎ সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন, তাতে প্রতিবেদনের অন্বিষ্ট ও আশ্রয় হতে পারে শুধু পরানন্দন। ফুকো-লিওতার- দেরিদা তাঁদের নিজস্ব ধরনে এই পরানন্দনের আদল তুলে ধরেছেন। এ এক নতুন প্রদেশ যার হদিশ পাওয়ার জন্যে বর্তমান কাল ও পরিসরের সীমা পেরিয়ে যেতে হয়। নইলে এ যুগের তাত্ত্বিকেরা স্পিনোজা, হিউম, কাণ্ট, নীৎশে, বের্গসঁ, প্রুস্ত, মার্ক্স প্রমুখ চিন্তাবিদের বয়ান পুনঃপাঠ করতে চাইতেন না। গ্রহণ বা বর্জনের প্রশ্ন এখানে বড়ো নয় তত। লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে অতিসাম্প্রতিক চিন্তাচেতনায়ও নীৎশের মতো দিক্‌পাল মনীষীর প্রাসঙ্গিকতা পুনর্নির্ণীত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। গিলে দেলেউজ ও ফেলিক্স গুয়াত্তারি লিখেছিলেন : 'We live today in the age of partial objects. bricks that have been shattered to bits, and left overs..... We no longer believe in a primordial totality that once existed, or in a final totality that awaits us at some fulture dates.(১৯৮৩ : ৪২)! এ যুগ আংশিক বস্তুর যুগ, এই মন্তব্য যেন বদ্রিলারের পরিপূরক। পুঞ্জীভূত বস্তুর উপস্থিতি সত্ত্বেও সম্পূর্ণতার আদল কিছুতেই ফুটে ওঠে না। সমস্ত নির্মিতি থেকে খসে পড়ছে পাঁজর ; ভোজসভার বাইরে কাঙাল ও কুকুরেরা যেভাবে উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, ঠিক তেমনি একালের মানুষেরা যেন ভাঙা দালানের নোনা-ধরা ইঁটের পাঁজার ফাঁকে-ফোকরে অনির্দেশ্য প্রাপ্তির আশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দেলেউজ এই মন্তব্যের ছ'বছর আগে জানিয়েছিলেন, তত্ত্ব সমগ্রীকরণের পক্ষপাতী নয় ; তা বিস্তারের আয়ুধ এবং নিজেকেও অনবরত বিস্তারিত বা পরিবর্ধিত করে। প্রতাপের স্বভাবই হলো সমগ্রীকরণ। অতএব তত্ত্ব স্বভাবত প্রতাপের প্রতিস্পর্ধী (১৯৭৭ : ২০৮)। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কথাটির চমৎকারিত্ব ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা আমাদের ভাবিত করে। বিশেষত তত্ত্বের মৌল অনেকান্তিকতা সম্পর্কিত প্রত্যয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য দেলেউজের 'Nietzsche and Philosophy' বইটি (মূল ফরাসি : ১৯৬২, ইংরেজি ভাষান্তর : ১৯৮৩) নবায়মান চিন্তাবিশ্বের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ষাটের দশকের ফ্রান্সে মার্ক্সবাদ যখন সার্ত্র ও আলত্যুসেরের মধ্য দিয়ে জীবন ও জগতের সঙ্গে ভাবাদর্শের নতুন অন্বয়সূত্র খুঁজে নিতে চাইছিল, সে-সময় ফরাসি বুদ্ধিজীবীদের অন্য একটি গোষ্ঠী মার্ক্স-হেগেল-দ্বন্দ্ববাদের বিকল্প সন্ধান করছিলেন। পার্থক্য-প্রতীতি সম্পর্কিত নতুন ধরনের অদ্বন্দ্ববাদী তত্ত্ব ফুকো, দেরিদা ও দেলেউজের মধ্যে ক্রমশ রূপ নিচ্ছিল।

আকরণোত্তরবাদ ও আধুনিকোত্তরবাদের পক্ষে যা মৌল অবলম্বন, তেমনি এক পার্থক্যবাদী যুক্তি-শৃঙ্খলার তত্ত্ব গড়ে তোলার কাজে নীৎশের অলক্ষ্য প্রেরণা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। ইতিমধ্যে জিদ, বাতেইল, ব্লাশোঁ প্রমুখ চিন্তাবিদদের কল্যাণে নীৎশের চিন্তাধারা ফ্রান্সে পুনর্বিবেচিত হতে শুরু করেছিল। দেলেউজের প্রাগুক্ত বইটি সমসাময়িক ফ্রান্সের তত্ত্ববিশ্বে নীৎশেকে দার্শনিক হিসেবে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। লুক্রেতিয়াস, স্পিনোজা, হিউম, বের্গসঁ ও নীৎশের মতো দার্শনিকদের মধ্যে দেলেউজ দর্শনের ইতিহাসের সেইসব প্রধান স্থপতিদের দেখতে পেয়েছিলেন যাঁরা অংশত বা সামগ্রিকভাবে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। দেলেউজের মতে এই সব চিন্তাবিদেরা পরস্পরের সঙ্গে এমন একটা গোপন গ্রন্থিতে যুক্ত – 'Which resides in the critique of negativity, the cultivation of joy, the hatred of interiority, the exteriority of forces and relations, the denunciation of power' (১৯৭৭ : ১১২)।

এই মন্তব্যের শেষ অংশে প্রতাপের প্রত্যাখ্যান সম্পর্কিত যে-চিন্তাসূত্রটি রয়েছে, তা আমাদের আলাদাভাবে লক্ষ করতে হয়। নীৎশের মতো দেলেউজও বিশ্বাস করতেন যে দর্শনের প্রধান ভূমিকা সমালোচনাত্মক অর্থাৎ তার সবচেয়ে ইতিবাচক স্বভাব ব্যক্ত হয় যথাপ্রাপ্ত পরিস্থিতি বা চিন্তার সমালোচনা উপস্থাপনায়। কোনো কিছুর স্বরূপ যদি জ্যোতির্বলয়ে আবৃত হয়ে যায়, তাকে ছিন্নভিন্ন করা দর্শনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেলেউজের ভাষায় এই প্রক্রিয়া হলো 'an enterprise of demystification' (১৯৮০ : ১৫৩)। নীৎশের প্রতিবেদনে এই প্রক্রিয়ার অভিব্যক্তি লক্ষ করেই দেলেউজের মতো আধুনিকোত্তরবাদী তাত্ত্বিকেরা তাঁর রচনার পুনঃপাঠে মনোযোগী হয়েছিলেন। দ্বন্দ্বমূলক চিন্তাধারাকে আক্রমণ করে নীৎশে পার্থক্য, হয়ে ওঠা ও মূল্যায়নের এমন-এক বিকল্প তত্ত্ব নির্মাণ করতে চাইছিলেন যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে প্রাকৃতিক ও জৈবশক্তির গভীরে। নীৎশের বাচন অনুসরণ করেই দেলেউজ বহুবাচনিকতার গৌরব প্রচার করেছিলেন এবং দ্বন্দ্ববাদকে সমগ্রবাদী ও সংকোচনবাদী চিন্তাপ্রণালী হিসেবে আক্রমণ করেছিলেন।

দুই

দেলেউজ যেভাবে নীৎশের ভাষ্য করেছিলেন, তাতে দেখতে পাচ্ছি, বাস্তবতা হলো এই পৃথিবীর সংগঠক চলিষ্ণুতার অভিব্যক্তি যা অন্তর্বৃত ইচ্ছায় পরিচালিত হয়ে থাকে। সত্তার অনড় প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন ও অধিবিদ্যা প্রত্যাখ্যান করে নীৎশে ভেবেছিলেন, বিভিন্ন শক্তি একে অপরের সঙ্গে বৈরিতামূলক সম্পর্কে সক্রিয় থাকে। একদিকে অনুজ্ঞা এবং অন্যদিকে মান্যতা সমাজে যে বহুস্তরান্বিত সাংগঠনিক আকল্প তৈরি করে, পীড়ন-ভিত্তিক সম্পর্কের শেকড় তারই মধ্যে রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, জৈবিক, রাসায়নিক —

সমস্ত সংস্থাই আধিপত্যবাদী ও অবদমিত শক্তির আন্তঃসম্পর্কের দর্পণে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। মানুষের পৃথিবীতে যাদের উচ্চতর ও নিম্নতর, সক্রিয় ও প্রতিক্রিয়াপ্রবণ বর্গ বলে জানি অর্থাৎ একদিকে যারা অস্তিত্বকে স্বীকৃতি জানায় ও শক্তির মূল্যবোধকে উর্ধ্বায়িত করে এবং অন্যদিকে যারা দুর্বলতার নৈতিক ব্যাখ্যা কিংবা সমর্থন খোঁজার ছলে তাকে অস্বীকার করে — তাদের অন্তর্বর্তী ভিন্নতাই জীবন ও জগতের বহুবাচনিকতার আকর। প্রতাপে পরিণত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই জীবন্ত শক্তিপুঞ্জের মধ্যে ভিন্নতা আনে এবং এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবতারও ব্যাপকতম অন্তঃসার। দেলেউজ লিখেছেন, 'The monism of the will to power is inseparable from a pluralist typology.' (১৯৮৩ : ৮৬) । কথাটা স্পষ্টতই নীৎশের ভাবনায় অনুপ্রাণিত। মূল বক্তব্য হলো, এই আকাঙ্ক্ষা সংশ্লেষণী শক্তিও বটে যা জগতে বিচিত্র সম্পর্কের বিন্যাস তৈরি করে এবং সমস্ত বস্তুতে থাকে অন্তঃসলিলা হয়ে। এই পৃথিবীতে শক্তির বহুবাচনিকতাকে খর্ব করা যায় না কখনো।

নীৎশের বহুবাচনিকতাবাদ পার্থক্যবিষয়ক দ্বন্দ্ববাদী তত্ত্বের তুলনায় স্বরূপেই আলাদা। একে আমরা গ্রহণ করব কি করব না, এই বিচার আপাতত করছি না। দেলেউজ নীৎশের ভাবনাকে আরো বিকশিত করতে গিয়ে পুরোপুরি নতুন চিন্তার কক্ষপথ তৈরি করেছিলেন কিনা — এই প্রশ্নের উত্তরও মুলতুবি থাক। আকাঙ্ক্ষা ও পার্থক্য-প্রতীতির নিষ্কর্ষ সম্পর্কেও নানা জিজ্ঞাসা মনে দেখা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে ষাট ও সত্তরের দশকে দেলেউজ যখন আধুনিকোত্তর জ্ঞানতত্ত্বের প্রকল্প নির্মাণ করেছিলেন, নীৎশের প্রেরণা তাঁর কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এই জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে স্টিভেন বেস্ট ও ডগলাস কেলনের বলেছেন যে তা হলো, 'non-essentialist, non-representational, pluralist, anti-humanist and resolutely anti-dialectical in character' (১৯৯১ : ৮২)। কীভাবে দেলেউজ আত্তীকৃত করেছেন নীৎশেকে, এ বিষয়ে তাঁদের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য, 'The dynamism of Nietzsche's account of power and his valorization of active forces is transcoded in Deleuze's early works and collaborations with Guattari as a theory of constitutive desire that champions desire's productivity and condemns the social forces that seek to weaken and immobilize it.' । আধুনিকোত্তর জ্ঞানতত্ত্বের তন্তু দিয়ে যেহেতু গড়ে উঠেছে আধুনিকোত্তর পরানন্দনের বয়ান — পরাপাঠের উৎসে নীৎশের উপস্থিতির তাৎপর্য আমাদের ভেবে দেখতেই হয়। সত্তর দশকের শেষে দেলেউজ ও গুয়াত্তারির যৌথ প্রচেষ্টায় যখন আকাঙ্ক্ষা ও পার্থক্যের নতুন আধুনিকোত্তর তত্ত্ব দর্শন ও রাজনীতির অন্যোন্য-সম্পর্ককে গরীয়ান করে তুলছিল, আকাঙ্ক্ষার অণু-রাজনীতি ও মনোবিকলনগত চিহ্নতত্ত্বের অভিনব ধারণা ক্রমশ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। তাৎপর্যের উপস্থাপনাবাদী

প্রকল্প ('representational schemes of meanings') প্রত্যাখ্যাত হওয়ার মধ্যেই পরানন্দনের বীজাধান হলো — এমন বলা যায়।

নীৎশের চিন্তাবীজ এখানেও সক্রিয়। উপস্থাপনার আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেইসব বাস্তবতাবাদী তত্ত্বপ্রস্থানকে আক্রমণ করেছিলেন যাদের মতে ভাষা-সংস্কৃতি-শরীর সংস্থানের হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিষয়ী জগৎকে চিন্তায় যথাযথভাবে প্রতিফলিত বা উপস্থাপিত করতে পারে। তাঁর মতে, উপস্থাপনাবাদী প্রকল্প ও সচেতন অস্তিত্বের ওপরে শরীর ও শারীরিক শক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা প্রাধান্য বিস্তার করে। আমরা যখন আধুনিকোত্তর তত্ত্ববিশ্বের দিকে তাকাই, বুঝতে পারি, জগতের ধারণা প্রতিবেদন ও সামাজিকভাবে নির্মিত বিষয়ীসত্তা দ্বারা পরিশীলিত হচ্ছে। সমস্ত ধরনের চিরাগত প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা সত্ত্বেও অবশ্য নব্য রক্ষণশীলতার উদ্ভব সম্পর্কে কিছু বেয়াড়া বিতর্ক উঠে এসেছে। তবু, একথা নিশ্চয় বলা যায়, 'Anti-Oedipus', 'Capitalism and Schizophrenia', 'A Thousand Plateaus' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এমন অনেকান্তিকতার তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়েছে যাকে কখনো সমগ্রীকরণের আওতায় আনা যাবে না। আধুনিকতাবাদ ও মনঃবিশ্লেষণবাদের সম্ভাব্য যুক্তিজাল ছিন্ন করে দেলেউজ ও গুয়াত্তারি শেষ পর্যন্ত নিজস্ব যে-কক্ষপথ তৈরি করতে পারলেন, সেখানে পৌঁছাতে নীৎশে তাঁদের সাহায্য করেছিলেন। পার্থক্য ও বহুবাচনিকতার ধারাবাহিক ঊর্ধ্বায়ন যেন আধুনিকোত্তর পাঠকৃতি, তত্ত্ব ও রাজনীতির নতুন ধরনের প্রয়োগ-কৌশল। তাঁরা লিখেছেন : 'In truth, it is not enough to say 'long live the multiple' difficult as it is to raise the cry. No typographical, basical, or even syntactical cleverness is enough to make it heard. The multiple must be made'. (১৯৮৭ : ৬)। শেষ বাক্যটি আসলে চিন্তার বীজতলি। কীভাবে, কেন, কাদের জন্যে নির্মিত হবে বহুত্ব এবং কী বা তার সত্তাতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক তাৎপর্য — এই বিচারে ও বিতর্কে আমাদের প্রণোদিত করে বাক্যটি।

প্রকৃতপক্ষে আজ যখন আমরা আধুনিকোত্তর চিন্তা-পরিধিতে সংলগ্ন থেকে নীৎশের পুনঃপাঠ করি, পুনর্বিচার এবং নবায়মান বিতর্ক অনিবার্য। ফুকো-দেলেউজ-দেরিদা-বদ্রিলার- লিওতার — যত গ্রহীতার কথা ভাবি না কেন, প্রত্যেকেই নিজস্ব পরিসরের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেও নিজের জন্যে আলাদা-এক নীৎশেকে আবিষ্কার করে নিয়েছেন। পুনঃপাঠের ধরনটি মোটেই সরল ও রৈখিক নয়, বরং জটিল ও চক্রক। যে-সময়ে অসংখ্য অন্তঃস্বর, তাতে এটাই প্রত্যাশিত। জাঁ ফ্রাসোঁয়া লিওতারের একটি মন্তব্য সাধারণভাবে পাঠক্রিয়া এবং বিশেষভাবে নীৎশে-পাঠ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও জরুরি : 'What is important in a text is not what it means, but what it does and incites to do. What it does : the clarge of affect it contains and transmits. What it

incites to do : the metamorphoses of this potential energy into other things — other texts.... . (১৯৮৪ : ৯-১০)। নিশ্চয়। কোন্ পাঠকৃতি থেকে কোন্ অর্থ পেতে পারি — তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিবেদন আমাদের কী করে বা কী করতে প্ররোচিত করে — সেটাই বিবেচ্য। অতএব নীৎশে পড়ে আজকের মানুষ হিসেবে আমরা কী ভাবতে ও করতে প্রণোদিত হই এবং কতটা প্রতিক্রিয়া তৈরি করার সম্ভাবনা তাতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে — তা আমাদের ভেবে দেখতে হয়। নীৎশের রচনায় যদি প্রত্ন-আধুনিকোত্তর প্রবণতা খুঁজে পাই, এ ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য করেন লিওতার। আকাঙ্ক্ষার রাজনীতি ও দর্শনে, খানিকটা নীৎশের ঘরানায় ইতিবাচক সন্দর্ভ তিনি লক্ষ করেছিলেন। 'Discourse figure' (১৯৭১), 'Derive a partir de Marse et freud' (১৯৭৩) 'Economie libidinae' (১৯৭৪) থেকে প্রখ্যাত 'The postmodern Condition' (১৯৮৪)-এ পৌঁছাতে পৌঁছাতে লিওতার বৃত্তাকার পথে বিবর্তন সম্পূর্ণ করলেন যেন। সক্রিয় রাজনীতিতে একদা যিনি অংশ গ্রহণ করেছেন, তিনি সেই পথ থেকে সরে এসে পুরোদস্তুর বৌদ্ধিক জীবনে আত্মনিয়োগ করলেন। মার্ক্স ও ফ্রয়েডের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েও তিনি যে প্রকটভাবে আক্রমণাত্মক নীৎশে-চিন্তাধারায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারলেন— তাতে অত্যন্ত মৌলিক কোনো সংকটের ছবি আভাসিত হলো কিনা, এই জিজ্ঞাসা এড়ানো যায় না। হয়তো এতে ব্যক্তির নয়, অনিকেত সময়ের দ্বারা অধিকৃত বর্গের পরিসরই দ্যোতিত হলো। আমরা শুধু লক্ষ করব, লিওতার যেন সময়-নির্ধারিতভাবেই দেলেউজ ও গুয়াত্তারির চিন্তাবৃত্তে সংলগ্ন হলেন। তাঁদেরই মতো নীৎশে উদ্ভাবিত শক্তি-নিবিড়তা-প্রতিক্রিয়ার দর্শনের শরিক হয়ে ক্রমশ আকাঙ্ক্ষার দর্শন ও রাজনীতি গড়ে তুললেন।

অন্যান্য তাত্ত্বিকের তুলনায় লিওতার শিল্প ও নন্দন সম্পর্কে অনেক বেশি ওয়াকিবহাল। শুধু বিষয় নয়, ভঙ্গিও নান্দনিক উপলব্ধি দ্বারা পরিশীলিত। চিহ্নায়ন প্রকরণ সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ একমাত্র বদ্রিলারের সঙ্গে তুলনীয়। নতুন তাত্ত্বিক প্রেক্ষিত তৈরি করার জন্যে তিনি যে প্রথম থেকেই সচেষ্ট, তা 'Discourse. figure' (১৯৭১) বইতে লক্ষ করি। এতে তিনি সোস্যুর, লাকাঁ, হেগেল, মের্লো পঁতি, ফ্রয়েড প্রমুখ তাত্ত্বিকদের সমালোচনা করে নতুন ধরনের রচনানীতি ও সীমাতিযায়ী নন্দন বিকাশের জন্যে চেষ্টা করেছেন। ডেভিড ক্যারল যাকে 'পরানন্দন' (Paraesthetics : London : 1987) বলেছেন, লিওতার তারই আদল তৈরি করার জন্যে নীৎশের চিন্তাবিশ্বে পরিক্রমা করেছেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি, চিত্রলতা ও অভিজ্ঞতার চেয়ে কোনো বিমূর্তায়ন বা ধারণা বড়ো নয় কিংবা পাঠকৃতি ও প্রতিবেদনের গুরুত্ব বেশি নয় — এই হলো লিওতারের অভিমত। স্টিভেন বেস্টও ডগলাস কেলনের পরানান্দনিক প্রয়াসকে এভাবে বর্ণনা করেছেন — 'Which

turns art against theory by using the figures, forms and images of art to subvert and overthrow theoretical positions.' (১৯৯১ : ১৪৯)। এই বক্তব্য কতদূর সমর্থনযোগ্য, তা আলাদা কথা। কিন্তু লিওতার যে ইন্দ্রিয়ানুভূতির ওপর প্রলম্বিত বাচনের ধূসর প্রচ্ছায়া সরিয়ে দিতে চাইছেন (১৯৭১ : ১১) এবং আকরণোত্তরবাদী বয়ানভাবনার বিপরীত মেরুতে দাঁড়াতে চাইছেন — তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তত্ত্বের ওপর শিল্পকলা ও কল্পনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি, এমনকি, চিহ্নতত্ত্বের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী অবস্থানের আদলও খুঁজে পেয়েছেন। এই বয়ানে যখনই তিনি আকাঙ্ক্ষার দর্শনের কথা উত্থাপন করেছেন, নীৎশের ছায়া ক্রমশ গাঢ়তর হয়ে উঠেছে।

তিন

দেলেউজ ও গুয়াত্তারি যদিও কোনো-কোনো আকাঙ্ক্ষায় ফ্যাসিবাদী প্রবণতা লক্ষ করে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন, লিওতার কিন্তু ইতিবাচক ও নেতিবাচক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখান নি। সমস্ত আকাঙ্ক্ষাই তাঁর কাছে বরণীয় যদি তা নিবিড় অভিজ্ঞতার সন্ধান দেয়, পীড়নের পরিস্থিতি থেকে মুক্তির পথ দেখায় এবং সৃষ্টিচেতনা উন্মুক্ত করে। তিনি মনে করেন, প্রতিবেদনে যতটুকু আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়, তা ভাষার নিজস্ব নিয়মে রুদ্ধ ও আকরণের প্রতি অনুগত। আকাঙ্ক্ষার প্রবাহ ও নিবিড়তাকে নিশ্চল, স্থবির ও অসাড় করে দেয় যেসব তত্ত্ব, তাদের সঙ্গে প্রতিবেদনকে মিলিয়ে নিয়েছেন লিওতার। স্বভাবত এই বক্তব্য সম্পর্কেও অনেক প্রতিপ্রশ্ন উঠে আসতে পারে। এখানে তার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র এই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে ভাষার মৌল অস্তিত্ব ও চিহ্নতাত্ত্বিক যুক্তিশৃঙ্খলা এড়িয়ে গিয়ে সরাসরি নিবিড়তার পরিসরে পৌঁছাতে পারে কি অনুভূতি ? আর, 'অচিহ্নায়ক উপকরণ' বলতে সত্যিই কিছু থাকতে পারে কি আদৌ? এখানে বদ্রিলারের কথা আমাদের মনে পড়ে যিনি সাম্প্রতিক জীবনের প্রতিটি অলিন্দে চিহ্নায়ন ও প্রতিরূপায়নের অভিব্যক্তি দেখেছেন। ভোগবাদী সমাজে মূর্ত ও বিমূর্ত যখন পণ্যায়নের তুমুল আগ্রাসনে তুল্যমূল্য — নিবিড়তা বা মুক্তি বা আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে লিওতারের মতো নব্য-রোমান্টিক অবস্থান তিনি নিতে পারেন নি। আসলে লিওতার মার্ক্স-ফ্রয়েড-মের্লো পঁতি হয়ে নীৎশের উপকূলে পৌঁছেছেন বলে তাঁর পরিক্রমায় প্রচলিত অর্থে রৈখিকতা নেই। তিনি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন : 'If one had to enumerate the shares from which this boat set adrift and distanced itself : a certain Freud ; a certain Marx, a general notion of critique.... an idea of transgression which belongs to the same sphere of critique.' (১৯৭৩ : ৯) । তিনি সেই আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছেন শিল্পে যা ধারাবাহিকতার মধ্যে ছেদ এনে দেয়

এবং ন্যায়বৃত্ত-শৃঙ্খলা-অভ্যস্ত পরম্পরার বর্তমান রাজত্বকে আক্রমণ করে। আর, স্বভাবত সীমাতিযায়ী হয়ে জীবনী শক্তির ইতিবাচক প্রকাশকে অবারিত করে। শিল্প মূলত সেই অবচেতন আকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করে যা 'follows the uses of displacement, condensation and metaphoric transformation' (Best and Kellner : ibid) । এই বক্তব্যের সূত্রে আমরা পৌঁছে যাই আধুনিক ও আধুনিকোত্তর অনুভব-বিন্যাসের পার্থক্য-প্রতীতিতে, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে পরানন্দন বিষয়ক ভাবনা। স্কট ল্যাশ (১৯৮৮ :৩১৩) ভাষ্যের নন্দনের ওপরে ইন্দ্রিয়বোধের নন্দনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আধুনিকোত্তর নন্দনের আদলে যে প্রচ্ছন্ন থাকে পরানন্দন, এর কারণ খুঁজতে হবে আধুনিকোত্তর অনুভবের মধ্যে। ল্যাশের বক্তব্য অনুসরণ করে বেস্ট ও কেলনের লিখেছেন : 'the modern sensibility is primarily discursive, privileging words over images, sense over monsense, meaning over non-meaning, reason over the irrational and the ego over the id. The postmodern sensibility is, by contrast, figural and privileges a visual over a literal sensibility, figure over concept, sensation over meaning and immediacy over more mediated intellectual modes.' (তদেব : ১৫১)।

১৯৬৮ সালের ব্যর্থ ছাত্র অভ্যুত্থান পারী নগরের অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের মতো লিওতারের ভাববিশ্বেও মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে রূপান্তর রৈখিকভাবে ঘটেনি। ১৯৭০ সালে 'On Theory' শীর্ষক সাক্ষাৎকারে লিওতার জানিয়েছিলেন, তত্ত্বের কাজ শুধু বুঝিয়ে দেওয়া নয়, সমালোচনা করাও। অর্থাৎ যথাপ্রাপ্ত বাস্তবতা, সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন বিন্যাস, বস্তুবিশ্ব ও অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক — সব কিছু সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে ধরা এবং তাদের আমূল পুনর্বিন্যাস করাই তত্ত্বের লক্ষ্য। বিশেষত এটা ঘটে যখন প্রাগুক্ত প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গগুলি সহ্যের অতীত হয়ে ওঠে। প্রাধান্য -প্রবণ প্রতিবেদন ও প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি আনুগত্য সম্পর্কেই তিনি তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুলে ধরছিলেন। ক্রমশ অবশ্য তাঁর অন্বিষ্ট বদলে গেছে। আধুনিক ন্যায়বৃত্ত ও একীকরণ প্রত্যাশী দার্শনিক প্রকরণগুলিকে আক্রমণ করে তিনি নিবিড়তা, বহুবাচনিকতা, খণ্ডপরিসর ও ক্রমাগত অবস্থান পরিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন।

নিজের এই প্রবণতা সম্পর্কে পরে তিনি নিজেই বলেছিলেন : 'Only by my not mourning my powerlessness could another way of thinking be sketched out, I thought without justification, just as at sea a swimmer incapable of opposing the current relies on drifting to find another way out.' (১৯৮৮ : ৫৪)। পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে তাঁর ক্রমাগত সরে যাওয়ার প্রবণতাকে

'Nietzschean drift' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'economie libidinale' (১৯৭৪) বইতে আধুনিকতাবাদী প্রতিবেদন থেকে তাঁর সর্বাধিক দূরত্ব সূচিত হলো। এতে মার্ক্সের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডকে, ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে মার্ক্সকে এবং মার্ক্স ও ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে নীৎশেকে কাজে লাগানো হয়েছে। জীবন বিষয়ক দর্শন ও জীবনীশক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে নীৎশের ছায়া লক্ষ্য করা যায়। লিওতার এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে পরিবার, জীবিকাক্ষেত্র, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আকাঙ্ক্ষাকে রুদ্ধ করে পীড়ন-প্রকরণে রূপান্তরিত করা হয়। সুনির্দিষ্ট বর্গ, মূল্যমান, প্রকরণ ও ব্যবহার-বিধিতে আকাঙ্ক্ষাকে সম্পৃক্ত করে নেয় আধুনিকতাবাদী তত্ত্বগুলি। লিওতার এরই বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজনে নীৎশের চিন্তাবিশ্ব থেকে অন্তঃসার আহরণ করেছেন। নীৎশের বাচনের নিবিড় পুনঃপাঠ যে করেছিলেন তিনি, এর প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে সমসাময়িক রচনাগুলিতে।

নান্দনিক বিচারের ক্ষেত্রে এইসব ভাবনা কীভাবে আধুনিকোত্তব পর্যাযের সূচনা করেছে, তার বিশ্লেষণ এখানে না করেও বলা যায়, পরাভাষা ও পরাবাচনের জন্যে উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল নীৎশের পুনঃপাঠের মধ্য দিয়েই। নান্দনিক রাজনীতি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে কতটা মর্যাদা পেতে পারে কিংবা নিবিড়তার সন্ধান কীভাবে যুক্ত হতে পারে উচিত ও অনুচিত বিচারের সঙ্গে, এ সম্পর্কে নানা তর্ক হতেই পারে। আমরা শুধু লক্ষ করব কীভাবে আকাঙ্ক্ষা ও জীবনীশক্তির ধারণার সঙ্গে আভাঁগার্দ শিল্পতত্ত্ব কিংবা সামাজিক চিহ্নতত্ত্বের আধুনিকোত্তর পর্যায়কে মিলিয়ে নিতে চান লিওতার। শেষ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত যাই হোক, এক ধরনের মুক্ত বয়ানের প্রতীতি শিল্পকলা বা রাজনীতি বিষয়ক ধারণায় সম্পৃক্ত হয়ে যায়। লিওতারের বিশিষ্ট মনোভঙ্গির দৃষ্টান্ত হিসেবে এই মন্তব্যটি লক্ষ করতে পারি : 'Here are the men of profusion, the masters of today : marginals, experimental painters, pop, hippies and yippies. parasites, madmen, binned loonies. One hour of their lives offers more intensity and less intention than three hundred thousand words of a professional philosopher more Nietzschean than Nietzsche's readers.' (১৯৭৮ : ৫৩)।

এই শেষ বাক্যটির সূত্রে লিখতে ইচ্ছে করে যে আধুনিকোত্তর পরানন্দনের বিশ্লেষণে আমরা, নীৎশের পাঠকেরা, লক্ষ করছি কীভাবে সমকালীন তত্ত্ববিদেরা নীৎশের চেয়েও বেশি মাত্রায় নীৎশীয় যুক্তিগুলি রচনা করে চলেছেন। সব মিলিয়ে, উনিশ শতকীয় পরম্পরা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীৎশের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করছি প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদের আশ্চর্য উপস্থিতি। আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে যাওয়ার আগে একটি কথা অবশ্য বলে নেওয়া ভালো। ফুকো-দেলেউজ-লিওতার-দেরিদা প্রমুখ তাত্ত্বিকের সমালোচনাত্মক কৃৎকৌশলকে নীৎশে-ঘরানার দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিপন্ন করা এই নিবন্ধের

উদ্দেশ্য নয়। এইসব আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদদের মধ্যে নব্য নন্দন বা শিল্পকলার বিকল্প তত্ত্ব রচনারও প্রকট অভিপ্রায় ছিল না। তবু তাঁদের তত্ত্ববিশ্বে গড়ে উঠেছে নীৎশে প্রভাবিত চিন্তাবৃত্তের পরিসর যেখানে পরাতত্ত্ব ও পরানন্দনের বীজগুলিও প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

চার

পরানন্দন বা Paraesthetics এর সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয়েছে : 'as a preposition, Greek 'Para' had the sense 'by the side of beside', whence 'along side of, by, past, beyond' etc. In composition it had the same senses, with such cognate adverbial ones as 'to one side, aside, amiss, faulty, irregular, disordered, improper, wrong' : also expressing subsidiary relation, alteration, perversion, simulation etc. Paraesthetics indicate something like an aesthetics turned against it rely or pushed beyond itself, a faulty, irregular, disordered, improper aesthetics — one not content to remain within the area defined by the aesthetic. Paraaesthetic describes a critical approach to aesthetics for which art is a question not a given, an aesthetics in which art does not have a determined place or a fixed definition.' (১৯৭৮ : চৌদ্দ)। ডেভিড ক্যারল এই যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা অনুধাবন করলে বুঝতে পারি, প্রাতিষ্ঠানিক নান্দনিকতার আকরণোত্তর বিন্যাসই নয় কেবল, প্রতিস্পর্ধী অবস্থান হিসেবেই একে গ্রহণ করা প্রয়োজন। আসলে নন্দন-চিন্তার অতি শৃঙ্খলিত ও অতিরৈখিক বদ্ধ স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে এবং যুগপৎ অন্তর্বয়ন ও পরাপাঠের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যে পরানান্দনিক পরিসর কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। ফুকো-দেলেউজ-লিওতার-দেরিদা শিল্পকলা ও সাহিত্যে অন্তঃশায়ী জটিলতা, পরস্পর- বিরোধিতা ও অনেকান্তিকতার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। নীৎশের ভাবনা আধুনিকোত্তর চেতনাবিশ্বেও পুনর্নির্মিত হতে পারে — এই উপলব্ধি পুনঃপাঠের মধ্য দিয়ে নীৎশের পুনরাবিষ্কার সম্ভব করে তুলেছে। নতুন নন্দন নির্মিত হলো কিনা কিংবা শিল্পের বিকল্প তত্ত্ব প্রস্তাবিত হলো কিনা — এই বিষয়টি তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। লক্ষণীয় আসলে এই : নীৎশের প্রভাবে আধুনিকোত্তর তাত্ত্বিকেরা শিল্প-ভাবনাকে প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে কীভাবে কতটা নিয়ে যেতে পেরেছেন। একদিকে সীমার শাসন অস্বীকার করা এবং অন্যদিকে প্রকরণ ও অন্তঃসার সম্পর্কিত প্রচলিত সমস্ত অবস্থান থেকে সরে আসা খুব সহজ কথা নয়। নীৎশের চিন্তাপ্রকরণ থেকে এ বিষয়ে কী কী সূত্র পাওয়া গেছে, তা খুঁজে দেখাই আমাদের কাজ।

পরানন্দন মূলত সমালোচনাত্মক দৃষ্টিকোণ থেকে নান্দনিক বয়ানকে স্পষ্টতর করে

তোলে। এর কাছে শিল্পের কোনো নির্ধারিত অবস্থান বা অনড় সংজ্ঞা স্বীকৃত হয় না। আধুনিকোত্তর চিন্তায় শিল্প, এমন কি, নিজেরও তত্ত্বায়ন প্রতিরোধ করে এবং এইজন্যে নানা ধরনের কৌশলে নিজের তাৎপর্য ও প্রয়োজন সম্পর্কিত যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে তাত্ত্বিক উপস্থাপনার বাইরে নিয়ে যেতে চায়। দর্শনে ও ইতিহাসে 'শিল্পের অবসান' ঘোষিত হওয়ার পরে অর্থাৎ শিল্প ও সাহিত্যের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক 'মৃত্যু' হওয়ার পরেও কীভাবে এরা বেঁচে থাকতে পারে — এই সংশয়িত প্রশ্নের পরস্পর-বিরোধী সমাধান পরানন্দনের সূত্রে পাওয়া যায়। দর্শন, ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে শিল্প ও সাহিত্যের যত্নরচিত দূরত্ব কি চূড়ান্ত অথবা দূরত্বের অবভাস তৈরি করে অপ্রত্যাশিত পথে ঐসব পরিসরে পুনঃপ্রবেশের অবকাশ তৈরি হয়? নান্দনিক ও অনান্দনিক পরিসরের মধ্যে চিরাচরিত পার্থক্যকেও ইদানীং জিজ্ঞাসার বিষয় করে তোলা হচ্ছে। বিশেষত আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিতত্ত্বের বিপ্রতীপে সাংস্কৃতিক রাজনীতির তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসাগুলি সমস্ত সীমান্তকে বিতর্কের বিষয় করে তুলেছে। সময়ের অপরিমেয় জটিলতায় প্রতিটি যথাপ্রাপ্ত যখন অস্থির ও অনির্দেশ্য, পারস্পরিক অভিঘাতে এরা ক্রমাগত নি েরাই নিজেদের রূপান্তরিত করে চলেছে। দর্শন-ইতিহাস-রাজনীতি-সমাজতত্ত্বের পরিসরে তত্ত্বের যে অচিন্তনীয় বিস্ফোরণ হয়ে চলেছে, তাতে 'সীমান্ত' শব্দটি নিরর্থক হয়ে পড়েছে। এরই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে, কিংবা ঐসব তত্ত্বের দৃশ্য ও অদৃশ্য বিচ্ছুরণে প্রভাবিত হয়ে, রূপান্তরিত হয়ে চলেছে শিল্প ও সাহিত্যের তত্ত্বগুলিও। কাকে বলব নান্দনিক আর কাকেই বা বলব অনান্দনিক পরিসর ! কারণ একে অপরের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে মৌল বিভেদের স্থানগুলিকে অবান্তর করে দিচ্ছে।

একদিকে নান্দনিক ও অনান্দনিক এবং অন্যদিকে নান্দনিক ও তাত্ত্বিক পরিসরের জটিল আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা যে ধারাবাহিক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই প্রয়াসের প্রত্নরূপ খুঁজে পাই নীৎশের ভাবনায়। নান্দনিকতাবাদকে কেউ কেউ বলছেন, 'mystification of the powers of literature' (তদেব : ১৫)। কিন্তু সেই সঙ্গে ভেবে নিতে হয়, শিল্প ও সাহিত্যের সার্বভৌমত্ব কতদূর স্বীকার্য ! দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে ধারাবাহিক সংগ্রাম করে যদি তাদের ঐ সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে হয়, তাহলে নৈতিকতাবাদ কিংবা বিভিন্ন ধরনের মতান্ধতা থেকে এরা কতদূর মুক্ত থাকতে পারে? যদি ঐ মুক্তি তারা অর্জন করেও, নান্দনিক বা সাহিত্যিক কৃত্য কি আদর্শায়িত হয়ে যায় না? আধুনিকোত্তর পরানন্দন সমস্ত কিছুর নিবিড় পাঠ বা অন্তরঙ্গ সমালোচনা করতে গিয়ে মূল্য-নিরপেক্ষতার নামে চোরাবালির পরিসর তৈরি করে না তো!

অবশ্যই সমস্ত আধুনিকোত্তর তাত্ত্বিক অভিন্ন দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করেননি। বরং একেকজন একেক ধরনের জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন। জিজ্ঞাসার এই বহুত্বের সূত্র কতটা

প্রচ্ছন্ন রয়েছে নীৎশের ভাবনায় — এর মীমাংসো করাটা কঠিন। আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা যখন মহাসন্দর্ভের প্রেতচ্ছায়া দেখতে পেয়ে প্রায় সব কিছুরই অবসান ঘোষণা করছেন, তত্ত্বচিন্তা কিংবা শিল্পসাহিত্যও মহাসন্দর্ভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। অর্থাৎ তত্ত্ব এবং শিল্প- সাহিত্যেরও মৃত্যু ঘোষণা করার জন্যে পরানন্দনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু আমরা লক্ষ করব পরানন্দনের মধ্য দিয়ে ঐ অবসান ঘোষিত হচ্ছে না; বরং তত্ত্ব ও শিল্পসাহিত্যের পারস্পরিক পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ার প্রতি তর্জনি সংকেত করা হচ্ছে।

বস্তুত তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে ঐতিহাসিক বাধ্যবাধ্যকতার মধ্য দিয়েই আমরা এমন-এক চিহ্নায়ন-প্রবণ পরিস্থিতিতে পৌঁছে গেছি যেখানে শিল্প ও সাহিত্য প্রতিনন্দনের কার্যকরী মোকাবিলা করার জোর পেয়ে যাচ্ছে পরানান্দনিক পরিসরে। আর, তা করতে গিয়ে তত্ত্বচিন্তাকে মুহুর্মুহু পুনরুজ্জীবিত করছে এবং সব ধরনের সীমায়িত গণ্ডিকে ভেঙে দিয়ে সমালোচনা-প্রবণ করে তুলছে। এই প্রক্রিয়াকে আজ কিছুতেই অস্বীকার করা যাচ্ছে না। ফলে তথাকথিত অনান্দনিক পরিসর বলে কিছুই কোথাও অবশিষ্ট থাকছে না। তেমনি অতাত্ত্বিক পরিসরও অবভাস মাত্র। 'The will to power' বইতে নীৎশের নিম্নোক্ত বিখ্যাত মন্তব্যটি নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে : 'Our religion, morality and philosophy are decadent forms of man. The counter movement : art'

একটু আগে অনান্দনিক পরিসর সম্পর্কে যে কথাগুলি লিখেছি, এখানে তা আরো একবার মনে করা যেতে পারে। মানুষকে যে-সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তাপ্রণালী রুদ্ধ করে, শিল্পকে তাদেরই বিপ্রতীপে প্রতিস্থাপিত করেছেন নীৎশে। এই মন্তব্যের সূত্রে যদি ভাবি, শিল্প মানুষকে সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করে, তাহলে তত্ত্বকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহ্য করতে পারি যতক্ষণ তা গৌণস্বর ও প্রান্তিক চিন্তাপ্রণালী মাত্র। কিন্তু কথা হচ্ছে, তত্ত্বকে নস্যাৎ করতে গিয়ে তত্ত্ববিরোধী মতান্ধতার শিকার হলেই মুশকিল। তাহলে আরো-এক ধরনের জটিল অবভাস মানবচেতনার মুক্তিকে সুদূর-পরাহত করে দেবে। এই নিবন্ধের অন্যত্র ফুকো-দেলেউজ-লিওতারদের যে-সমস্ত বয়ান অনুসরণ করেছি, সেইসব আসলে তত্ত্বের উপযোগিতা প্রতিপ্রশ্নের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা করে দেখার তাত্ত্বিক প্রকল্প মাত্র। অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান বা উপেক্ষা করা নয়। তত্ত্ব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে নিজের জন্যে যে সীমানা কিংবা সমাপ্তি নির্ধারণ করে, ভেতর থেকেই সেইসব মুছে ফেলা। সেই সঙ্গে তাঁদের লক্ষ্য ছিল সমালোচনার এমন কৌশল তৈরি করা যা পরাতত্ত্বের দিকে তর্জনি সংকেত করবে অথবা পুরাতত্ত্বের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার উপায় নির্দেশ করবে।

এঁরা একাজের মধ্য দিয়ে যে-প্রতিবেদন তৈরি করেছেন, তাতেই নিহিত রয়েছে সূক্ষ্ম শিল্পসংবিদ ও সাহিত্যবোধ অর্থাৎ প্রচলিত অর্থের বাইরে-গিয়ে-পাওয়া নন্দন-চেতনা। এই বিন্দুতে স্মরণ করতে হয় নীৎশেকে যিনি এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিভূমি তৈরি করে দিয়েছিলেন। দর্শন ও ধর্মকে যখন তিনি শিল্পের বিপ্রতীপে প্রতিস্থাপিত করেন এবং জানান যে ঐ সব তত্ত্ববীজ অবমানবায়নের সঙ্গী — তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের প্রাথমিক সূত্রই নির্দেশিত হয়। সত্যের নিপীড়ক ভূমিকা তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আজকের দিনে আমরা শিখেছি, সত্যও উৎপাদিত হতে পারে প্রতাপের চতুর কৃৎকৌশলে। এই অভিজ্ঞতার সূত্রে বুঝতে পারি, নীৎশে আসলে আধিপত্যবাদী বর্গের দ্বারা উৎপাদিত সত্যকেই নিপীড়ক বলে ভেবেছিলেন। এবং, তার বিরুদ্ধে শিল্পের সংগ্রামী ভূমিকাকে মহিমান্বিত করেছেন। তেমনি বিভিন্ন প্রতাপ-কেন্দ্রের দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে যদি শিল্পকে স্থাপিত করি, তাহলে শিল্পও সেই নিপীড়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হবে যা জীবনের পক্ষে আবশ্যিক শক্তি না হয়ে অর্থাৎ সংগ্রামী শক্তি না হয়ে সমস্ত ধরনের সংঘর্ষকে প্রতিহত করে।

পাঁচ

শিল্প সংগ্রামী চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে যদি তা প্রচলিত শিল্পবোধকে প্রতি পদে পদে জিজ্ঞাসার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখে। শিল্পের সীমানা তাকে পেরিয়ে যেতেই হবে এবং নান্দনিকতাবাদের সমস্ত প্রকরণের বাইরে সক্রিয় হতে হবে। স্বভাবত তা তত্ত্বের সীমানাও মেনে চলতে পারে না। বস্তুত নীৎশের দার্শনিক প্রতিবেদনগুলি সামগ্রিকভাবে এই অতিযায়িতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। তাই তাঁকে বলা হয় দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাহিত্যিক গুণে সমৃদ্ধ। তাঁর রচনারীতি ও বয়ানের তির্যক কৌশল এমন যে একদিকে তাঁর পাঠকৃতি তত্ত্ব ও নান্দনিক বোধের যুগলবন্দি, অন্যদিকে এই দুইয়ের নিরন্তর প্রতিস্পর্ধায় সম্পৃক্ত। নীৎশের 'The Birth of Tragedy' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইউজেন ফিঙ্ক এমন কিছু মন্তব্য করেছেন যা তার কেন্দ্রীয় বিশ্ববীক্ষার ওপর আলোক সম্পাত করে : 'The aesthetic theme acquires for him the status of a fundamental ontological principle. Art, the tragic poem, becomes for him the key that will open up the essence of the world. Art is raised into an organ of philosophy and taken as the most serious, authentic entryway for the most original comprehension, the concept at the very best coming after .... Nietzsche uses aesthetic categories to formulate his fundamental vision of being. The phenomenon of art is placed at the center : in it and from it the world can be deciphered.' (১৯৬০ : ১৬-১৭)।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলি পাচ্ছি এই মন্তব্যের শেষে। সত্তা সম্পর্কে নিজের

মৌল বীক্ষণকে বিশ্লেষণী বয়ানের উপযোগী করে তোলার জন্যেই নীৎশে নান্দনিক বর্গদের ব্যবহার করেছেন। শিল্পকলা সম্পর্কিত চিন্তাপ্রণালীকে তিনি এমনভাবে কেন্দ্রে রেখেছেন যাতে উপস্থাপনার বিশিষ্ট ধরনে এবং সেই কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে জগৎ-প্রক্রিয়ার ভাষ্য করা যায়। সত্তাতত্ত্ব নিশ্চয় দার্শনিক বীক্ষণের সবচেয়ে মৌলিক দিক। শিল্প ও সাহিত্যকে ঐ বীক্ষণে পৌঁছানোর সার্থক উপায় হিসেবে ব্যবহার করে নীৎশে হওয়া ও হয়ে ওঠায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পেরেছেন। সুতরাং শিল্প সাহিত্য লক্ষ্যহীন ও নিষ্প্রয়োজন হতে পারে না ; দার্শনিক প্রতিবেদনে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাতেই এরা সার্থক।

হাইদেগার যেভাবে নীৎশের নিবিড় পাঠ করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, সত্তা বিষয়ক জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়াতেই তাঁর প্রতাপ-অভিমুখী আকাঙ্ক্ষার ধারণায় শিল্পকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এই বিশিষ্ট ধারণার স্নায়ুকেন্দ্রকে যদি বিশ্লেষণ করতে হয়, শিল্পকে সর্বোৎকৃষ্ট সূচনাবিন্দু হিসেবে ধরে নিতে হবে। হাইদেগারের মতে নীৎশে-পাঠের সূচনা হতে পারে শুধু শিল্পকলা বিষয়ক জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে : 'The innermost essence of Being is will to power. In the being of the artist we encounter the most perspicuous and most familiar mode of will to power. Since it is a matter of illuminating the Being of beings, mediation on art has, in this regard, decisive priority.' (Nietzsche : 1 : 70) তবে প্রশ্ন হলো, সত্তা-বিষয়ক এই জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে শিল্প-জিজ্ঞাসাকে উপস্থাপিত করার ফলে সত্য ও শিল্পের মধ্যে কী সামঞ্জস্য রচিত হয় অথবা একে অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে! এই প্রশ্নটি একটু জটিল। কারণ নীৎশের প্রতিবেদন থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে শিল্প ও সত্যের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ জিজ্ঞাসার চরিত্রকেই পাল্টে দেয়। দর্শন ও তার নিজস্ব সত্যকে শিল্প শুধু প্রতিস্পর্ধাই জানায় না, দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিত থেকে উপরেও উঠে যায়।

নীৎশে 'The will to power' বইতে বলেছেন : 'Art is worth more than truth !' এই যে 'সত্যের চেয়েও বেশি মূল্য' এর ধারণা — তার নানা রকম ব্যাখ্যা সম্ভব এবং স্বভাবত বিতর্কও অনেক রকম। নীৎশের বক্তব্য অনুযায়ী শিল্প হলো জীবন-অস্বীকৃতির যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা মোকাবিলার উপযোগী সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিশক্তি। তাকে আরো বলা যায় — —'the redemption of the man of knowledge ..... the man of action .... the sufferer' (The will to power. 452.453)! তো, শিল্প যদি এভাবে মুক্তি এনে দেয়, তাহলে দ্বন্দ্ব বা উৎকণ্ঠার অবসান হয়ে যাবে। সর্বত্র-ব্যাপ্ত ধ্বংসবাদের উল্টোদিকে সত্যের নব্য প্রকরণে পৌঁছানোর জন্যেই কি শিল্প প্রচলিত বিষয়-সাপেক্ষ সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব অর্জন করতে চায়? উনিশ শতকীয় সংবিদ অনুযায়ী নীৎশে নিঃসন্দেহে কালাতিযায়ী অবস্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু সত্যের ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও

সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত কিংবা নির্যাস নিয়ে সাম্প্রতিক কালে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে যত ভাষ্য উপস্থাপিত হয়েছে, সেইসব মনে রাখলে কোনো সরলীকৃত ও সর্বজনীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব। তবু এও অনস্বীকার্য যে নীৎশের একান্ত নিজস্ব চিন্তা-প্রকরণেই আমরা প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চেতনার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পেয়ে গেছি। প্রচলিত দার্শনিক মননের মধ্যে তিনি যে ধ্বংসবাদের নিপীড়ক শক্তির উপস্থিতি লক্ষ করেছেন, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। 'The birth of tragedy' বইতে একটি অসামান্য উদ্ভাবনী চিন্তাসূত্র পাচ্ছি। এতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি অস্তিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মৌলিক বিকার ও আধিপত্যবাদী পীড়নের কথা বলছেন। আবার অস্তিত্বের যাবতীয় ভ্রান্তি সংশোধনের কর্তব্যের কথাও লিখেছেন। ('Duty to correct existence')।

নীৎশের প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণটি আমাদের মনে পড়ে যেখানে তিনি মতান্ধ দার্শনিক ও নান্দনিকতাবাদীর বিরুদ্ধে স্বপ্ন-কল্পনা-জ্ঞানকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন : 'We have art lest we perish of the truth', (The will to power : 822 : 435)। আজ যখন চারদিকে নন্দন হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিনন্দনের আগ্রাসনে, শিল্পকে মুছে দিচ্ছে প্রতিশিল্প আর সত্যকে সত্যভ্রম — তখন সাহসী প্রত্যয়ের এই উচ্চারণ কতটা সম্ভব? নীৎশে নিশ্চয় শিল্পকে উৎক্রান্তির পারিভাষিক দ্যোতনায় ব্যবহার করেননি। জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতা যখন অজস্র তত্ত্বের রণকৌশলকেও মুহুর্মুহু পাল্টে দিচ্ছে, সেই মুহূর্তে 'আমাদের আছে শিল্প'— এই উচ্চারণকে বহুস্বরিক বিচ্ছুরণের স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। নীৎশের ঐ উচ্চারণে কোন্ সত্যকে বিনাশক বলা হয়েছে? নিঃসন্দেহে সেই আগ্রাসী প্রতাপের কৌশলে সর্বত্রব্যাপ্ত ছদ্মসত্য অস্তিত্বকেও মুছে ফেলে। অস্তিত্বের বোধই যখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সেই মুহূর্তেই এই পুনর্ঘোষণার প্রাসঙ্গিকতা সবচেয়ে বেশি যে আমাদের শিল্প আছে এবং থাকবে। অন্তত যতদিন পিঞ্জরায়িত সত্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের প্রয়োজন আমরা অনুভব করব। আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদেরা নীৎশেকে যেভাবেই ব্যবহার করুন না কেন, পরানন্দনের সূত্রধার হিসেবে তাঁর উপস্থিতিও একমাত্রিক নয় কখনো। তাঁর বয়ানের অন্তর্বৃত বহুমাত্রিকতা ও অনেকার্থদ্যোতনা সম্পর্কে চমৎকার আলোকপাত করেছেন বিখ্যাত সমালোচক পল দ্য ম্যান। তাঁর 'Allegories of Reading'. এর তিনটি অধ্যায়ে আমরা নীৎশে-পুনঃপাঠের যে পথনির্দেশ পাই, তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ছয়

তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে এতদিনকার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে পর্যালোচনা করে মনে হয়, আধুনিকোত্তরবাদ এখন বিশ্বায়নের তুঙ্গ মুহূর্তে অত্যন্ত চতুরভাবে সমস্ত

ক্ষেত্রে বৈধতার সংকট তৈরি করছে। তত্ত্বের রাজনীতি আগেও ছিল ; কিন্তু ইদানীংকার চিহ্নায়ন- সর্বস্ব প্রতিজগতে সত্যভ্রমের সন্ত্রাসে সব কিছু নির্বাসিত। সত্য-মিথ্যা, হওয়া-না-হওয়া, নন্দন-প্রতিনন্দনের সীমারেখা মুছে দিয়ে ক্ষান্ত হচ্ছে না আধুনিকোত্তরবাদ। সমস্ত কিছুতে মহাসন্দর্ভের অবজ্ঞেয় মোহর লাগিয়ে দিয়ে যাবতীয় জিজ্ঞাসাকে অবান্তর করে দিচ্ছে। পরানন্দনের লক্ষ্য যদি হয় বিভিন্ন পরিসরের মধ্যবর্তী কৃত্রিম সীমান্ত মুছে দেওয়া — তাহলে এই প্রক্রিয়ায় নির্মানবায়ন প্রবণতা থেমে যাওয়া উচিত। নীৎশের চিন্তাকে বীজতলি হিসেবে যদি ব্যবহার করি, আধুনিকোত্তর পুনঃপাঠে ঐ ঔচিত্যও স্বীকৃত হবে — এই প্রত্যাশা থাকে। 'The will to Power' -এ নীৎশে এই বার্তা তুলে ধরেছেন যে সত্যের নির্যাস আমরা জানতে পারি না। কারণ, 'metaphysics, morality, religion, science ..... merit consideration only as various forms of lies.' (853, 451)

এইসব মহাসন্দর্ভ বলেই মিথ্যা নাকি প্রতাপের সচেতন নির্মিতি হিসেবে মিথ্যা? এরকম জিজ্ঞাসা নিয়েই আমরা যেতে চাই পরানন্দনের পরিসরে। আমাদের এই যাত্রায় নীৎশে শরিক না-ই বা হলেন, প্রাথমিক প্রেরণা হিসেবে তাঁর উপস্থিতিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস : সত্যে পৌঁছানোর সমস্ত পথই ছলনার মধ্য দিয়ে যায়। ছলনার সত্য সম্পর্কে সচেতন থাকাও জরুরি— নীৎশের পুনঃপাঠ কিংবা তাঁর আধুনিকোত্তরবাদী পাঠের পুনর্বিশ্লেষণ আমাদের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেয়। নীৎশের বয়ানে রয়েছে আত্মবিনাশক জ্ঞানের সংকেত যা আসলে পুনর্নির্মাণ প্রক্রিয়ার প্রথম ডমরুধ্বনি। পরানন্দন হলো সত্যের মৃত্যু থেকে পরাসত্যে পৌঁছানোর সমাপ্তিহীন পথরেখা, আর, সেই সঙ্গে অস্তিত্বের সমান্তরাল অভিব্যক্তির পুনর্বিবেচনাও। পরানন্দন অন্বিষ্টও নয় কিংবা শেষ কথাও নয়; মূলত তা অধিবাস্তবতায় আক্রান্ত ভাববিশ্বের সময়োপযোগী কৃৎকৌশল। আর, নীৎশে হলেন অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর সম্পর্ক পুনর্নির্ণয়ের আদি সংকেত-পাঠক। একথা মনে রেখে দ্য ম্যানের নীৎশে-পাঠে অংশীদার হতে পারি আমরাও; 'The wisdom of the text is self-destructive art is true but truth kills itself, but this self-destruction is infinitely displaced in a series of successive rhetorical reversals which, by the endless repetition of the same figure, keep it suspended between truth and the death of this truth.' (পৃঃ ১১৫)।

এই কি পরানন্দনেরও ভবিতব্য : সত্য ও সত্যের মৃত্যুর মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো দোদুল্যমান হয়ে থাকা? এই জিজ্ঞাসার মীমাংসা-প্রয়াস কালে-কালান্তরে পুননবীকৃত হয় মাত্র। তবে নীৎশের জগৎ থেকে আধুনিকোত্তর পৃথিবী অনেক দূরে যেহেতু সরে এসেছে, মীমাংসা-সন্ধান পথ থেকে পথান্তরে অনবরত নিয়ে যাবে আমাদের — এও অনিবার্য।

কিয়েের্কেগার্দ ঃ অস্তিত্বের নান্দনিক নির্মাণ

অস্তিত্ববাদের আদি প্রবক্তা সোরেন কিয়েের্কেগার্দ (১৮১৩-১৮৫৫) এক কিংবদন্তির নাম। মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে যথাপ্রাপ্ত চিন্তা-প্রণালীকে তিনি এমনভাবে বিনির্মাণ করে গেছেন যে এর সম্ভাব্য কেন্দ্র ও বিচ্ছুরণের পরিধি নিয়ে ভাষ্যকারদের নানা শাখা- প্রশাখা স্বতশ্চল ভাবে গড়ে উঠেছে। তিনি আস্তিত্বিক ও সামাজিক, সর্বজনীন ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যমানের তাৎপর্য আবিষ্কারে যুক্তিবাদী ভাবনার ভূমিকা অস্বীকার করেছিলেন। নৈতিকতা ও ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ও রাজনৈতিক ভাবনা, জ্ঞানতত্ত্ব ও নন্দন, সত্তার নিষ্কর্ষ ও ধর্মবোধ : এই সবই তাঁর ভাবনা-বিশ্বের প্রধান উপাদান। ফলে কিয়েের্কেগার্দের দর্শন বলতে আসলে কী বোঝায়, এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত। তাঁকে নিয়ে যত বিতর্ক হয়েছে, ততই কিংবদন্তির কুহকবলয় গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। এইজন্যে শুধু ভাষ্যকারেরা দায়ী, তা হয়তো ঠিক নয়। কেননা কিয়েের্কেগার্দ এমন রচনাশৈলী ব্যবহার করেছেন যাতে স্বচ্ছতার বদলে প্রাধান্য পেয়েছে কূটাভাস, অতিরেক ও রূপকগর্ভ বাচন। সেই সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যও মনে রাখতে হয় যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে তাঁর কাছে পৌঁছাতে হয় আমাদের। এমন হতেই পারে যে তাঁর বিশিষ্ট লিখন-শৈলীর বহু সূক্ষ্ম ও জটিল গ্রন্থনা অনুবাদে হারিয়ে গেছে।

বয়ানের মধ্যে শুধু উদ্ভাসিত পরিসরই থাকেনা, থাকে প্রচ্ছন্ন কিছু কিছু অন্ধবিন্দুও : সাম্প্রতিক পাঠতত্ত্ব আমাদের একথা জানিয়েছে। কিয়েের্কেগার্দের ভাবমূর্তি যে গড়ে উঠেছে আধেক ছায়ায় আধেক'আলোয়,আধেক বাস্তবে আধেক কিংবদন্তিতে — এর কারণ, তাঁর লিখনবিশ্বের রহস্যময় অস্বচ্ছতা আর প্রাগুক্ত অন্ধবিন্দুগুলির মধ্যে আমাদের নিরন্তর তাৎপর্য সন্ধান। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে দার্শনিকের ভাবমূর্তি নির্মাণ আসলে একটি প্রকল্প যা গ্রহীতাদের অবস্থানগত বাধ্যবাধকতা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তার ফলে কিংবদন্তিরও চরিত্র বদল হয়। যেমন ইমানুয়েল হির্শ-এর জার্মান অনুবাদে কিয়েের্কেগার্দের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক প্রবণতাগুলি বেশি গুরুত্ব পেয়েছিল। তিনি হিটলারের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অস্তিত্ববাদী ধর্মতত্ত্বের জটিল গ্রন্থনা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। আবার মার্ক্সবাদের অনুসারী হার্বার্ট মার্কুজ কিয়েের্কেগার্দের মধ্যে দৃঢ়প্রোথিত সামাজিক সংবিদের নির্মাণ-প্রকল্প খুঁজেছেন। অন্যদিকে ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের বিখ্যাত তাত্ত্বিক থিয়োডোর অ্যাডোর্নো কিয়েের্কেগার্দের মধ্যে লক্ষ করেছিলেন বিশেষের ওপর নির্বিশেষের আরোপিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর প্রবণতা। কিয়েের্কেগার্দের নন্দন-প্রকল্প নিয়ে তাঁর প্রতিবেদনটির কথাও মনে পড়বে আমাদের। পাশাপাশি লক্ষ করি

খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকদের কিয়ের্কেগার্দ-ভাষ্য। আবার ম্যাক্স হেবরের চিন্তা-প্রস্থানের অনুসারীরা কিয়ের্কেগার্দের সংশয়বাদী ও নিরীশ্বরবাদী চিন্তা-প্রণালীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক হাইদেগার কতখানি ঋণী কিয়ের্কেগার্দের কাছে, এ বিষয়ে আলোচনার অভাব নেই। সেইসঙ্গে বিশশতকের অগ্রণী মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক গিয়র্গ লুকাচও কতখানি প্রভাবিত কিয়ের্কেগার্দের চিন্তা-প্রণালীতে, তাও অজানা নয়। বস্তুত বিশ শতকের বিভিন্ন চিন্তা-প্রস্থানে তাঁর অলক্ষ্য উপস্থিতি সম্পর্কে বহু ভাষ্যকার আলোচনা করেছেন। এইজন্য হ্বিটগেনস্টাইন একবার কিয়ের্কেগার্দকে উনিশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী চিন্তাবিদ বলে বর্ণনা করেছিলেন। পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক ও সামাজিক অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন গ্রহীতারা যেহেতু তাঁকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা কার্যত অনেক কিয়ের্কেগার্দের মুখোমুখি হয়েছি।

এই অনেক কিয়ের্কেগার্দের মধ্যে কোন জনকে চাই, এটা কীভাবে নির্ণীত হবে? দেশে-কালে এর মীমাংসা হয়তো বা ভিন্ন হতে বাধ্য। কিন্তু কোন্ কিয়ের্কেগার্দকে চাই, এই প্রশ্ন যুক্তিগ্রাহ্য কিনা এমন সংশয়ও তো এড়িয়ে যেতে পারিনা। তাঁর বহুরৈখিক চিন্তাপ্রণালী ও বিচিত্রগামী লিখনশৈলী কি আসলে মুখোস যাকে পেরিয়ে গিয়ে প্রকৃত মুখাবয়বে পৌঁছাব? তাহলে, বলতে হয়, কিয়ের্কেগার্দের মধ্যে রয়েছে প্রত্ন-আধুনিকোত্তর ভাববিশ্বের কথকতা। কেননা এতে দেখতে পাই বহুস্তরান্বিত তাৎপর্যের বিন্যাস, উন্মুক্ত প্রতিবেদন এবং অজস্র প্রবেশবিন্দু ও নির্গমবিন্দুর সমাবেশ। সেক্ষেত্রে, অবশ্য মিশেল ফুকো ও রোলাঁ বার্তের মতো 'লেখকের মৃত্যু' ঘোষণা করে চির-আপেক্ষিকতার ধারণায় নির্ভর করতে হবে। কোনো গ্রহীতা-পাঠক সম্ভবত বহুকেন্দ্রিক ঐ ভাববিশ্বের প্রধান বা অপ্রধান উদ্দিষ্ট সম্পর্কে স্থির-নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানাতে পারবেন না। কিছু কিছু সম্ভাব্য মীমাংসা-সূত্র উপস্থাপিত করা যেতে পারে; তবে তার আগে নিজস্ব অবস্থান অনুযায়ী ঠিক করে নেওয়া চাই, কোন্ বয়ানকে প্রধান বলব কাকেই বা বলব অপ্রধান। প্রতীয়মান আকরণ কি সত্যিই প্রতীয়মান কিংবা গভীর আকরণ কি সত্যি গভীর! অথবা, কাকে বাহির বলব আর কাকেই বা ভিতর! এমন নয় যে কোনো-একটি আলোচনায় সব কিছু ছুঁয়ে যাওয়া যাবে কিংবা কিয়ের্কেগার্দের পুনঃপাঠ সম্পর্কে কোনো সর্বজনগ্রাহ্য চিন্তাসূত্র প্রস্তাবিত হবে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো বাধা আসবে স্বয়ং কিয়ের্কেগার্দের কাছ থেকেই। অতএব শুরুতেই ঠিক করে নিই বরং, নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁর ভাববলয়ের আকর্ষণীয় দীপ্তিতে চোখ-ধাঁধিয়ে যেতে দেব না; সরাসরি তাকাব তাঁর লিখন-বিশ্বের দিকে, বলা ভালো, লিখনবিশ্বের গভীরে।

সক্রেটিস সম্পর্কে ছদ্মনামের একটি রচনায় যে-উচ্চারণ করেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ,

তা আসলে তাঁর নিজের জীবন-প্রেক্ষিত সম্পর্কে প্রযোজ্য : ''His whole life was a personal preoccupation with himself' (Kierkegaard's papers and journals: Penguin : 1996 : 382) এই যে নিজের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার গ্রন্থনা, তার ভেতরে কত অজস্র উচ্চাবচতা ও বিনির্মাণের পরম্পরা থাকতে পারে— মাত্র বিয়াল্লিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে আমাদের কাছে তা উন্মোচিত করেছেন কিয়ের্কেগার্দ। প্রাতিভ-সত্তাবাদী দর্শনে জীববিশ্বের যে-ধারণাটি কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়ে থাকে, সেই নিরিখেও তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের তাৎপর্য বিচার করে দেখা যায়। প্রাগুক্ত মন্তব্যের অনুদ্ধৃত অংশে ইতিহাস-বৈশ্বিক মাত্রার কথা লিখেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ। আর সেই সঙ্গে জানিয়েছিলেন ঐশ্বরিক নির্দেশের কথাও। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মবোধের সঙ্গে তাঁর অন্বয় বা অনন্বয়ের অত্যন্ত জটিল প্রশ্নটি বিপুল সমস্যা তৈরি করে। তাই, একটু আগে যেমন লিখেছি, কিয়ের্কেগার্দের বহুতলযুক্ত ভাববিশ্বে পরিক্রমার জন্যে নিজস্ব একটি পথ নির্বাচন করে নেওয়াই ভালো।

মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আরও একবার তাকাতে পারি তাঁর সময় ও পরিসরের দিকে। ১৮১৩ সালের ৫ মে তাঁর জন্ম। এই একই বছর রিচার্ড ভাগনের-এরও জন্ম হয়েছিল। জন্মসালের নিরিখে কিয়ের্কেগার্দ ডস্টয়েভস্কি থেকে আট বছর ও কার্ল মার্ক্স থেকে পাঁচ বছরের বড়। আর, হেগেল থেকে তিনি তেতাল্লিশ বছর ছোট। তাঁব চিন্তাবৃত্তে দার্শনিক শেলিং-এর ছায়াও লক্ষ করেন কেউ কেউ-১৮৪৩-এ যাঁরা বিখ্যাত বার্লিন বক্তৃতায় কিয়ের্কেগার্দ শ্রোতা হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কোপেন-হেগেন নগরে সোরেনের সংক্ষিপ্ত জীবন অতিবাহিত হয়েছিল। স্বভাবত সমকালীন কোপেনেহেগেনের বাজনৈতিক -ধর্মীয়-নৈতিক পরিবেশ তাঁকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর বাবা অর্থনৈতিক ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন যদিও উনিশ শতকের গোড়ায় ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাওয়ার ফলে ডেনমার্ক অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত ছিল। সোরেনের বয়স যখন এক বছর, নরওয়ে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বস্তুত তাঁর শৈশবে ডেনমার্কের সমাজে নানা ধরনের অন্ধকার নেমে এসেছিল। সমাজে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছিল অপরাধ-প্রবণতা। এই পরিস্থিতির পাশাপাশি পারিবারিক বৃত্তেও ছিল গুমোট আবহাওয়া। সোরেনের বাবা মিকেইল পিডারশন বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। অন্যদিকে তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে। সমস্ত পরিবারের ওপর মিকেইল নানা ধরনের বাধা-নিষেধ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে মিকেইলের প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন; দ্বিতীয় স্ত্রী এইনে লুন যদিও তাঁর সাতটি সন্তানের জননী — কোনো -একটি নিগূঢ় কারণে,অপরাধবোধ জনিত জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিক্রিয়া তাঁকে অসামাজিক, বিবরবাসী ও ধর্মান্ধ করে থাকবে। স্বয়ং সোরেন পরবর্তী কালে এসম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেছেন। তা থেকে তাঁর নিজের মানসিক জটিলতার সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ সংকেত পাওয়া যায়। আর, এও

বুঝতে পারি, তাঁর চিন্তাবিশ্বের যাবতীয় সূক্ষ্মও প্রধান প্রবণতার ধাত্রীভূমি ছিল পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ। ডেনমার্কের ভঙ্গুর আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের রুগ্নতা ও অনিশ্চয়তা যেন কিয়ের্কেগার্দ পরিবারের উদ্ভট, নিরালম্ব ও অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতিকে গাঢ়তর শূন্যতার দিকে সঞ্চালিত করেছিল।

দুই

সোরেন কিয়ের্কেগার্দকে যদি ঠিক মতো বুঝতে চাই, বার বার ফিরে যেতে হবে তাঁর দিনলিপির পাতায়। শূন্যতা-ভরা কূটাভাস-দীর্ণ রুগ্ন সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর জীবনের পাঠকৃতিকে যদি যথাপ্রাপ্ত আস্তিত্বিক নন্দনের অভিব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চাই, ১৮৪৬ সালের এই বয়ানকে খুব ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে হয় : 'The new development in our age connot be political. for politics is a dialectical relation between the individual and the community in the representative individual; but in our times the individual is in the process of becoming far too reflective to be able to be satisfied with merely being represented' (The Journals of Kierkegaard : Newyork : 1959 : 97)। এই উচ্চারণকে আপাতভাবে যত সরল বলে মনে হোক না কেন, প্রকৃত বিচারে তা কিন্তু বেশ জটিল। যুগের প্রতিনিধি হওয়ার জন্যে কোনও ব্যক্তিকে বিধৃত হতে হবে সত্তা ও সামাজিকতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে। এই সম্পর্ক সর্বদা রয়েছে হয়ে ওঠার জায়মান ও আপেক্ষিক প্রক্রিয়ায় ; প্রতিনিধিত্বের বোধ তাই যথাপ্রাপ্তের নিয়ত পুনর্বিন্যাস ও পুনরুত্থাপনে পরিশীলিত হয়ে থাকে। কিয়ের্কেগার্দের চেতনাবিশ্ব সম্পর্কে কোনও অনড় ও নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা তাই কার্যত অসম্ভব।

প্রাগুক্ত উচ্চারণের তিন বছর আগে, ১৮৪৩ সালে লিখিত দিনলিপির অন্তিম বয়ানে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ যে-বক্তব্য পেয়েছি, সেখানে বরং ফিরে যেতে পারি : 'It is perfectly true. as philosophers say. that life must be understood backwards. But they forget the other proposition that it must be lived forwards.'(তদেব : ৮৯) অসাধারণ দ্যোতনাময় এই উচ্চারণ, এতে সন্দেহ নেই। জীবনের তাৎপর্য অবশ্যই বুঝতে হয় অতীতের অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধির নিরিখে। এবং এও সত্য যে জীবন কেবলই আমাদের সামনের দিকে তাকাতে বলে। অবশ্য একই নিঃশ্বাসে কিয়ের্কেগার্দ এও জানিয়েছিলেন যে কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তের আকরণ থেকে জীবনবে কখনও সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করা সম্ভব হয়না। কেননা আমরা এমন কোনও প্রয়োজনীয় অবকাশ তৈরি করে নিতে পারিনা যেখানে বহতা সময় আপাতভাবে স্থির ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ফলে পেছনের দিকে তাকাতে-না-তাকাতেবর্তমান ও সংলগ্ন ভবিষ্যতের চাপে আমাদের বীক্ষণবিন্দু শিথিল হয়ে পড়ে।

দিনলিপির উচ্চারণগুলিকে রৈখিক ভাবে ও কোনও পূর্ব-নির্ধারিত আকল্পের সমর্থনে ব্যবহার করা অবশ্য খুবই কঠিন। এইমাত্র যে অতীতে ফিরে তাকানোর মধ্য দিয়ে জীবনের তাৎপর্য খোঁজার কথা লিখেছি, কিয়ের্কেগার্দের কাছে তা কিন্তু জ্যামিতিক ছকের মতো ব্যবহার্য নয়। জীবনের সূচনা-পর্বেও নিহিত থাকতে পারে পরিণত পর্যায়ের উদ্ভাসন ও অন্ধবিন্দুর বীজতলি—কেন্দ্রীয় এই উপলব্ধিকে কত রকম ভাবে যে উপস্থাপিত করেছেন তিনি, তার ইয়ত্তা নেই। শৈশবেই তাঁর আস্তিত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক উপলব্ধির যাত্রাপথ ও নির্যাস নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। বাবার যৌনজীবনের সম্ভাব্য অন্ধকার বলয়ে উগ্র ধর্মান্ধতার শিকড় নিহিত ছিল — এই ধারণার কথা পরবর্তী কালে কিয়ের্কেগার্দ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করেছেন। খ্রিস্টীয় নৈতিকতা ও ধর্মবোধ অনুযায়ী মিকেইল পাপপুণ্যের গাণিতিক ছকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং এটাই তাঁর উদ্ভট ও অসামাজিক আচবণের প্রধান কারণ। নিজের দুর্বহ অপরাধবোধের বোঝা তিনি তাঁর সন্তানদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন। কিয়ের্কেগার্দ যে পরবর্তী কালে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা, ভয় ও শিহরণ, ব্যাধি ও মৃত্যু, শ্লেষ ও কূটাভাস নিয়ে দার্শনিক প্রতিবেদন গুলি রচনা করেছেন, এবং এদের সমবায়ী উপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে তাঁর আস্তিত্বিক নন্দন—এব সূক্ষ্ম ও গভীর ভিত্তিভূমি রয়েছে তাঁর বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ শৈশবে।

তবে বাবার ধর্মান্ধতা তাঁকে কোনও পিঞ্জরে বন্দি করেনি; উগ্র ধর্মীয় নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে বড় হয়ে উঠলেও তাঁর কাছে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম কিন্তু নৃশংস ও অমানবিক বলে প্রতিভাত হয়েছে। নিজেকে জন্মাবধি রুগ্ন ও বৃদ্ধ বলে ভেবেছেন কিয়ের্কেগার্দ। তাঁর সমস্ত অভিনিবেশ কেন বারবার ভয় ও উদ্বেগে ফিবে ফিরে আসে, কেনই বা দীর্ঘশ্বাসের রাজ্যে বাধ্যতামূলক অবস্থান নিতে হয় তাঁকে-- এই কথা পুনরাবৃত্ত হয়েছে তাঁর দিনলিপিতে, বৌদ্ধিক বয়ান গুলিতে। তাঁকে কিংবা তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের ঠিক স্বাভাবিক বলা যায় না। তাঁর নিজের সম্পর্কে সর্বজন-বিদিত মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করা যায় : 'like a solitary fir tree egoistically separate and pointed upward I stand, casting no shadow, and only the wood-dove builds its nest in my branches.' (এইচ, ব্ল্যাকহ্যাম কর্তৃক উদ্ধৃত: Six Existentialist Thinkers : London : 1997 : 1)

মাত্র তেইশ বছর বয়সে দিনলিপি লিখতে শুরু করেন কিয়ের্কেগার্দ। ১৮৩৫ সালের প্রথম বয়ানে শৈশব সম্পর্কিত কোমল স্পর্শকাতর ভাবমূর্তি যেন কুঠারাঘাতে ছিন্ন হয়ে গেছে। এর প্রথম বাক্যটি এরকম : 'তখন সেই বিরাট ভূমিকম্প ঘটে গেল; ভয়ঙ্কর এক বৈপ্লবিক আলোড়নের অভিঘাতে আমার উপর আকস্মিক ভাবে নেমে এল নতুন ও অনস্বীকার্য সেই ব্যাখ্যার ধরন যার সাহায্যে সমস্ত তথ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে

পড়ে। তখন আমি এই সন্দেহ করতে শুরু করলাম যে আমার বাবার দীর্ঘ জীবন দৈব আশীর্বাদ নয়, বরং তা এক অভিশাপ। আর, আমাদের পরিবারের অতুলনীয় বৌদ্ধিক সম্পদ শুধুমাত্র এইজন্যে অর্জিত হয়েছে আমরা যাতে একে অপরকে ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলতে পারি : 'Then I felt the stillness of death grow around me when I saw my father, an unhappy man who was to outlive us all, a cross on the tomb of all his hopes. There must be a guilt upon the whole family, the punishment of God must be on it.' (তদেব : ৩৯)। এই মন্তব্যের নিরিখে মনে হতে পারে, অমোঘ দণ্ডাজ্ঞার ছায়াকে অনিবার্য উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ। যেন মৃত্যুর নিস্তব্ধতা তাঁর সত্তার চিরসঙ্গী, বন্দিশালার বাসিন্দা হিসেবে তাঁর অনুভূতি জুড়ে রয়েছে শুধু ব্যর্থ উদ্যমের বার্তা আর সমস্ত প্রত্যাশাই বুঝিবা কবরের উপরে গড়ে-ওঠা সমাধি-ফলকের মতো। কথা হচ্ছে, এই নৈরাশ্য জর্জরিত পাপবোধ লালিত ভাবনা কি তাঁর জীবনের সঞ্চালক যা সমস্ত যৌক্তিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করে ? তাহলে বিষয়গত সত্য বলে কি কিছু নেই? পিঞ্জরায়িত ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিষয়ীগত সত্যকে অনুধাবন করতে গিয়ে শুধু কি উদ্বেগে, আতঙ্কে ও অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হবে? যদি এমন হয়, সমস্ত কিছুই তাহলে অমোঘ ও পূর্ব-নির্ধারিত; অতএব বিষয়ীগত সত্য অর্জনের জন্যে কোনও দক্ষতা অর্জনের বা সৃজনী ক্ষমতা প্রয়োগের কোনও প্রয়োজন নেই।

এভাবে শৈশবের উপলব্ধি থেকে বিচ্ছুরিত সূক্ষ্ম ভাবনাপুঞ্জ কিয়ের্কেগার্দের দার্শনিক প্রতিবেদন গুলিতে বিচিত্র ভাবে ও অজস্র ধারায় বিকশিত হয়েছে। আবার মোহানায় দাঁড়িয়ে যেহেতু উৎসের দিকে ফিরে তাকিয়ে জীবন-ব্যাপ্ত দ্বিবাচনিকতার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হয়, অকাল-মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিনগুলিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র আক্রমণাত্মক বয়ান গুলি হয়ে ওঠে বিপ্রতীপ দর্পণ। শৈশব থেকে যৌবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ভাবনাপথ অভিন্ন উপলব্ধি-বলয়ের উদ্ভাসন ও অন্ধবিন্দুতে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। কিয়ের্কেগার্দ কেন বিভিন্ন ছদ্মনামে, নানা লিখন-শৈলীতে, বিচিত্র অন্তর্বস্তু নিয়ে লিখেছেন-- এই জিজ্ঞাসার কোনো সহজিয়া মীমাংসা নেই। এমন ভাবতে পারি যে, এক শতাব্দীর চেয়েও পরে লেখক-সত্তার জন্ম-মৃত্যু কিম্বা অনেকান্তিকতা নিয়ে যেসব তত্ত্বচিন্তা বিকশিত হয়েছে, তাদের প্রায়োগিক প্রত্নরূপ আভাসিত হয়েছিল কিয়ের্কেগার্দের সন্দর্ভবিশ্বে। এইজন্যে তাঁকে যেমন প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চিন্তাবিদ বলব, তেমনই এই সত্যও মেনে নেব যে কোনো বিশেষ পাঠ কখনও তাৎপর্য সম্পর্কে চূড়ান্ত উচ্চারণে সক্ষম হবে না। প্রতিটি পাঠই হবে আপেক্ষিক, এমনকী, অসম্পূর্ণও। তাই কিয়ের্কেগার্দ সম্পর্কে সতর্ক মধ্যম পন্থা গ্রহণের ঝোঁক অনিবার্য হয়ে পড়েছে। তবু, পাঠ-পাঠান্তরের অজস্রতায়, তাঁকে ঘিরে রহস্যবলয় যে গাঢ়তর হয়েছে-- তাও ঐতিহাসিক ভাবে নির্ধারিত।

তিন

'On the Concept of Irony with Continued Reference to Socrates' (১৮৪১) শীর্ষক গবেষণাসন্দর্ভ সম্পূর্ণ করার জন্যে কিয়ের্কেগার্দ দশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ করা যায়, পাশ্চাত্য দর্শনে সক্রেটিস ও কিয়ের্কেগার্দ দু'জন শ্রেষ্ঠ 'ironist' হিসেবে বন্দিত হয়ে থাকেন। সক্রেটিসের মতো কিয়ের্কেগার্দও আপন জীবনের পাঠকৃতি থেকে দার্শনিক নির্যাস নিঙড়ে নিয়েছিলেন। পারিবারিক বৃত্তে বাবার ভূমিকা যদিও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল, বৌদ্ধিক চর্চা ও কল্পনা-প্রতিভার প্রয়োগের ব্যাপারে আবার তিনি ছিলেন প্রেরণার উৎস। এই যে বিচিত্র দ্বৈততা, এর গভীর গভীরতর প্রভা তাঁর চিন্তাবিশ্বে বিচ্ছুরিত হয়েছিল। জীবন ও চিন্তার বহুকেন্দ্রিকতা, নিরন্তর নতুন পথ ও গন্তব্য সন্ধান এবং সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ ঐ বিচ্ছুরণের ফসল। শৈশব ও কৈশোরের আরোপিত উগ্র খ্রিস্টীয় ধর্মচর্যাকে যেমন তিনি পরবর্তী কালে শৃঙ্খল বলে মনে করেছিলেন, তেমনই হেগেলীয় দর্শনের প্রতি প্রাথমিক অনুরাগও শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল না। যাতে ব্যক্তি-অস্তিত্বের পরিসর মর্যাদা পায় না বা অস্তিত্বশীল সত্তার গুরুত্ব স্বীকৃত নয়— সেখানে ব্যক্তিগত জীবন মূল্যহীন ও তার ব্যাখ্যা অপ্রাসঙ্গিক। ১ আগস্ট, ১৮৩৫ এর দিনলিপিতে লিখেছিলেন কিয়ের্কেগার্দ : 'The thing is to understand myself ... the thing is to find a truth which is true for me, to find the idea for which I can live and die.' (প্রাগুক্ত : ৪৪)। আর, এইজন্যে জীবনের গতিপথ ও জীবিকা সম্পর্কে তিনি কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট পিঞ্জরে নিজেকে রুদ্ধ করেননি। সেইজন্যে সমস্ত জীবনকে সঞ্চালিত করার মতো কোনও একক ভাবাদর্শও তিনি গ্রহণ করেননি। এদিক দিয়ে উদ্ধৃত মন্তব্যের সঙ্গে তাঁর অবস্থানের বিরোধিতা ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

১৮৪১-এ প্রলম্বিত গবেষণার ফসল হিসেবে সক্রেটিস ও শ্লেষতত্ত্ব বিষয়ক সন্দর্ভ যখন সম্পূর্ণ হচ্ছে, রেগিন ওলসেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন সোরেন। মোটামুটি একবছর ধরে রেগিনের সঙ্গে প্রেমপর্ব অব্যাহত ছিল। বাক্‌দত্তা প্রেমিকাকে বিয়ে করতে তিনি কেন অস্বীকার করেছিলেন, এর উত্তর খুঁজতে হবে তাঁর জটিল অন্তর্জীবনে। জীবন ও দর্শনের পাঠকৃতি কিয়ের্কেগার্দের বহুস্বরিক অস্তিত্বের গহনলোকে নির্মিত হয়েছে বলে এই ঘটনার তাৎপর্য নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা নানা ধরনের মন্তব্য করেছেন। এই ঘটনা সমকালীন কোপেনহেগেনে এতটা আলোড়ন তৈরি করে যে, কিয়ের্কেগার্দ সাড়ে চারমাসের জন্যে বার্লিনে চলে যান। এ সম্পর্কে জোসিয়া থমসন মন্তব্য করেছেন : 'সারা জীবন ধরে সোরেন যে পার্থিব জগৎ থেকে দূরে সরে থাকতে চেয়েছেন, রেগিনের কাছ থেকে তাঁর পালিয়ে যাওয়াতে আসলে তারই বিশেষ মর্মভেদী বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাচ্ছি।' যাই হোক,

ব্যক্তি-জীবনের তুমুল উথাল-পাথালের মধ্যেই তাঁর নিবিড় সৃষ্টিশীল পর্যায়ের সূচনা হয়েছে। এই নিবন্ধের অন্যত্র শেলিং-এর বক্তৃতা শোনার যে-বিষয়টি উল্লেখ করেছি, তা এসময় তাঁর অন্তর্জীবনের ভাঙচুরে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল।

১৮৪৩- এ কিয়ের্কেগার্দের বিখ্যাত বই Either / or প্রকাশিত হয়। ঐ একই বছর বেরোয় 'Repetition' এবং 'Fear and Trembling' নামে দুটি স্বল্পায়তন বই। এইসব সন্দর্ভ লেখকের 'personal preoccupation with himself' - এরই দৃষ্টান্ত। সত্তা কীভাবে সামাজিক পরিসরে অনন্য অবস্থান গ্রহণ করতে পারে, কীভাবেই বা আত্মিক ও নৈতিক নিরিখের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায় ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও সর্বজনীনতার দ্বিরালাপ — কিয়ের্কেগার্দ সেদিকে নানা ভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। ১৮৪৪- এ সামান্য দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হলো 'Philosophical fragments' এবং 'The concept of Anxiety' নামে দুটি বই, যাদের মধ্যে লেখকের নতুন দিগন্ত সন্ধান ব্যক্ত হয়েছে। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৪৫- এ বেরিয়েছে 'Stages on life's way'যাতে দু-বছর আগের চিন্তাবীজগুলি ধর্মবোধের প্রেক্ষিতে পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে। অস্তিত্ববোধ, জ্ঞানতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যেন সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন কিয়ের্কেগার্দ, এরকম মনে হয়। ১৮৪৬- এ প্রকাশিত 'Concluding Unscientific Postscript to the Philosophical fragments' বইতে লেখকের সংশ্লেষণী মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে। আবার নামকরণের মধ্যে এই ইঙ্গিত রয়েছে যেন লেখক মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সেই ভাবছেন, এ তাঁর উত্তরলেখ। তার মানে, তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের মূল পর্যায় শেষ হয়ে গেছে। এ শুধু তাঁর প্রলম্বিত অস্তিত্বের পরিশিষ্ট।

এইসব রচনার পাশাপাশি নানা ছদ্মনামে কিয়ের্কেগার্দ অজস্র সন্দর্ভ রচনা করেছেন। এইসব লেখার সূত্রে সমসাময়িক নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর যাবতীয় সামাজিক সম্পর্ক কার্যত ধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে বারবার তাঁর নিভৃত সত্তা বিনির্মিত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বারবার পাল্টে নিয়েছেন তিনি, সামাজিক ও আর্থিক কারণে বহুবার বাসস্থান পাল্টে নিয়েছেন। সব মিলিয়ে লেখক হিসেবে তাঁর আস্তিত্বিক ও সামাজিক পরিসর নিরন্তর পুনর্বিন্যস্ত হয়েছে । স্বতশ্চল ভাবে এসে গেছে নতুন নতুন আরম্ভ, বিকাশ ও পরিগ্রহণের প্রসঙ্গ । প্রকাশিত হয়েছে 'Edifying discourses in different spirits' এবং 'works of love' (১৮৪৭); 'christian discourses' (১৮৪৮), 'The lilies of the field and the birds of the air' এবং 'Three discourses at communion on fridays'। স্পষ্টত, এই রচনাগুলির আধেয় খ্রিস্টীয় ধর্মানুষঙ্গ। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এগুলি তিনি নিজের নামেই লিখেছিলেন । অবশ্য 'The crisis in the life of an actress' (১৮৪৭) বইতে তিনি নান্দনিক বিষয় অবতারণা করেছিলেন ।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বিষয়ে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রচনা 'The point of view of my activity as an author' তাঁর মৃত্যুর পরে ১৮৫৬তে প্রকাশিত হয়েছিল। আর, ১৮৪৯ এ নতুন ছদ্ম নামে তিনি লিখেছিলেন 'The sickness unto death'এবং ১৮৫০ এ 'Practice in christianity'। সুতরাং উত্তরলেখ পরবর্তী বছরগুলিতে কিয়ের্কেগার্দের বহুমাত্রিকতা বরং বিচিত্র রচনাধারায় অভিব্যক্ত হয়েছে। বিষয়বস্তুতে খ্রিস্টীয় ধর্মানুষঙ্গ যদিও কয়েক বছর ধরে প্রকট ভাবে বর্তমান ছিল, জীবনের শেষ পর্বে তাঁর অবস্থান হয়ে উঠল দ্বিমেরু-বিষম, শৈশব-কৈশোরের জটিল প্রচ্ছায়া নতুন ভাবে ফিরে এল যেন। ১৮৫৪-এর ৩০ জানুয়ারি বিশপ মিন্স্টার এর মৃত্যুর পরে গির্জার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক উত্তরোত্তর তিক্ত হয়ে পড়ল। দ্রুত পরম্পরায় কিয়ের্কেগার্দ বেশ কিছু তীব্র আক্রমণাত্মক রচনা লিখলেন 'The Instant' শিরোনামে। মোট নটি বয়ান প্রকাশিত হওয়ার পরে ১৮৫৫ সালের ২ অক্টোবর কিয়ের্কেগার্দ হঠাৎ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ছয় সপ্তাহ পরে ১১নভেম্বর, কোপেনহেগেনের ফ্রেডরিক হাসপাতালে, মাত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সে তাঁর দেহান্ত হল।

চার

অস্তিত্বের বহুমাত্রিক জটিল গ্রন্থনা যাঁর জীবনের পাঠকৃতিকে দুরধিগম্য করে তুলেছে, তাঁর নান্দনিক প্রত্যয় সম্পর্কে কোনও সহজ পাঠের প্রস্তাবনা সম্ভব নয়। আগেই লিখেছি ভাষ্যকারদের অবস্থান অনুযায়ী তাঁর ভাববিশ্বের তাৎপর্য নানাভাবে নির্ধারিত হয়েছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাপ্রস্থানের অগ্রণী তাত্ত্বিক থিয়োডোর অ্যাডোর্নো। তাঁর 'Kierkegaard: Construction of the aesthetic' বইটি এই সূত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বভাবত কোনো-একটি সীমিত নিবন্ধে ওই বহুতলযুক্ত বিষয়ের প্রতি সুবিচারও করা সম্ভব নয়। কিয়ের্কেগার্দের কূটাভাস-ভরা লিখনবিশ্ব থেকে তবু নন্দনের সংজ্ঞা কিংবা নান্দনিক প্রতিবেদনের নির্মিতি-প্রকরণ সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত খুঁজব না। এখানে আরও একটি কথা বলে নিতে হয়। সাধারণ ভাবে আমরা নন্দন বলতে যা বুঝি, সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক প্রতিবেদনে এর আবশ্যিক উপস্থিতিকে যেভাবে গ্রহণ করি—কিয়ের্কেগার্দ মোটেই সেরকম ভাবেন নি।

'The Point of View for my Work as an Author' বইতে কিয়ের্কেগার্দ নান্দনিকতার ধারণাকে মূলত লেখকসত্তার অন্যতম মৌলিক বর্গ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন। বিষয়টিকে যথাযথ মাত্রায় অনুধাবন করতে না পারলে নান্দনিক, ধর্মীয়, নৈতিক স্তরে জীবনের বিভাজন অর্থহীন হয়ে পড়ে। লেখক-সত্তার নির্ণায়ক উপাদান হিসেবে নান্দনিক, ধর্মীয় ও নৈতিক প্রবণতার মধ্যে কাকে বেছে নেব, এই প্রশ্নটি যথার্থ দৃষ্টিকোণ

অবলম্বনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক কেন্দ্র হিসেবে লেখক-সত্তার ভূমিকাকে কীভাবে উপস্থাপিত করেছেন কিয়ের্কেগার্দ, পরবর্তী ভাষ্যকারেরা সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন। তাঁর বৌদ্ধিক প্রকল্পের অন্তর্বৃত সর্বাত্মক অস্থিরতা ও ব্যাপক আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও প্রাগুক্ত তিনটি প্রবণতার মধ্যে নান্দনিক বোধকে কেন আলাদা গুরুত্ব দেব, তা ভেবে দেখতে হয়।

আগেই লিখেছি, 'নান্দনিক' শব্দটি মূলত পারিভাষিক হলেও কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্বে তা যথাপ্রাপ্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হয়তো এইজন্যে গোলাম ফারুকের মতো কেউ কেউ শব্দটিকে 'ভোগী' অর্থে গ্রহণ করেছেন। ফারুকের মতে কিয়ের্কেগার্দের নন্দন-সংশ্লিষ্ট বইগুলি এমনভাবে লেখা হয়েছে যাতে কোনও ফিলিস্তিন পাঠক সেইসব পড়তে পড়তে জীবনের অসারতা উপলব্ধি করতে পারে। ড্যানিশ ভাষায় রচিত মূল নিবন্ধের ভিন্নধর্মী ইংরেজি অনুবাদের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে বলে কিয়ের্কেগার্দের চিন্তাবিশ্ব সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তির সূচনা হয়েছে। যেহেতু বাঙালি পাঠকের কাছে কিয়ের্কেগার্দের মতো জটিল ও অনেকান্তিক চিন্তাবিদের ভাবমূর্তি সাধারণভাবে মূল সন্দর্ভ ও সেই সন্দর্ভের বিবিধ ভাষ্যের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, বিচিত্র বক্তব্যের অনন্বয়ে পরস্পর-বিরোধিতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের মনে রাখতে হয় যে, সংক্ষিপ্ত জীবনেও কয়েকটি পরস্পর-বিরোধী ভাব-পর্যায়ের সংকেত তিনি নিজেই দিয়ে গেছেন। অতএব যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের ভাবনাকে যদি তাঁর চিন্তাবিশ্বের নিয়ন্তা বলে ভেবে নিই, তাতে তাঁর জীবন-ব্যাপ্ত কূটাভাসের গ্রন্থনা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবে। এই মূল কথাটি মনে রেখেই কিয়ের্কেগার্দের নান্দনিক প্রতীতি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

শৈশব থেকে অকাল-মৃত্যুর অব্যবহিত আগেকার দিনগুলি পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ নিরন্তর আত্ম-বিনির্মাণের প্রক্রিয়াকে যদি গুরুত্ব না দিই, কেবলমাত্র তবেই ভাবতে পারি, কিয়ের্কেগার্দ যা-কিছু লিখেছেন, খ্রিস্টধর্ম নিয়েই লিখেছেন এবং তাঁর সব লেখাই খ্রিস্টধর্মের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। অথচ একই নিঃশ্বাসে আমরা তাঁর কূটাভাস-ভরা নিরন্তর পর্বান্ত-গুলির নির্মাণ-প্রকল্পকেও গুরুত্ব দিচ্ছি। ভাবকল্পের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে যিনি বাঁচতে চেয়েছেন, তাঁকে বারবার বিশ্বাসের পিঞ্জরকেও ভাঙতে হয়েছিল। যে খ্রিস্টান নয়, সে প্রকৃত মানুষ নয় এবং তার বেঁচে থাকা অর্থহীন : এই বক্তব্যকে যদি প্রসঙ্গ-বিচ্ছিন্ন ভাবে গুরুত্ব দিই, তাহলে, অন্যধর্মাবলম্বী ও নিরীশ্বরবাদী, যুক্তিবাদী ও খাঁটি আধুনিকদের জন্যে কোনও পরিসরই অবশিষ্ট থাকবে না। ভয়ঙ্কর এই মৌলবাদী ধারণার পঙ্ককুণ্ডে উগ্র ফ্যাসিবাদ জন্ম নেয়। অতএব নন্দন-সংক্রান্ত আলোচনা শুধুমাত্র ফিলিস্তিনদের প্রকৃত খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, এ ধরনের কোনও দূরবর্তী সম্ভাবনাও আমাদের কাছে পরিত্যাজ্য।

আমরা কিছুতেই একথা ভুলতে পারি না যে কিয়ের্কেগার্দ একটি সচেতন সত্তা হিসেবে নিজের বহুমাত্রিকতাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। মানুষের অস্তিত্বের চেয়ে মানুষের নির্যাসকে বেশি প্রাধান্য দিতে তিনি রাজি নন। চিন্তাশীল হওয়ার জন্যে মানুষকে অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে। সত্তা যে-নির্যাসকে আশ্রয় করে তৈরি হয়েছে বলে কল্পনা করা হয়, সেই নির্যাসের চেয়ে কিংবা সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রকরণের চেয়ে অথবা বিজ্ঞান-দর্শন-ধর্ম-রাজনীতি প্রস্তাবিত সত্তার ব্যাখ্যার চেয়ে প্রসারণময় অস্তিত্বের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই বক্তব্য যদি মেনে নিই, তাহলে বলব, ধর্মতন্ত্র সহ অন্যান্য সমস্ত বহির্বৃত ভাব-পিঞ্জর দ্বারা সত্তাকে সংজ্ঞায়িত করার যাবতীয় প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মানব-অস্তিত্বকে একটি সচেতন অপ্রাতিষ্ঠানিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন কিয়ের্কেগার্দ — এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতেই হয়। যা কিছু অস্তিত্বকে বিষয়ীগতসত্যের দর্পণে প্রতিফলিত করে, তাঁর আগ্রহ সেইজন্যে। কিংবা এটাও হয়তো শেষ কথা নয়। আবার তিনি লক্ষ করেছেন, প্রণালীবদ্ধ যুক্তিবাদের সাহায্যে জ্ঞানাত্মক সত্তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হলেও সেখানে তার নৈতিক সত্তার স্বরূপ কিংবা নিজস্ব অস্তিত্ব সন্ধান করা বৃথা। মানুষ যত বুদ্ধিবাদী হয়ে উঠছে, প্রখর ভাবাবেগ দিয়ে কীভাবে জীবন যাপন করা যায়, সেই পদ্ধতি ও প্রকরণ সত্তা ভুলে যাচ্ছে। কিয়ের্কেগার্দের এই ভাবনার মুখোমুখি হই যখন, নিরেট কেজো সম্প্রদায়ের নিরন্ধ্রজগতের সঙ্গে প্রতিদিনকার সংঘর্ষে রক্তাক্ত-হওয়া আর্ত ও নিঃসঙ্গ মানুষের সংযোগশূন্য বেদনার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যেন। নিজের মুদ্রাদোষে নিজে একা প্রতিনিয়ত আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে অনন্বয়ক্লিষ্ট মানুষটি, তার পক্ষ থেকে বলার মতো কথাই উচ্চারিত হতে শুনি।

বুঝতে পারি কেন কিয়ের্কেগার্দ বলতে চান, ব্যক্তিমানুষকে পূর্বনির্ধারিত ধারণার পিঞ্জরে রুদ্ধ করা সমীচীন নয়। একক অস্তিত্ব সর্বদা গোষ্ঠী থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, বিষয়গত সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে ব্যক্তিসত্তা যদি বাধ্যতামূলক ভাবে নির্বাসিত হয়ে পড়ে, তাহলে তা কোনো কাজে লাগবে না। দর্শনের অজস্র পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে গিয়ে মানুষ যদি কেবলই আপন সত্তাকে আড়াল করার মতো দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে, তবে সেই চক্রব্যূহে বন্দিত্বই তাকে প্রতিমুহূর্তে নিরাকৃত করবে। তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য : 'এরকম একটা জগৎ তৈরি করে কী লাভ যেখানে আমি বাস করি না ?' জীবন ও জগতের অন্তহীন উপকরণ ও পরিস্থিতির টানাপোড়েনে, প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে সত্তা। আর, সেইজন্যে প্রতিমুহূর্তে নিজের সদ্যপ্রাপ্ত অবস্থানকে সে পেরিয়েও যাচ্ছে। হওয়া আর হয়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় বাইরের কোনো কিছুই নির্মাতা বা নিয়ন্তা হতে পারে না। সদ্যবিগত মুহূর্তের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে মুছে ফেলে ব্যক্তিসত্তা বর্তমানকে গড়ে তুলছে ; আর, এই

যুক্তিশৃঙ্খলা অনুযায়ী আসন্ন ভবিষ্যতের অনিবার্য তাড়নায় তাকে বিনির্মাণও করছে। সোরেনের মতে ব্যক্তির অস্তিত্ব আর ব্যক্তির প্রত্যয় এক কথা নয় ; অস্তিত্ব সার্বভৌম বলেই তাকে প্রত্যয়ে রূপান্তরিত করা যায় না। তা অন্যাপেক্ষ নয়, পরাধীনও নয় ; নিছক যৌক্তিক পরম্পরা বা স্বতঃসিদ্ধ ধারণা দিয়ে অস্তিত্বের তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। বস্তুত প্রণালীবদ্ধ দার্শনিক প্রতিবেদনগুলি এত সীমায়িত যে তাদের মধ্যে ব্যক্তি-অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায়। সম্ভাবনা যতক্ষণ সক্রিয়, ব্যক্তি-অস্তিত্ব ততক্ষণ প্রাসঙ্গিক।

পাঁচ

এখন, এই একুশ শতকের সূচনাপর্বে, আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রস্থানগুলির আধিপত্য-প্রবণতা যখন সন্ত্রাসের চরিত্র অর্জন করে নির্মানবায়নের সহগামী প্রতীত বাস্তব প্রতীত পরিসর প্রতীত সময়ের চোরাবালিকে অবাধ ও দুস্তর করে তুলেছে— কিয়ের্কেগার্দের আস্তিত্বিক নন্দনের পুনঃপাঠ খুব জরুরি হয়ে উঠেছে। প্রাগুক্ত চিন্তাপ্রস্থানগুলির আক্রমণে সব ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা এত অনতিক্রম্য যে মানুষের মূর্ত অস্তিত্ব পুরোপুরি উপেক্ষিত। একক অস্তিত্ব এমন গভীর সংকটে বিপন্ন যে পিণ্ডাকার ভিড়ের মধ্যে পার্থক্য-প্রতীতির জন্যে কোনো মর্যাদা নেই আর। মহানাগরিক এবং আধা-নাগরিক সমাজের বাসিন্দারা একটি অভিন্ন ধরনে 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' সোনার হরিণের পেছনে ছুটতে-ছুটতে মরীচিকায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। সোরেন দেড় শতাব্দী আগে যা ভেবেছিলেন, তা কী তবে প্রত্ন-আধুনিকোত্তর চিন্তাপ্রণালীর নিদর্শন? কেননা তাঁর মতো আমরাও তো দেখছি, ইদানীং এমন-এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যখন কোনো মানুষই তার সত্তাকে পরিপূর্ণ করতে পারছে না। অধিকাংশ জন ছাঁচে-ঢালা পদ্ধতি নির্বিচারে অনুসরণ করে সুখ ও পূর্ণতার ভোগসর্বস্ব কল্পস্বর্গে নিজেদের স্থাপন করতে চায়। নিজেরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় না, দায়বোধও বহন করে না; নিজেদের উৎকট বিচ্ছিন্নতাকে চিনতে না পেরে তৈরি করে শুধু অবভাসের গ্রন্থনা। বিশেষত ইদানীং রাষ্ট্রব্যবস্থা-রাজনৈতিক সমাজ-আমলাতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র আঁতাত যেভাবে ব্যক্তি-অস্তিত্বের অন্তঃসারকে শুষে নিচ্ছে, মানুষ হয়ে উঠছে আপেক্ষিক বিন্দুমাত্র।

শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ী কিংবা সসীম ও অসীম যত দ্বিমেরুবিষম হোক না কেন, অস্তিত্ব-সন্ধানী মানুষ এদের মধ্যেও দ্বিরালাপ আবিষ্কার করতে চায়। অর্থাৎ জেনে শুনেই স্ববিরোধিতাকে নিজের গভীরে ধারণ করার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদ এ ধরনের প্রয়াসকে স্বীকার করুক বা না করুক, অস্তিত্বের নান্দনিক এষণায় ঐ চেষ্টা সম্ভাবনা হিসেবে মান্যতা পেতে পারে। কিয়ের্কেগার্দ তাই লিখেছেন : 'অসীম ও সসীম, শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ীর মিলনে যে শিশুর জন্ম হয়, তা-ই অস্তিত্ব; এইজন্যে অস্তিত্ব মানে নিরন্তর সংগ্রাম।' তাঁর

বক্তব্য হলো, ঐ স্ববিরোধী উপাদানের সংশ্লেষণে তৈরি হচ্ছে সত্তা। এই নির্মীয়মান প্রক্রিয়ার সূত্রে যে স্বতশ্চল আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনা প্রকট হয়ে উঠছে, তা স্বভাবত মুক্ত ও স্বাধীন। এই অর্থে সংগ্রামশীল অস্তিত্ব আর দ্বন্দ্বময় স্বাধীনতাকে বুঝে নিতে হয় অভিন্ন সক্রিয়তায়। আর, তাই, সূত্রাকারে কিয়ের্কেগার্দ বলেছেন : সত্তাই স্বাধীনতা। তা একই সঙ্গে সবচেয়ে বিমূর্ত আবার সবচেয়ে মূর্ত। মানুষের প্রতিটি কাজে, চিন্তা ও চেতনার প্রতিটি অভিব্যক্তিতে, সক্রিয় পর্যবেক্ষক-ভাষ্যকারের উপস্থিতিতে, বাইরে ও ভেতরে, আগে ও পরে বিচ্ছুরিত হয় স্বাধীনতার বোধ। যেখানে স্বাধীনতা, সত্তা সেখানেই। আর, তার বিনির্মাণ, তার সৃষ্টি, তার নন্দন। এইজন্যে মানুষ হয়ে ওঠার একটাই অর্থ: স্বাধীন হওয়া বিনির্মাণ-প্রবণ হওয়া অপ্রাতিষ্ঠানিক হওয়া সৃষ্টির নন্দনে সঞ্জীবিত হওয়া।

রজার পুলের একটি তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য এখানে স্মরণ করতে পারি : 'the Kierkegaardian text does not tell us something , it asks us something.' (১৯৯৮ : ৬১)। এইজন্যে কিয়ের্কেগার্দের বয়নবিশ্বে গ্রহীতা-পাঠকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নিরন্তর উত্থাপিত জিজ্ঞাসার অন্তর্বর্তী সম্ভাবনাকে খনন করে যাওয়াই আমাদের নান্দনিক কৃত্য। কেননা সোরেন কিয়ের্কেগার্দের প্রাথমিক ও মৌলিক পরিচয় হলো, তিনি একজন সংযোগ-সন্ধানী লেখক। পূর্বসূরিদের চিন্তাপ্রকরণকে অন্তর্বয়ন হিসেবে ব্যবহার করে তিনি ক্রমাগত এক প্রতিবেদন থেকে অন্য প্রতিবেদনে সরে যান। উচ্চারিত বয়ানে সম্পৃক্ত করেন নিরুচ্চার বয়ানের সঞ্চরমান বলয় ; উদ্ভাসিত পাঠের অন্তরালে রেখে যান অজস্র অন্ধবিন্দুর সমাবেশ। ফলে তাঁর রচনার নান্দনিক পরিগ্রহণে ব্যাসকূটের মুখোমুখি হওয়া পাঠকের পক্ষে অনিবার্য। চূড়ান্ত মীমাংসার বদলে স্তরে-স্তরে বিন্যস্ত সম্ভাব্য তাৎপর্যের প্রস্তাবনা করতেই বরং উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন আগ্রহী পাঠকেরা। কিয়ের্কেগার্দের প্রতিবেদন যদিও অন্তঃস্বভাবে নাটকীয় ও দ্বান্দ্বিক আকরণে বিন্যস্ত, তবু নির্দিষ্ট দর্শন-প্রস্থান প্রভাবিত প্রচলিত পাঠাভ্যাস অনুযায়ী সেইসব বয়ান থেকে ধর্মতত্ত্ব বা নীতিশাস্ত্রের সমর্থন জ্ঞাপক সিদ্ধান্ত বারবার খুঁজে নেওয়া হয়েছে। এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁর বয়ানের অন্তর্বর্তী কূটাভাস বা অন্ধবিন্দুগুলি শুধুই প্রতীয়মান। সুশৃঙ্খল তাৎপর্য যাঁদের কাছে ঈপ্সিত, তাঁরা নানা যুক্তি দেখিয়ে কিয়ের্কেগার্দের বাচনে চূড়ান্ত সমাধানের ইশারা আবিষ্কার করেন। কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্বে এত যে পর্বান্তর ও পরস্পর-বিরোধিতা রয়েছে, তাদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত মুক্ত গ্রন্থনা আসলে সংশয় ও বিশৃঙ্খলাকে নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে না। তাই নান্দনিক বিচারে কোনও ধরনের অভ্যস্ত নিরিখও কার্যকরী নয়। এমন হতেই পারে যে প্রতিটি পুনঃপাঠে লেখকের অভিপ্রায় ও অন্বিষ্ট সম্পর্কে আমাদের ধারণা আমূল বদলে যাচ্ছে। এমন কী, নন্দন ও নন্দনশূন্যতার মধ্যবর্তী জলবিভাজনরেখা মুছে যাচ্ছে। তাহলে, পাঠকের অভিপ্রায় অনুযায়ী কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্বের নান্দনিক সম্ভাবনা ও

নির্যাস অনবরত নির্ণীত হতে পারে : এরকম ধরে নিতে পারি।

রজার পুল এইজন্যে কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্ব পর্যটনকে বলেছেন 'hermeneutic adventure' (প্রাগুক্ত : ৬২)। তাঁর আস্তিত্বিক নন্দনের অভিব্যক্তিতে বিভিন্ন ছদ্মনামের উপস্থিতি খুব গুরুত্বপূর্ণ, এরকম ভেবেছেন মার্ক টেলর ও জর্জ প্যাটিসন (১৯৯২) এবং সিলভিয়া ওয়ালস্-এর (১৯৯৪) মতো আলোচকেরা। নন্দনের প্রাতিভ-সত্তাবাদী বিশ্লেষণ অনুযায়ী এইসব ছদ্মনাম ব্যবহারের ফলে মুহূর্ত-পরম্পরায় বিন্যস্ত উপলব্ধি-পুঞ্জের অনেকান্তিকতা ঈপ্সিত বহুত্ববাদী আধার পেয়েছে। সেই সঙ্গে অস্তিত্বের নান্দনিক মাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরেছে জীবনের নানা দিগন্তে ব্যাপ্ত উদ্‌ভাসন। কিংবা, এই বার্তাও সম্ভবত উঠে এসেছে যে, প্রতিটি বয়ানই আপেক্ষিক, অনিশ্চিত, অসম্পূর্ণ। নানা ছদ্মনামে রচিত ভিন্নভিন্ন প্রতিবেদনে বিচিত্র সম্ভাবনাময় আস্তিত্বিক নন্দনের অন্তহীন নির্মাণ-প্রকল্পই প্রস্তাবিত হয়েছে। এদের বিষয় যা-ই হোক, কিয়ের্কেগার্দ বারবার লিখনবিশ্বের সীমানাই যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। যেন প্রতিটি পাঠকৃতিতে আপন সত্তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার নতুন কৃৎকৌশল রপ্ত করে নিয়েছেন। জেনেছেন, অস্তিত্বের কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র নেই, নেই পরিধি কিংবা লক্ষ্য। জগতের সঙ্গে সংযোগের সেতু কেবলই পুনর্নির্মাণ করে যেতে হয় ; অথচ উদ্যমের শেষে কোথাও পৌঁছানোর নিশ্চয়তাও দেওয়া যায় না। পুরোনো উদ্যমকে শুধু নতুন উদ্যম শুরু করার উপক্রমণিকা হিসেবে গণ্য করা যায়। ছদ্মনাম তাই যতখানি আড়াল, ততখানি নান্দনিক প্রয়োজনও। কিয়ের্কেগার্দ আসলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, 'pseudonymity builds contradiction into the discourse and makes all linear or structural progress impossible.' (তদেব : ৬৪)।

পর্ব থেকে পর্বান্তরে অস্তিত্ব এবং অস্তিত্বের নান্দনিক অভিব্যক্তি যাতে পার্থক্য-প্রতীতির নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়াকে প্রকট করে তুলতে পারে, সেইজন্যে কিয়ের্কোর্দ ছদ্মনামগুলি ব্যবহার করেছেন। রবার্ট সি. রবার্টস্ তাই কিয়ের্কেগার্দের আত্ম-নিরাকরণকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মন্তব্য করেছেন : 'He does not want to be read as Kierkegaard. He wants. instead, to be a dispensable vehicle for his reader's coming to understand other things.' (১৯৮৬ : ১-২)। কিয়ের্কেগার্দকে যে 'dispensable vehicle' বলা হচ্ছে, তাতে বস্তুত তাঁর লিখনবিশ্বের নান্দনিক মাত্রাই ঘোষিত হলো। প্রতিটি বয়ানে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যে ব্যক্তিস্বর ও অন্তর্বয়নের নিয়ামক বহুস্বরের সমারোহ— তাদের পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য এবং যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের সীমা পেরিয়ে যাওয়ার প্রবণতা আমাদের লক্ষ করতে হয়। তখন মনে হয়, তিনি যত বড়ো দার্শনিক বা ধর্মতত্ত্ববিদ, তার চেয়ে অনেক বেশি কবি। তাঁর রচনার দ্ব্যর্থবোধকতা বা অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা দর্শন বা ধর্মতত্ত্বের অনুসারীদের জন্যে সমস্যা তৈরি করতে পারে ; সাহিত্যের পড়ুয়া বা নন্দন-

জিজ্ঞাসুদের পক্ষে কিন্তু ঠিক এইসব বৈশিষ্ট্যই আগ্রহ ও প্রত্যাহ্বানের কারণ।

অবশ্য এর মানে এই নয় যে তাঁর প্রতিবেদনগুলিকে প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিকতার নিদর্শন বলা যাবে। বরং প্রতি মুহূর্তে সুনির্দিষ্ট তাৎপর্য সম্পর্কে অনাগ্রহ ও অনাস্থা প্রকাশ করে বলেই গভীরতর অর্থে এদের স্রষ্টাকে কবিসত্তার অধিকারী বলতে পারি। তাৎপর্যের অনির্দেশ্যতাই এইসব বয়ানকে নান্দনিক পরিগ্রহণের বিষয় করে তুলেছে। প্রখ্যাত গবেষক মার্ক. সি. টেলর কিয়ের্কেগার্দের লিখন-বিশ্বের নান্দনিক স্বভাবকে এভাবে সূত্রায়িত করেছেন: **'Unity within plurality. being within becoming, constancy within change; peace within flux, identity within difference, the union of union and non-union- reconciliation in the midst of estrangement.'** (১৯৮০ : ২৭৬)। এই মন্তব্যের সঙ্গে অবশ্য সবাই একমত নাও হতে পারেন যেহেতু আন্তঃসম্পর্কের অন্তহীন গ্রন্থনায় বৈপরীত্যও নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং নেতি অস্তিত্বের অংশভাক্ হয়ে পড়ে। আকরণোত্তর পাঠতত্ত্বে স্বাধীন সঞ্চরমানতার যে-ধারণাকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, কিয়ের্কেগার্দের লিখনবিশ্ব পরিক্রমায় তার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। জাক্ দেরিদা ও রোলাঁ বার্তের তত্ত্বভাবনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হতে পারে।

ছয়

কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্বে উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ। নৈঃশব্দ্য ও বৈকল্পিকতার টানাপোড়েনও তেমনি অনিবার্য। এইসব ভাবনার সূত্রে তাঁকে আধুনিকোত্তর চিন্তা-প্রণালীর যথার্থ পূর্বসূরি বলেই মনে হয়। জাক্ দেরিদা ১৯৬৭ সালে 'Writing and Difference' নামক বিখ্যার্ত প্রতিবেদন রচনা করার সময় কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চিন্তার সূত্র যে গ্রহণ করেছিলেন, তার দার্শনিক ও নান্দনিক তাৎপর্য অনেকখানি। আবার সোরেনের অস্তিত্ববাদী চিন্তায় 'পরোক্ষ সংযোগ' এর তত্ত্ব ব্যক্তি-সত্তার অভিজ্ঞান-বিশ্ববীক্ষা-সমস্যায়নকে সম্মুখায়িত করে তুলেছে। তাঁর উপস্থাপনায় বহুত্ব ও বিকেন্দ্রায়ন, শিথিলতা ও সঞ্চরণশীলতা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠাকে তিনি কেন্দ্রীয় ভাববীজের মর্যাদা দিয়েছেন। আতঙ্ক ও নেতির অন্যোন্য-গ্রন্থনায় এমন-এক দার্শনিক কৃতি রচিত হয়েছে, যার তাৎপর্যকে আমরা এখন নানা দিকে প্রসারিত করতে পারছি। পরবর্তী অস্তিত্ববাদী দার্শনিকেরা কিয়ের্কেগার্দের বিভিন্ন ভাববীজকে সৃষ্টিশীল ভাবে বিকশিত করেছেন। বুর্জোয়া পৃথিবীর কপটতা ও মধ্যমেধার দাপটের মধ্যে এই চিন্তাবিদেরা যখন মুক্ত, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল মানবজীবনের কথা লিখছেন, দানবিক নৈঃশব্দ্যে গ্রথিত নিঃসঙ্গতাকে বিদীর্ণ করে সত্তাকে এই বোধে জেগে ওঠার কথা বলছেন : **'without assistance and without excuse, condemned to decide without support**

from any quarter, condemned for ever to be free.' (Jean Paul Sartre : The Age of Reason : 1961 : 243)।

সার্ত্রের মতো হাইদেগার, য়াসপের্স, কাম্যু, কাফকা কত গভীর ভাবে কিয়ের্কেগার্দের ভাবনায় পরিশীলিত হয়েছিলেন, তা স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। আমরা শুধু লক্ষ করব নান্দনিক প্রতিবেদনগুলির উৎসমূলে সোরেনের চিন্তাবীজগুলির প্রগাঢ় উপস্থিতি। কিয়ের্কেগার্দের কিছু কিছু বিশিষ্ট বাচন পরবর্তী কালে তত্ত্বীজের মর্যাদা অর্জন করেছে। উদ্বেগ, আতঙ্ক, নেতি- পরিসরের মতো প্রবহমান বর্তমান সম্পর্কে তাঁর শ্লেষ-তিক্ত উচ্চারণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। জন-পরিসরকে তিনি 'দানবিক নেতি' বলেছেন ; সেই সূত্রে সর্বজনীন বাচনের স্বভাবও তাঁর কাছে দানবিক নেতিতে গ্রথিত। আধুনিকতার ভাববর্গ হিসেবে তিনি যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, সেইসব তাঁর নান্দনিক অবস্থানেরও ইঙ্গিতবাহী: বাচালতা, প্রকরণহীনতা, অগভীরতা, (প্রগল্ভতা বা প্রতীয়মানতা) তোষামুদি ও ছদ্ম-যৌক্তিকতা। পরবর্তী কালে হাইদেগার তাই আধুনিকতার বাচনিক বর্গ হিসেবে অলস কথকতা, দ্ব্যর্থবোধকতা, স্বতঃপতন ও সমর্প্যমানতার কথা লিখেছেন।

এতে সন্দেহ নেই যে কিয়ের্কেগার্দ যুগপৎ বহিঃপৃথিবীর নিরেট স্থূলতা ও অগভীর প্রতীয়মানতা এবং অন্তর্জগতের উদ্ভট অনন্বয় ও শৃঙ্খলাবিহীন গ্রন্থনায় উৎকণ্ঠিত ও পীড়িত বোধ করেছিলেন। তাঁর জীবন-দর্শন ও নান্দনিক বোধের সঞ্চালক পরাপাঠ হলো মানুষের সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থানই নিশ্চিত কোনও সিদ্ধান্তে নিয়ে যেতে পারে না, নতুন নতুন জিজ্ঞাসার উত্থাপন করতে পারে মাত্র। প্রখ্যাত অস্তিত্ববাদী লেখক ও দার্শনিক আলবেয়ার কাম্যু তাঁর 'Myth of Sisyphus' বইতে কিয়ের্কেগার্দের সত্তা-নিঙড়ানো যন্ত্রণার নান্দনিক নির্যাসকে এভাবে প্রতিপ্রশ্নের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন : 'If man did not have eternal spirit, if, at the bottom of things, there were nothing but a wild and tempestuous power producing everything, the great as well as the mean in the whirlwind of obscure passions, if the bottomless emptiness which nothing can fill were hidden beneath everything, what would life be, if not despair?' (১৯৬২ : ৬১)

সাত

এই জিজ্ঞাসাপুঞ্জের মুখোমুখি হয়ে বুঝি, কিয়ের্কেগার্দের অস্তিত্ব-পরিসর আর নন্দন অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। হেগেলের মতো তিনি কোনো নন্দনতত্ত্ব মূলক বই লেখেন নি; তবু কবি ও কথাকারদের ঈপ্সিত ভূমিকা তাঁর বয়ান থেকে অর্জিত উপলব্ধিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সঙ্গীত-নাটক-ছবির জগৎও তাঁর নান্দনিক প্রতীতির যুক্তিশৃঙ্খলায় নতুন তাৎপর্যে

অন্বিত হতে পারে। আসলে অস্তিত্বকে বুঝি যখন, নন্দনকেও বুঝে নিই, কবিতা বা উপন্যাস বা নাটক বা সঙ্গীত না হয়েও জীবন নান্দনিক মাত্রায় পরিশীলিত, পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্নবীকৃত হতে পারে। জীবনের যথাপ্রাপ্ত অনন্বয় ও পরস্পর-বিরোধিতা তাতে নিরাকৃত না হোক, গভীরতর ও ব্যাপকতর নান্দনিক প্রতিবেদনের মধ্যে সমস্ত তাৎপর্যবহ হয়ে উঠতে পারে। তাতে নান্দনিক অভিব্যক্তিগুলি বাস্তবের যত কাছাকাছি যাক, এর বিকল্প হতে পারে না কখনও। এই যে ব্যবধান বা স্বাতন্ত্র্যের বোধ, তা অস্তিত্বকে আরও শানিত ও নির্বিকল্প করে তোলে। হেগেল কবির চেতনাকে তাই মূলত অসুখী চেতনা (unhappy consciousness) বলে উল্লেখ করেছিলেন। আর, কিয়ের্কেগার্দও তাঁর দিনলিপিতে এই ধারণাকে সমর্থন জানিয়েছেন। গ্যয়ঠের 'হ্বিলহেলম্ মাইস্টের' এর মধ্যে তিনি নৈতিক জগৎ-শৃঙ্খলা ও সমগ্র রচনায় ব্যাপ্ত সুসমঞ্জস সঞ্চালক নির্দেশের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। ঐ উপন্যাসের নায়ক-সত্তায় কেন্দ্রীয় বোধ এমনভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে 'truly the whole world seen in a mirror, a true microcosm' (জার্নাল : ১৪৫৫)।

প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতির গভীরে প্রচ্ছন্ন থাকে স্রষ্টা ও গ্রহীতার বিশিষ্ট সংযোগ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা। অসংখ্য অংশের সমবায়ী উপস্থিতির মধ্যে ঐক্যবোধের জেগে ওঠায় শুধু বৌদ্ধিক সামর্থ্য প্রমাণিত হয় না, নান্দনিক পর্যবেক্ষণের আনন্দও ব্যক্ত হয়। কিয়ের্কেগার্দ জানেন, অধিকাংশ মানুষ এই সামর্থ্য ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত। স্রষ্টা ও গ্রহীতার সংযোগে কোনো ভাবকল্প যখন নান্দনিক মাত্রা অর্জন করে, জীবনের বয়ান কাব্যিক ভাবে উর্ধ্বায়িত হয়। যেন 'a refreshing, renewing bath' (তদেব : ৫২৮৭) এর মধ্য দিয়ে জীবনের অসামঞ্জস্য ও পরস্পর-বিরোধিতার পরিসর অন্বিত হয়ে যায়। তাহলে, এর মানে কি এই যে, প্রকৃত অস্তিত্বের কঠোর ও অপ্রীতিকর বাস্তব থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্যেই নান্দনিক প্রক্রিয়া ? আদর্শায়িত কাব্যিক সমগ্রতা অর্জনের জন্যে কি জীবনে অর্জিত সমগ্রতাকে অবচেতন ভাবে বিসর্জন দেবেন কবি ? ব্যক্তি-সত্তার গভীরে কাব্যিক জীবন ও নান্দনিক সৃষ্টি জেগে ওঠে যন্ত্রণার সূত্রে। আবার কিয়ের্কেগার্দ একথাও বলেছেন যে নান্দনিক প্রকরণেব জন্যে মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ বিপদের সংকেত হিসেবে গণ্য। কেননা এর পরিণাম হলো 'the evaporation of the person, in which the authentic conscious existence is surrendered and everything is poetry.' (তদেব : ৩৮৯০)। তার মানে, বৈধ সচেতন অস্তিত্বকে আরো বিকশিত করার জন্যে নন্দন। আদর্শ চিন্তাপরিসর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের মাঝখানে রয়েছে শিল্পকর্ম। এই হেগেলীয় দৃষ্টিকোণ মেনে নিয়েও কিয়ের্কেগার্দ আত্মপ্রতিফলন ও স্বাধীনতার ভাবকল্পের সঙ্গে নান্দনিক প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য আন্তঃসম্পর্ক

নিয়ে ভেবেছেন। শিল্পজগৎ তাঁর মতে যৌক্তিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই নিরিখে প্রকরণ ও অন্তর্বস্তুর চিরাচরিত সম্পর্ক নিয়েও তাঁর নিজস্ব ধরনে মৌলিক মন্তব্য করেছেন তিনি। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক আলোচকেরা নন্দনতাত্ত্বিক জে. এল. হাইবের্গের সঙ্গে কিয়ের্কেগার্দের নিবিড় সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করেছেন।

কমেডি নিয়ে ভেবেছেন তিনি। ভেবেছেন ট্র্যাজেডি নিয়েও। বিশেষত ট্র্যাজেডির নন্দন ও অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবনায় দর্শন ও কাব্যিকতার প্রথাগত সীমারেখা মুছে গেছে। কাম্যু, সার্ত্র, ইবসেন, কাফকা ও টমাস মানের লিখনবিশ্বে কিয়ের্কেগার্দের ভাববিশ্বের দীর্ঘায়িত ছায়ার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন কেউ কেউ। সত্য ও সত্যভ্রমের বহুমাত্রিক আততি থেকে নিষ্পন্ন বয়ানগুলিতে অজস্র প্রবেশবিন্দু ও নির্গমবিন্দু রয়েছে বলে গ্রহীতা-পাঠকের পক্ষে অবস্থান নিশ্চিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে নান্দনিক জিজ্ঞাসার পক্ষেও আবশ্যিক অস্তিত্বের উচ্চতর প্রক রণ: এই হলো কিয়ের্কেগার্দের প্রত্যয়। 'Either/or' এর প্রগাঢ় কাব্যিক উচ্চারণ এরকম : 'Then the spirit masses within him, like a dark cloud, its wrath broods over his soul, and it becomes an anxiety that does not cease even in the moment of enjoyment!' এমন মণিমুক্তো এই প্রতিবেদনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বস্তুত এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ নিয়ে স্বতন্ত্র বয়ান তৈরি হতে পারে।

আর, তাই, সোরেন কিয়ের্কেগার্দ প্রতিমুহূর্তে নবায়িত এক অফুরন্ত নির্ঝরের নাম। পাঠক হিসেবে আমাদের এখন বারবার নতুন করে জেনে নিতে হবে, কীভাবে পড়ব তাঁর বয়ান! কীভাবে যাব পাঠ থেকে পাঠান্তরে, অর্থ থেকে অর্থান্তরে।

ভাষাচিন্তার নানা দিগন্ত ঃ সোস্যুর থেকে দেরিদা

সাহিত্য যে সংযোগ তৈরি করার একটি বিশিষ্ট ধরন, এ সম্পর্কে দ্বিমত নেই। আর, সংযোগ সম্পর্কে যত তত্ত্বকথাই বলি, তা আদ্যন্ত প্রয়োগকুশলতার ওপর নির্ভরশীল। সাহিত্যের সাফল্য ও ব্যর্থতা আসলে প্রয়োগের লক্ষ্যভেদী হওয়া বা না হওয়া। না লিখলেও চলে, এই প্রয়োগ পুরোপুরি ভাষার, বাচনের, প্রতিবেদনের। তাই ভাষাভাবনা ও সাহিত্যভাবনা অন্যোন্য- সম্পৃক্ত। না, আসলে বলা উচিত, অবিচ্ছেদ্য। সাহিত্যতাত্ত্বিকদের কাছে ভাষাভাবুকের গুরুত্ব এইজন্যে অপরিসীম। বিভিন্ন পর্যায়ে সাহিত্যতত্ত্বের যাত্রাপথ বদলে দিয়েছে ভাষাচিন্তা; নতুন দিশা দিয়েছে কখনও আর কখনও পুরোনো অন্বিষ্ট পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বিশ শতকে সাহিত্যিক প্রয়োগে যত বড়ো মাপের পরিবর্তন হয়েছে, তাদের সঙ্গে লক্ষণীয় ভাবে রূপান্তরিত হয়েছে ভাষাভাবুকতার ধরন। এমনকী, উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই দেখা গেছে, ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যচিন্তা যুগলবন্দি প্রবাহের মতো ক্রমশ ঋদ্ধতর হয়ে উঠেছে। একে অপরকে যোগান দিচ্ছে নতুন-নতুন তত্ত্ববীজ, অভিব্যক্তির নতুন পরিসর, নতুন ভাষ্যের সম্ভাবনা, প্রয়োগের নতুন কর্ষণভূমি। বিশ শতকের আগে চিন্তাবিদেরা অবশ্য ভাষার যুগবাহিত পরিবর্তনের কারণ ও পদ্ধতি অনুশীলনে বেশি আগ্রহী ছিলেন। আর, বিশ শতকের সূচনাপর্ব থেকে দেখা গেল, ভাষার সংযোগ-আভিমুখ্য ও প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অভিনিবেশ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ক্রমশ। সেই সূত্রে অবধারিত হয়ে উঠল সাহিত্যতত্ত্বের আশ্চর্য দিগন্ত-বিস্তার। ভাষাচিন্তা ও সাহিত্যচিন্তার এই নতুন যুগলবন্দির স্থপতি হচ্ছেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের বরেণ্য অধ্যাপক ফার্ডিনান্দ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭ - ১৯১৩)।

১৯০৬ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যেসব অল্পসংখ্যক ছাত্র জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে সোস্যুরের কাছে পাঠ নিচ্ছিলেন, তাঁরা ভাবতেও পারেননি যে তাঁদের উপলক্ষ করে চিন্তা-পরিসরে নতুন ইতিহাস রচিত হচ্ছে। বিশ শতকের বৌদ্ধিক আন্দোলনগুলির মধ্যে সবচেয়ে সৃজনী সম্ভাবনাময় ভাবপ্রস্থানের অন্যতম ধারার জন্মপ্রক্রিয়ায় তাঁরা যে শরিক, তা বুঝতে আরও কয়েক বছর লেগেছিল। ১৯১৩ সালে সোস্যুরের দেহাবসানের পরে ঐ ছাত্রদের তৈরি অনুশীলনী খসড়া বা তাঁর বক্তৃতার অনুলিপি থেকে 'Course in General Linguistics' নামক যুগান্তকারী বইটি প্রকাশ করা হলো (১৯১৬)। শুরু হলো ভাষাবিজ্ঞানের প্রণালীবদ্ধ যাত্রা। এর প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী, তা অনুভব করার জন্যে অবশ্য চার দশকেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে। ফ্রান্সে আকরণবাদ (Structuralism) উদ্ভূত হলো সোস্যুরের চিন্তাবিশ্ব থেকে আহৃত উপাদান পুনর্বিন্যস্ত

করে। আর, ক্রমশ আকরণোত্তরবাদ-বিনির্মাণবাদ চিহ্নবিজ্ঞানের মধ্যে অব্যাহত রইল তার বিচিত্র পুনর্নির্মাণ। আসলে সোস্যুরের ভাষাচিন্তার পাঁজর থেকে জন্ম নিয়েছে সাহিত্যতত্ত্বের নতুন-নতুন আকল্প। বস্তুত নৃতত্ত্ব, মনোবিকলন, সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যার বিচিত্র ক্ষেত্রে সোস্যুরের ভাষাতাত্ত্বিক ভাবনার বিপুল প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা যেতে পারে। প্রাগুক্ত বইটি যেহেতু মরণোত্তর প্রকাশনা, সোস্যুরের চূড়ান্ত অভিমত হিসেবে এর প্রতিবেদনকে গ্রহণ করা যায় না। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রচলিত অর্থে যাকে লেখকসত্তা বলি, এই বইতে তার অনুপস্থিতি অত্যন্ত লক্ষণীয়। আসলে ঐ বইয়ের লেখক-অভিধা সমবায়ী উপস্থিতির ফসল। কেননা শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করার মধ্য দিয়ে সোস্যুরের যেসব মৌখিক প্রতিবেদন গড়ে উঠেছিল, তাদের অনুলিপিতেও সোস্যুর নিশ্চয় উপস্থিত। আবার তাঁর ছাত্রদের শ্রুতিলিখন যেহেতু বইয়ের প্রধান ভিত্তি, তাদের নিজস্ব গ্রহ-ক্ষমতাও বয়ানের মধ্যে নিশ্চয় সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। আর সবার উপরে রয়েছে দু-জন সম্পাদক (চার্লস বেলি ও এলবার্ট সেচেহারে) দ্বারা পুনর্লিখিত ও পুনর্বিন্যস্ত বয়ানের প্রসঙ্গও। সম্পাদকদের ভূমিকা থেকে জেনেছি যে ছাত্রদের খসড়া থেকে বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে গিয়ে তাঁদের নজরে পড়েছে, সোস্যুরের বক্তব্য কখনও কখনও 'faint, sometimes conflicting,hints' মাত্র। সম্পাদকেরা পুনর্লিখনে হয়তো নিজস্ব ভাষ্যও যোগ করেছিলেন যাতে বয়ান স্বচ্ছ, সুখপাঠ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। সুতরাং সোস্যুর নামের আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে বহুবাচনিক লেখকসত্তা, এমন বলা যেতে পারে। ভাষাচিন্তার আবহকে যে-বইটি সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা দিয়ে বহুমুখী করে তুলেছে, তার মর্মমূলে অনতি-প্রচ্ছন্ন বহুবাচনিকতা অবশ্যই সংকেত-গর্ভ। সাহিত্যতত্ত্ব সহ মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রকে যিনি চিহ্নায়ন প্রকরণের আধেয় করে তুলেছেন, তিনি এক নন, অনেক—এই উপলব্ধি সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। তবু আমরা সোস্যুরকে গ্রহণ করব অনেকান্তিক একক সত্তা হিসেবেই।

সোস্যুরের প্রতিবেদনে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অন্বিষ্ট হলো ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নের যথার্থ লক্ষ্যকে সংজ্ঞায়িত করা। এ বিষয়ে ভাষাবিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য আলাদাভাবে চোখে পড়ার মতো। অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিশ্লেষিতব্য বিষয় পূর্বনির্ধারিত; নানা দৃষ্টিকোণ থেকে তা আলোচিত হতে পারে। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এমন হয় না যেহেতু তাতে বিষয় থেকে দৃষ্টিকোণে যাওয়া চলে না। বরং দৃষ্টিকোণই বিষয়কে সৃষ্টি করে। সুতরাং সোস্যুর কী ধরনের চিন্তা-প্রকল্প তৈরি করতে চেয়েছেন, তা অনুধাবন করাটা জরুরি । যুক্তিনিষ্ঠ স্বচ্ছ বিজ্ঞানসম্মত অন্বিষ্ট তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন কিনা, সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন প্রয়োজন। সোস্যুর 'Language', 'Langue'ও 'Parole' — এই তিনটি প্রধান পারিভাষিক বর্গের কথা জানিয়েছেন, যাদের যথাক্রমে ভাষা, সামূহিক বাচন ও একক বাচন বলে গ্রহণ করতে পারি। স্পষ্টতই ভাষা হলো বৃহত্তম বর্গ কারণ বাচনের ব্যাপারে মানুষের দৈহিক ও মানসিক, এক কথায়, সমগ্র সম্ভাবনা এতে অন্তর্ভুক্ত। ফলে তা এতটা সাধারণীকৃত ও সংজ্ঞাতীত যে প্রণালীবদ্ধ ভাবে এর অধ্যয়ন করা শক্ত। প্রতিতুলনায় সামূহিক বাচনকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সূত্রে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। প্রতিবেদনের জন্ম দেওয়ার জন্যে অন্যদের কাছে বোধগম্য যে-ভাষাপদ্ধতি আমরা সাধারণভাবে ব্যবহার করে থাকি, তা-ই হলো সামূহিক বাচন। আর, আমাদের ব্যক্তিগত উচ্চারণ হলো একক বাচন। তাহলে 'ভাষা' হলো ভাষিক সম্ভাবনা, 'সামূহিক বাচন' হলো নির্দিষ্ট ভাষাগত পদ্ধতি এবং 'একক বাচন' হলো ব্যক্তির উচ্চারণ। সোস্যুরের মতে ভাষাগত অধ্যয়নের কেন্দ্রে রয়েছে ভাষা-পদ্ধতি। ভাষা-ব্যবহারকারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে ঐ পদ্ধতি। একক বাচন থেকে সামূহিক বাচনে যখন পৌঁছাই, ভাষা-প্রকরণ সম্পর্কিত ধারণা বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গড়ে ওঠে।

পদ্ধতি সম্পর্কিত বোধ সংযোগের পক্ষে আবশ্যিক। কেননা বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে কার্যকরী সেতু অর্থবোধের সাধারণ ভিত্তি ছাড়া গড়ে ওঠা অসম্ভব। সাহিত্য-অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এই চিন্তাসূত্রটি খুব মূল্যবান! যেহেতু কোনও সাহিত্যিক উচ্চারণ বা পাঠকৃতি তাৎপর্যবহ হতে পারে না যদি লেখক ও পাঠকের মনে সাহিত্য-পদ্ধতির উপলব্ধি না থাকে। রোমান য়্যাকবসন যখন সাহিত্যিকতাকে সাহিত্য অধ্যয়নের প্রকৃত অন্বিষ্ট বলেন কিংবা নথ্রপ ফ্রাই সাহিত্যকে শাব্দিক শৃঙ্খলা হিসেবে পাঠ করতে বলেন—সোস্যুরের চিন্তাসূত্রই আমরা প্রসারিত হতে দেখি। ভাষা-পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার পরে সোস্যুর ঐ পদ্ধতিকে বিকশিত করার উপযোগী চিন্তাবীজগুলি উপস্থাপিত করেছেন। ভাষিক আকরণের মৌলিক উপাদান হিসেবে তিনি বলেছেন চিহ্নের কথা। অবশ্যই 'চিহ্ন' পুনঃসংজ্ঞায়িত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন, চিহ্ন নিছক কোনো বস্তু-নাম নয়, একটি জটিল সমগ্রতার আশ্রয়ে তা কোনো ধ্বনিপ্রতিমাকে ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করে। আমরা যখন কাউকে কথা বলতে শুনি, তখনই শুধু ধ্বনিপ্রতিমার প্রতীতি হয় — তা কিন্তু নয়। যখন পড়ি কিংবা চিন্তা করি, ভাষার বাইরে তো যেতে পারি না, তাই একই প্রতীতিতে পৌঁছাই। চিহ্নের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যকে সোস্যুর চিহ্নায়ক (Signifer) ও চিহ্নায়িত (Signifed) বলে উল্লেখ করেছেন। চিহ্ন কি নিজেই নিজের নিয়ন্তা অথবা তা অন্য কিছু দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়— এই বিতর্কে আপাতত যাচ্ছি না। বরং সোস্যুর তাঁর বইতে যেসব প্রাসঙ্গিক মন্তব্য

করেছেন, তার গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে উদ্ধৃত করছি : ' Language is a system of signs that express ideas, and is therefore comparable to a system of writing, the alphabet of deaf-mutes, symbolic rites, polite formulas, military signals etc. But it is the most important of all these systems.

A science that studies the life of signs within society is conceivable ;it would be a part of social psychology and consequently of general psychology ; I shall call it semiology (from Greek Semeion, sign)', (Course in General Linguistics : 16)

দুই

সমাজে চিহ্নের নিজস্ব জীবন কীভাবে নির্ধারিত ও বিকশিত হয়, তা জানাটা খুব জরুরি। সোস্যুরের কাছে ভাষাচিন্তা মূলত চিহ্নভাবনা। তাঁর সময়ে চিহ্নবিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, ভবিষ্যতে তা কোন পথ ধরে চলবে —তা তখন কেউ বলতে পারত না। কিন্তু তিনি অন্তত এইটুকু বুঝে নিয়েছিলেন যে চিহ্নতত্ত্ব হলো বাচন-বিজ্ঞানীর প্রধান ধারা, ভাষাবিজ্ঞান তার উপধারা মাত্র। চিহ্নতাত্ত্বিক অধ্যয়নে যে বিধিনিয়মগুলি আবিষ্কৃত হয়, ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ করা সম্ভব। আবার আকরণবাদী চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নতত্ত্বের ক্রমবিকাশও অনিবার্য ছিল। ক্লদ লেভি-স্ট্রাউস ও রোলাঁ বার্ত দেখিয়েছেন, মানবিক সংযোগের ক্ষেত্রে ভাষা রয়েছে কেন্দ্রীয় অবস্থানে। তাৎপর্য অর্জনের যত পদ্ধতির কথা ভাবি না কেন, ভাষার সাহায্য ছাড়া কোনও কিছুই সক্রিয় হতে পারে না। সোস্যুর চিহ্নের স্বভাব সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : 'The signifier, being auditory, is unfolded in time ... it is a line.'। অর্থাৎ চিহ্নায়ক সময়ে সম্পৃক্ত, তার প্রকাশ সময়ের বাইরে নয়, আর, প্রতিটি চিহ্ন রৈখিক। স্বভাবত প্রতিটি উচ্চারণও রৈখিক। ছবিতে যেমন বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্যবহ উপকরণ সমান্তরালভাবে ব্যক্ত হতে পারে, বাচনিক উচ্চারণের উপকরণ তেমন ভাবে হয় না। নির্দিষ্ট শৃঙ্খলার বিন্যাসে তার অভিব্যক্তি হয় বলে বিন্যাসের ওপর তাৎপর্য নির্ভর করে। বাক্যে গ্রথিত চিহ্ন প্রতিবেদনের একক বলে তা মূলত আখ্যানের ভিত্তি। এইজন্যে সাহিত্যিক পাঠকৃতির নিবিড় পাঠে চিহ্নায়িত ভাষার এই বিশেষ ধরনটি অভিনিবেশ দাবি করে।

সোস্যুর ভেবেছেন, চিহ্নের মধ্যে রয়েছে এক ধরনের খামখেয়ালি প্রবণতা। অর্থাৎ কোনও বিশেষ চিহ্নের সঙ্গে বিশেষ অর্থের অন্যোন্যনির্ভর সম্পর্ক আমরা প্রত্যাশা করি। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এই ধারণার সমর্থন সর্বদা পাওয়া যায় না। কোনও কোনও চিহ্নের একাধিক অর্থ খুঁজে পাই, সেইসব অর্থের সঙ্গে চিহ্নের সম্পর্ক সর্বদা সঙ্গতিপূর্ণ বা যুক্তিগ্রাহ্য নাও হতে পারে। অবশ্য উদ্দিষ্ট অর্থের সঙ্গে চিহ্নের

সাধারণভাবে একটা প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থেকেই যায়। এই নির্ভরতা অনস্বীকার্য বলে মনে হলেও আসলে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য নয়— এই হলো সোস্যুরের অভিমত। তিনি দেখিয়েছেন, ধারণার প্রতীতি প্রায়ই দ্বৈততায় আধারিত হয়ে থাকে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িত অথবা প্রতীক ও তাৎপর্যের বিষয়ে ঐ দ্বৈততা খুব প্রাসঙ্গিক, বাচনিক এককগুলির বর্গ-বিভাজন যেহেতু প্রয়োজনীয় দ্বৈততার অনুভব ছাড়া অসম্ভব। বাচনিক এককগুলির রূপগত ও বিন্যাসগত সম্বন্ধের মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে, তার অনুধাবন অত্যন্ত জরুরি। এছাড়া সোস্যুর অধুনা-অধ্যয়ন ও কালগত অধ্যয়নের মধ্যে দ্বৈততার কথাও বিশেষভাবে বলেছেন। এই সব কিছুর সম্মিলিত প্রভাবে ভাষাবিজ্ঞান সহ মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় বিপুল পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। সোস্যুর যেভাবে অধুনা- অধ্যয়ন ও কালগত অধ্যয়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভাষা-অনুশীলনের দুটি প্রধান ধারা ও তাদের মৌল পার্থক্যের কথা বলেছেন— তারই আলোকে পরবর্তী চিন্তাবিদেরা ভাষা-ভাবনাকে আরও পরিশীলিত করেছেন। সোস্যুর অবশ্য কালগত অধ্যয়নের তুলনায় অধুনা-অধ্যয়নের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই তার প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

সোস্যুরীয় ভাষাতত্ত্বে প্রতিটি ভাষাই তার ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পর্যাপ্ত। এই চিন্তাপ্রস্থানে ভাষায় কোনও প্রগতি নেই, আছে কেবল পরিবর্তন। ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যয়নের উপযোগিতা ভাষার ইতিহাসে নেই, আছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যথাপ্রাপ্ত ভাষাপদ্ধতিতে ব্যক্ত চিহ্নের সম্পর্ক কিংবা বিরোধিতার যুক্তি-শৃঙ্খলায়। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মার্ক্সবাদী ভাবনা একমত হতে পারেনি। ফলে এ বিষয়ে চুলচেরা বিতর্কের অভাব নেই। কিন্তু সেই বিতর্কে আমরা অংশ গ্রহণ করছি না। শুধু এই তথ্য লক্ষ করছি যে সোস্যুর-পরবর্তী বহু ভাষাতাত্ত্বিক ঐ যুক্তি-শৃঙ্খলাকে গভীরভাবে অনুশীলন করেছেন। এদের মধ্যে অগ্রগণ্য রোমান য়্যাকবসন ও ট্রুবেৎসকো। ভাষা-পদ্ধতি ও বাচনিক যুক্তিশৃঙ্খলার বিশিষ্ট বিশ্লেষণেই নিহিত ছিল আকরণবাদের তাত্ত্বিক বয়ান। এমিল বেনভেনিস্টের 'Problems in General Linguistics' নামক বইতে নিম্নোক্ত বক্তব্য ভাষাবিজ্ঞানের আকরণবাদী প্রবণতার নির্যাস তুলে ধরেছে : 'Granting that Language is a system, it is then a matter of analysing its structure. Each system, being formed of units that mutually affect one another, is distinguished from the other system by the internal arrangements of these units, an arrangement which constitutes its structure.... to envisage a language... as a system organised by a structure to be revealed and described is to adopt the structuralist point of view.' (১৯৭১ : ৮২)। অর্থাৎ মূল কথা হলো, ভাষা মূলত বিশেষ বিন্যাস এবং বিন্যাস মানেই আকরণ। এই তত্ত্বসূত্রই আকরণবাদী

নন্দন ও সেই নন্দন সঞ্চালিত সাহিত্যিক পাঠকৃতির মর্মসত্য। একটু আগে যে বাচনিক এককের রূপগত ও বিন্যাসগত সম্পর্কের দ্বৈততার কথা উল্লেখ করেছি, চিহ্নায়ন প্রকরণে কীভাবে তা অজস্রতায় ব্যক্ত হয় — এই বিশেষ অনুশীলনের প্রেরণাও পাওয়া গেছে সোস্যুরের কাছে।

বিভিন্ন চিহ্নের রূপগত ও বিন্যাসগত সম্পর্কের পার্থক্য অনুধাবন করা জরুরি। কোনও একটি বিশেষ উচ্চারণে চিহ্নায়কের অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করে ভাষার রূপগত উপকরণ। অর্থাৎ কোনও যথাপ্রাপ্ত বাক্যে একক শব্দের তাৎপর্য অংশত নির্ভর করে সেই বাক্যে তার অবস্থান এবং অংশত অন্য সব শব্দ ও ব্যাকরণগত এককের সঙ্গে তার সম্পর্কের ওপর। শব্দের রূপগত বৈশিষ্ট্য স্বভাবে রৈখিক ও কালগত অধ্যয়নের অন্বিষ্ট। বাক্যের বিন্যাসগত ক্রম যদি বদলে যায়, শব্দের এই স্বভাব অপরিবর্তিত থাকে না। আবার কোনও বাক্যে একক শব্দের তাৎপর্য এমন কিছু শব্দ-সমবায়ের দ্বারাও নির্ধারিত হয়ে থাকে যেগুলি যথাপ্রাপ্ত বাক্যে নেই কিন্তু বিন্যাসগত সম্পর্কের সম্ভাবনায় উপস্থিত রয়েছে। এই সূত্রকে প্রসারিত করে বলা যেতে পারে, বাচনের তাৎপর্য যুগপৎ প্রকৃত ও সম্ভাব্য সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। ভাষাব্যবহারকারী হিসেবে আমরা যখন কোনও বাক্যে প্রয়োগের জন্যে কিছু কিছু শব্দ বেছে নিই, অতি দ্রুত আমাদের বিন্যাসগত সম্ভাবনার বিষয়টি ভেবে নিতে হয়। আমাদের অন্বিষ্ট পদান্বয়ের নির্মাণে যেসব শব্দ যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে, এ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সময় আমরা ভাষা-পদ্ধতিতে শব্দের সম্পর্ক নির্ণয় করি মূলত অধুনা-অধ্যয়নের ভিত্তিতে।

তিন

রোমান য়্যাকবসন ভাষাভিত্তিক চিন্তাকে সাহিত্যিক বিশ্লেষণে সম্পৃক্ত করে নিয়ে সোস্যুরীয় ভাষাচিন্তাকে প্রবহমান ধারায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তাঁর কাছে ভাষা মূলত অনুষ্ঠিতব্য সক্রিয়তা। তবে এতে রয়েছে নানা ধরনের মেরু-বিভাজন। পরবর্তী কালে ক্রমশ যখন আকরণবাদী নন্দন গড়ে উঠল, দেখা গেল, এই প্রতীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোস্যুর যাকে চিহ্নের রূপগত ও বিন্যাসগত সম্পর্কের কথা বলেছেন, য়্যাকবসন কথিত ভাষিক সক্রিয়তার দুটি মেরু তারই সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ সোস্যুরের যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক পরিভাষাকে য়্যাকবসন তথ্যগত সমর্থন যোগান দিয়েছেন। অবশ্য সেখানেই থেমে থাকেননি তিনি, ভাষাগত বিধি- শৃঙ্খলার সমান্তরাল ভাবে তিনি আবিষ্কার করেছেন দু ধ'রনের প্রতিন্যাসও, এদের মধ্যে একটি সাদৃশ্যসূচক এবং অন্যটি সংলগ্নতাসূচক। তাত্ত্বিক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত এই দুটি ভাববীজ পরম্পরাগত তাৎপর্য-বিশিষ্ট প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে। সাদৃশ্যবোধের ঘনীভূত প্রকাশ লক্ষ করি রূপকে যাতে আক্ষরিক শব্দের

বদলে অলঙ্কৃত শব্দ গভীর দ্যোতনাবহ বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিকল্পায়নের প্রেরণা হিসেবে নিবিড় সাদৃশ্যবোধ সক্রিয় থাকে। আবার কোথাও তার বদলে প্রবল হয়ে ওঠে অনুষঙ্গগত সংলগ্নতা। য়্যাকবসন ভাষার ব্যক্তিগত অভিব্যক্তিতেই শুধু এই দুটি প্রক্রিয়া লক্ষ করেন না, সামূহিক প্রতিবেদনের বৃহত্তর প্রকল্পের মধ্যেও এদের উপস্থিতি খুঁজে পান। সাহিত্যিক পাঠকৃতির বিশ্লেষণে এই দুটি তত্ত্ববীজ চিন্তা-প্রক্রিয়ার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। সাহিত্যশৈলীর ভিন্নতা প্রকৃতপক্ষে এদের কার্যকরী পার্থক্যের সূত্রে নির্ধারিত হয়ে থাকে। য়্যাকবসন তাঁর 'Fundamentals of Language' বইতে রোমান্টিকতাবাদ, প্রতীকবাদ ও বাস্তবতাবাদের সূত্রে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন (দ্রষ্টব্য ১৯৫৬ : ৯১-৯২)। তাঁর মতে সমস্ত মানবিক প্রয়াসের মধ্যে এই দুটি তত্ত্ববীজের মৌলিক দ্বৈততা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এদের পরিণতিও সুদূরপ্রসারী।

য়্যাকবসনের মতে এই দুটি তত্ত্ববীজ সংশ্লিষ্ট বাচনিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সর্বদা প্রতিযোগিতা চলেছে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তরে অভিব্যক্ত প্রতীকী প্রক্রিয়ার মধ্যে এই প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন তিনি। সাদৃশ্য ও সংলগ্নতার উপলব্ধি কত বিচিত্রভাবে মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন প্রেক্ষিতে লক্ষ করা যায়, তা তিনি দেখিয়েছেন। এদের মধ্যে প্রথমটির ধারণা তুলনামূলক ভাবে সহজবোধ্য। এর প্রাধান্য দেখা যায় কবিতায়, অন্যদিকে সংলগ্নতার সহজ আধার হলো গদ্য — 'for poetry.metaphor. and for prose, metonymy is the line of least resistance and consquently. the study of poetical tropes is directed chiefly toward metaphor' (তদেব : ৯৬)।

যেহেতু এই দুটি তত্ত্ববীজই স্বতন্ত্র পরিসরে দীপ্যমান, য়্যাকবসন পরিকল্পিত নান্দনিক চিন্তায় গদ্য ও পদ্যের গুরুত্ব সমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এখানে অবশ্য একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। এই যে প্রায়োগিক দ্বৈততার কথা বলা হলো, তা সাধারণ সত্য হলেও সব ক্ষেত্রে সমান মাননীয় নয়। কেননা আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু প্রতিবেদন রয়েছে যাদের ক্ষেত্রে এই জলবিভাজন রেখা মোটেই প্রযোজ্য নয়। বিশেষত যেখানে পরাবাস্তব ও অবচেতনার প্রসঙ্গ রয়েছে, তাতে বাচনিক কৃৎকৌশলের ঐ পার্থক্য বারবার অস্বীকৃত হয়ে থাকে। ভাষার বিশিষ্ট প্রয়োগে যেসব সন্দর্ভ আলাদাভাবে লক্ষ্যণীয়, তাদের মধ্যেও রয়েছে বিচিত্র উচ্চাবচতা। বিশেষত কবিতার ভাষা প্রায়োগিক বিশিষ্টতার নিষ্কর্ষকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করে। চিহ্নায়ন প্রকরণের অনন্যতা অনবরত ভাষার প্রায়োগিক সীমাকে ধ্বস্ত করতে থাকে। বস্তুত কোথায় যে তার শেষ, তার ধারণা করাও অসম্ভব। ভাষার কাব্যিক ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য সমস্ত ক্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে য়্যাকবসন গভীরভাবে

ভেবেছেন। বাচনকে তিনি বলেছেন 'ঘটনা' (event)। সংযোগ গড়ে তোলাই তার প্রধান লক্ষ্য।

যে-ধরনের বাচনিক ঘটনাই হোক না কেন, এতে সর্বদাই আমরা সম্বোধক বা প্রেরকের দ্বারা সম্বোধিত বা প্রাপকের কাছে পাঠানো কোনো-না-কোনো বার্তা খুঁজে পাই। সংযোগ মানে হলো বার্তা পৌঁছে দিতে সফল হওয়া। সাফল্যের প্রসঙ্গ যেহেতু আসছে, লক্ষ করি, তা বাচনিক ঘটনার আরও তিনটে বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, বার্তাকে কোনো-একটি সংযোজক সূত্রের মধ্য দিয়ে পাঠাতেই হবে, তা শরীরী হতে পারে অথবা মনস্তাত্ত্বিক কিংবা এই দুটোই। দ্বিতীয়ত, বার্তাটি কোনো-না-কোনো সংকেতের সংরূপকে আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করবে । তৃতীয়ত, তাকে কোনো-একটি প্রেক্ষিতে সম্পৃক্ত হতে হবে। যতক্ষণ প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত না হচ্ছে, বার্তার তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না। আবার ঐ প্রেক্ষিতে পৌঁছাতে পারি শুধু সংকেতের নিষ্কর্ষ বোঝার পরে, তার আগে নয়। তেমনি উচ্চারণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলতে না পারলে সংকেত-গ্রাহক হয়েও কোনো লাভ হবে না। বার্তার অস্তিত্বই টের পাব না। সম্বোধক বা প্রেরক ও সম্বোধিত বা প্রাপক যখন সংযোগের মানবিক ক্রিয়ার সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে সেতু রচনা করে— বার্তার জন্ম হয়। এই সংযোগ বাচনের, বলা ভালো, বাচনিক প্রকরণেব; একটু আগে যাকে ঘটনা বলেছি, তার অন্য সব উপকরণের সম্মিলিত উপস্থিতিব ওপর প্রকরণ নির্ভরশীল।এছাড়া অর্থ বিজ্ঞাপিত করার পথ নেই। বলা হয়েছে, বার্তাই তাৎপর্য নয়। বাচনিক ঘটনার সামগ্রিকতা যখন শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়, তাৎপর্য ব্যক্ত হয় । এভাবে য়্যাকবসন বাচনিক ঘটনার ছ'টি উপাদান দিয়ে সংযোগের আকল্প তৈরি হওয়ার কথা বলেছেন: প্রেক্ষিত, বার্তা, সম্বোধক, সম্বোধিত, সংযোজক সূত্র ও সাংকেতিক সংরূপ।

সমস্ত বার্তা অভিন্ন প্রতীতি ও গুরুত্বের অধিকারী হয় না। উচ্চারণের স্বভাব ও আকরণ অনুযায়ী বাচনিক আকল্পের প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।অধিকাংশ বার্তা প্রসঙ্গ-নির্ভর, কিছু কিছু আবেগপ্রসূত বার্তা স্পষ্টত সম্বোধক-নির্ভর অর্থাৎ তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বার্তার চরিত্র নির্ধারিত হয়। আবার কিছু কিছু সম্বোধিতকে লক্ষ করে সংগঠিত হয়ে থাকে। এমনও কিছু বার্তা রয়েছে যাদের অন্বিষ্ট মূলত সংযোজক সূত্র। আবার পরাবাচনে সম্পৃক্ত বার্তা সংকেতকেই উদ্ভাসিত করে। য়্যাকবসন যখন ভাষার কাব্যিক ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন, তাতে বার্তার বিশিষ্ট ধরনে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয়। সাহিত্যিক রচনার ভাষা সম্পূর্ণভাবে কাব্যিক হয় না, য়্যাকবসন তা আমাদের মনে করিয়ে দেন। এ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বক্তব্য হলো : 'poetic function is not the sole function of verbal art but only its dominant, determining function, whereas in all other verbal activities it acts as a subsidary.

accessory constituent. This function by promoting the palpability of science, deepens the fundamental dichotomy of science and objects.' (১৯৬০ :৩৫৬)। সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে হয় চিহ্নায়ন প্রকরণের পরিসরে। বস্তু-বিশ্ব ও চিহ্ন-বিশ্বের মধ্যে দ্বৈততা ও সংলগ্নতার সমান্তরাল উপস্থিতি গভীরতর তাত্ত্বিক অনুধ্যানের বিষয় হয়ে ওঠে। য়্যাকবসন বার্তা-তাৎপর্য-বাচনিক প্রকরণ-সংযোগ ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন, তা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের পরম্পরাকে বাচনের মধ্যে কীভাবে গ্রহণ করব, এ-সম্পর্কে কোনও কোনও সমালোচক সংশয় প্রকাশ করেছেন ।

এইসব প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন অস্বাভাবিক কিছু নয়। আমাদের যা চোখে পড়ে, তা হলো, য়্যাকবসনের সংশ্লেষণী মনোভঙ্গি। ভাষাবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব ও চিহ্নবিজ্ঞানের পরিসরকে তিনি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত বলে গ্রহণ করেছিলেন। এদের পারস্পরিক উদ্ভাসনের সূত্রে ভাষাচিন্তায় যুক্ত করেছেন আশ্চর্য সূক্ষ্মতা। নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন দ্বিরালাপের মধ্য দিয়ে— এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ গ্রহীতা-সম্বোধিত তাঁর কাছে নিছক তাত্ত্বিক আকল্প নয়, অনুভব ও অভিজ্ঞতার যুগলবন্দিকে তিনি সরাসরি পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সম্ভাব্য পাঠকের কাছে। এই বিন্দুতে আমাদের মনে পড়ে বিশ শতকের অন্যতম অগ্রণী চিন্তাবিদ মিখায়েল বাখতিনের কথা। কেননা তাঁর ভাষাচিন্তার কেন্দ্রীয় প্রকল্পই হলো দ্বিবাচনিকতা। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু লেখার আগে লক্ষ করব, য়্যাকবসনের অনন্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নন্দনতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের দুরূহ সংযোগ গড়ে তোলার সামর্থ্যে। ১৯২৯ সালে তিনি যখন আকরণবাদ শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে ভাষাবিজ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলেন, ভাষাচিন্তার অজ্ঞাতপূর্ব সম্ভাবনা অবিষ্কৃত হওয়া শুরু হলো।

চার

ভাষা-চিন্তার আকরণবাদী বিপ্লব এত সুদূরপ্রসারী ও বহুস্তর-বিন্যস্ত যে একটি মাত্র ছোট প্রবন্ধে তার প্রতি সুবিচার করা অসম্ভব। সোস্যুর ও য়্যাকবসনের অবদানও বিশ্লেষণের স্বতন্ত্র পরিসর দাবি করে। বিশেষভাবে প্রাগ্ চিন্তা-প্রস্থান সম্পর্কেও আলোকপাত করতে হয়, কেননা এতে প্রকরণবাদ ও সোস্যুরীয় ভাষা-বিজ্ঞানের সংশ্লেষণে একক তাত্ত্বিক প্রকল্প তৈরি করে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে সাহিত্যতত্ত্বের প্রধান প্রতিবেদনগুলি পাওয়া গেছে সামূহিক অভিসন্দর্ভে যা ১৯২৯ সালে প্রাগে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনাচক্রের ফসল। এছাড়া ইয়ান মুকারোভস্কির রচনাও তাতে যথেষ্ট অবদান রেখেছে। সাহিত্য ও ভাষা-বিষয়ক গবেষণার মৌল আকল্পে 'আকরণ' এর মতো পরিভাষার কেন্দ্রীয় গুরুত্ব

রয়েছে। কবিতার বয়ানকে ক্রিয়াত্মক আকরণ হিসেবে গণ্য করা হয়, এর বিভিন্ন উপাদানকে কেবল সমগ্রের সঙ্গে সম্পর্ক-বিন্যাসে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, এই হলো তাদের বক্তব্য। আকরণ মানে বিভিন্ন সম্পর্কের সমগ্রতার বোধ কিংবা আকল্প। প্রকরণবাদীদের আঙ্গিক বা রচনাকৌশলের চেয়ে তা অনেক আলাদা ও উচ্চতর ধারণা। আমরা যখন সাহিত্যিক পাঠকৃতিকে বিশিষ্ট আকরণের বিন্যাস হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, তা আসলে বিভিন্ন সম্পর্কের জটিল প্রণালীর নিয়ামক চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের গ্রন্থনার প্রতি ইঙ্গিত করে। প্রকরণ সম্পর্কিত পরম্পরাগত ধারণা দিয়ে পাঠকৃতির সমগ্রতা-সন্ধানী এই সংগঠনকে বোঝানো যায় না। সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক আকরণের মধ্যে প্রচলিত ব্যবধানকে চিহ্নায়ন প্রকরণ সর্বদা মান্যতা দেয় না। য়্যাকবসন সংযোগের উদ্যমে নিহিত বার্তায় যে ছ'টি ভিন্ন ভিন্ন স্তর বা উপকরণ লক্ষ করেছেন, তাদের মধ্যে সম্বোধক বা সম্বোধিতের গুরুত্ব নিয়ে পরবর্তী তাত্ত্বিকেরা প্রচুর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। এ সম্পর্কে বিতর্কেরও অভাব নেই। কিন্তু সেই বিতর্কে যোগ না দিয়েও আমরা লক্ষ করতে পারি, কীভাবে পাঠকৃতির সমগ্রতা বিধানে চিহ্নায়ন প্রকরণের গ্রন্থনা সবসময়ই সামগ্রিক প্রেক্ষিতের উপর নির্ভরশীল। আমরা যখন সাহিত্যিকতা বা কাব্যিকতা নিয়ে কথা বলি, তাকে কোনও-না-কোনও ভাবে চিহ্নতাত্ত্বিক আকল্পের নিরিখে বিচার করতে হয়। কোনও বিশেষ সময়ে ও পরিসরে সমাজমনে চিহ্নের জন্ম হয়, মৃত্যুও হয়। কোনও চিহ্নই সমাজ-নিরপেক্ষ কিংবা চিরজীবী নয়। চিহ্নতাত্ত্বিক তথ্য যেহেতু রূপান্তর প্রবণ, শেষ পর্যন্ত বয়ানের তাৎপর্য পরিবর্তনশীল চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া ও আকরণের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। অতিপরিচিত তথ্যের বাস্তবকে আমরা যদিও অনুভূতি ও কল্পনায় ক্রমাগত অপরিচিত করে চলি, চিহ্নতত্ত্বের নিরিখে অনির্দেশ্যতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিদিন পরিচিত জগৎকে যেভাবে লক্ষ করি, সেই পর্যবেক্ষণের মধ্যেই যথাপ্রাপ্ত বাস্তব স্বতশ্চলভাবে কিছুটা পরিমাণে প্রতিবিম্বিত বাস্তব হয়ে পড়ে। প্রতিদিনই আমাদের ব্যবহৃত প্রথাগত চিহ্নায়ন প্রকরণ অনুযায়ী ঐ পর্যবেক্ষণ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া লক্ষ করেই ফ্রেডরিক জেমসন ভাষাকে ভেবেছিলেন বন্দীশালা। শিল্প বা সাহিত্য প্রথাগত চিহ্নায়ন প্রকরণে হস্তক্ষেপ করে আসলে ভাষার ঐ বন্দিশালাকে ভেঙে দিতে চায়। তখন কোনও যথাপ্রাপ্ত চিহ্নায়ককে আমরা নির্বিচার মান্যতা দিতে পারি না, আমাদের অভিনিবেশ সেইসব চিহ্নায়কের অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়।

মুকারোভস্কি এই প্রক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়ার সাহায্যেই শিল্প- সাহিত্য আমাদের 'Renewed awareness of the manifold and multivalent nature of reality' (১৯৬৪ : ৩৩) সম্পর্কে অবহিত করে। প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক প্রয়োগ থেকে কতটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে পাঠকৃতির নতুন

বয়ান, তার সাধারণ বিশ্লেষণে সন্তুষ্ট থাকেন না আকরণবাদী আলোচকেরা। বাচনের সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যেই আবিষ্কার করতে চান পাঠকৃতির নান্দনিক ও প্রায়োগিক অভিনবত্ব। পুর্বধার্য সীমানা ও প্রেক্ষণবিন্দু থেকে যতটা পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করতে পারেন আলোচক, ঠিক সেই অনুপাতে সমগ্রতার এবং বাচনিক আন্তঃসম্পর্কের তাৎপর্য পুনর্নির্ণীত হয়। বিষয়বস্তু সহ যে-সমস্ত অন্তর্বৃত অংশের নিরন্তর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে প্রাগ চিন্তা-প্রস্থানের প্রস্তাবিত সমগ্রতা, স্বভাবধর্মে তা ক্রিয়াত্মক৷ তাই এই নিরিখে সাহিত্যিক পাঠকৃতি কখনও নিষ্ক্রিয় কিছু উপকরণের সমাহার মাত্র হতে পারে না। মুকারোভস্কি এবং প্রাগ চিন্তা-প্রস্থানের বিভিন্ন বক্তব্যসূত্রে কাব্যিকতায় নিহিত বার্তা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে এই তত্ত্ব - 'By promoting the palpability of signs, deepens the fundamental dichotomy of signs and objects.' (Sebeok : 1971 : 356)। চিহ্ন ও বস্তুর মৌলিক দ্বৈততাকে গভীরতর করাই যেহেতু চিহ্নায়ন প্রকরণের অন্বিষ্ট, যথাপ্রাপ্ত বিধিবিন্যাসের সীমারেখা লঙ্ঘন করাই প্রতিটি নতুন পাঠকৃতির অভিপ্রায়। এই সীমাতিযায়ী প্রবণতা ছাড়া বাস্তবতাব পুনর্নবায়িত পর্যবেক্ষণ সম্ভব হত না এবং সেই সূত্রে নতুন বার্তাও নতুন চিহ্নতাত্ত্বিক তাৎপর্য নিয়ে উদ্ভূত হত না।

ষাটের দশকে আকরণবাদী ভাববিপ্লব যখন প্রাতিষ্ঠানিক চিন্তার বিন্যাসকে আমূল পালটে দিচ্ছিল, সংস্কৃতির প্রশ্নে ভাষাকেন্দ্রিক অনুধ্যান কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অর্জন করেছিল। শুধু তা-ই নয়, সূক্ষ্ম দ্যোতনার সঞ্চার ও তার যৌক্তিক সম্প্রসারণ সর্বতোভাবেই আগ্রহোদ্দীপক হয়ে উঠেছিল। মোটামুটি ১৯৬৭-৬৮ নাগাদ ভাষাচিন্তার আকরণবাদী পর্যায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছায়। পরম্পরাগত শৈক্ষিক অভ্যাসের সংযোজন হিসেবে নয়, বহুমাত্রিক বিকল্প হিসেবে দেখা দিয়েছিল নতুন উদ্ভাসন। অতিরিক্ত বিশ্লেষণ-পদ্ধতি হিসেবে এর গুরুত্ব নয়, যখন অন্য সব চিন্তাপদ্ধতি আস্তিত্বিক কিংবা জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে সমৃদ্ধ করে, নব্য চিন্তা-প্রকরণ হয়ে ওঠে সর্বত্রগামী। শিল্প-সাহিত্য-সমাজবিজ্ঞানের বিচিত্র বিদ্যায় এর তাৎপর্য পরিশীলিত হয়েছে বলে নিঃসন্দেহে এর বৈপ্লবিক সম্ভাবনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আপাত-দৃষ্টিতে যাদের সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের কোনও সম্পর্ক নেই, তাদের মধ্যেও যে আকরণবাদী ভাষা-চিন্তার বিচ্ছুরণ অনুভূত হয়, তা বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। আকরণবাদী সাহিত্যতত্ত্বে বাচন ও চিহ্নায়নের প্রেক্ষিত কীভাবে বহুস্বরিক দ্যোতনা নিয়ে এসেছে, তা আলোচনার জন্যে স্বতন্ত্র সন্দর্ভের প্রয়োজন। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা যাক যে সাহিত্যের সঙ্গে সমালোচনার ভাষা-নির্মাণেও ভাষা-চিন্তার অবদান খুব বেশি। পরবর্তী পর্যায়ে হয়তো সূচনাবিন্দু থেকে অনেক দূরে সরে গেছে তত্ত্ব-ভাবনা, তবু এই ভাবপরম্পরার অলক্ষ্য উপস্থিতি অনুভবগম্য। মানববিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় আকরণবাদী নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতিতত্ত্ব ও

চিহ্নতত্ত্ব ইদানীং যে বিচিত্র ফসলের সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে— এর উৎস নির্ণয়ে আমাদের ভুল হয় না। ঐতিহ্যাগত চিন্তা-প্রস্থানগুলির পারস্পরিক সীমান্ত অতিক্রম করার কিংবা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়ার যে-প্রবণতা ইদানীং দেখা যাচ্ছে, ভাষা-চিন্তার কেন্দ্রীয় আকল্প দিয়ে তাদের তাৎপর্য অনেকটা অনুধাবন করা সম্ভব।

পাঁচ

তথ্য থেকে সত্যে কিংবা পর্যবেক্ষণ থেকে তাত্ত্বিক উদ্ভাসনে পৌঁছানোর মুহূর্তে আমরা মনে রাখি যে সমস্ত পদ্ধতিই ভাষার মতো আকরণে বিন্যস্ত। অর্থাৎ সামগ্রিক পদ্ধতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে প্রতিটি উপাদানের তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাষার মতো সংস্কৃতিরও রয়েছে অনস্বীকার্য ব্যাকরণ-তত্ত্ব। সংস্কৃতি-চিন্তার অন্তহীন অভিব্যক্তির মুখোমুখি হয়ে আমাদের মনে রাখতে হয় রোলাঁ বার্তের বিখ্যাত এই উচ্চারণ: ' Culture, in all its aspects, is a language.'। বস্তুত সামাজিক ব্যবহার-বিধির সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে যেসব পরম্পরাগত নিয়ম নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের আকরণবাদী ভাষা-চিন্তার সৃজনশীল প্রয়োগের সূত্রে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে আকরণবাদকে বার্ত বলেছেন: 'a certain mode of analysis of cultural artefacts, in so far as this mode originates in the methods of contemporary linguistics.' (১৯৭০ : ৪১২)। সুতরাং স্পষ্টত সোস্যুরের ধারণাবিশ্ব থেকে চিন্তাসূত্র নিয়ে বহুদূর অবধি বাচনকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাকে প্রসারিত করেছেন তাত্ত্বিকেরা। ফলে সাহিত্যতত্ত্ব ছাড়াও নৃতত্ত্ব, মনোবিকলন, ইতিহাস, দর্শন, চিহ্ন-বিজ্ঞান, তথ্যবিজ্ঞান ও সাম্প্রতিক অধিপরিসরবিদ্যায় বিচিত্র তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন রচিত হয়ে চলেছে। সেইসঙ্গে লোকযান, লোকসংস্কৃতি, সমাজবিদ্যা, প্রত্নকথাতত্ত্ব, এমনকি পোষাক প্রদর্শনীর মতো নিতান্ত দৃশ্যগত বাণিজ্যের বিষয়ও চিহ্নতাত্ত্বিক বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। না-লিখলেও চলে যে সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সর্বদা ভাষা সম্বন্ধীয়। বিখ্যাত তাত্ত্বিক টোডোরোভের সরলোক্তি এরকম : 'The writer does nothing more than read language.'(১৯৬৯: ৮৪)। ভাষার নানা ধরনের ব্যবহার সম্ভব, সাহিত্যে তার ব্যবহার বিশিষ্টতম কেননা ভাষার প্রকৃত স্বভাব সম্পর্কে শুধুমাত্র সাহিত্যিক বয়ানই আমাদের অবহিত করে।

বাচনিক, চিহ্নতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানের সুষম সংশ্লেষণ না-হলে কোনো আকল্পই যথার্থ তাৎপর্যবহ হতে পারে না। বাস্তবতার ওপর শব্দের তাৎপর্য নির্ভর করে না। আবার সম্বোধকের ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা তাৎপর্যের নিয়ামক হতে পারে না। ভাষা স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি। তার মানে ভাষা-ব্যবহারকারী সরাসরি নিজের উচ্চারণের তাৎপর্য বিধান করতে পারেন না, সামগ্রিকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতি ও সংগঠনই তাৎপর্যের

উপাদান। এই নিরিখে সাহিত্য-বিশ্লেষণের আকরণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি লেখকসত্তা ও বাস্তবতা— উভয়কেই শেষ পর্যন্ত পরিহার করে। চিহ্নায়িতের বদলে চিহ্নায়কের প্রতি মনোযোগ যখন কেন্দ্রীভূত হয়, অন্বিষ্ট তাৎপর্যের চেয়ে প্রাধান্য পায় অর্থবহ হয়ে ওঠার পদ্ধতি। অর্থাৎ সাহিত্যিক অধ্যয়নে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারাই জরুরি। সাহিত্য থেকে বার্তা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় দীর্ঘদিন তার বাচনিক প্রকল্পকে অবহেলা করা হয়েছে, এবার আবিষ্কার করতে হবে প্রকল্পের গুরুত্ব, এতে যদি বার্তা কিছুটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে — তাতেও আপত্তি নেই। সাহিত্য যেহেতু সম্পূর্ণত ভাষা-নিষ্পন্ন, প্রতিটি স্তরে তাকে ভাষারই মতো সংগঠিত হতে হবে—আকরণবাদী চিন্তাপ্রস্থানের অন্বিষ্ট এই বোধের প্রতিষ্ঠা। কোনও তাৎপর্যের অন্তরালে বাস্তবতা থাকতেই হবে, নতুন ভাষাচিন্তা একথায় বিশ্বাসী নয়। সাধারণ পরিস্থিতিতে প্রয়োজন-মাফিক ভাষাকে যখন ব্যবহার করা হয়, তাকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ বলে ধরে নেওয়া হয়। এতে সক্রিয় থাকে এই যথাপ্রাপ্ত বিশ্বাস যে তাৎপর্য এবং অভিপ্রায়ই ভাষার নিয়ন্তা। স্বাধীনতার প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উত্থাপিতই হয় না। কিন্তু রোলাঁ বার্ত যখন বলেন যে সাহিত্য বাচনের সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি—তিনি প্রচলিত প্রায়োগিক বিধান থেকে অনেকখানি দূরে সরে যান। এখানে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ মন্তব্য স্মরণ করা যায় : 'Language is literature's Being, its very world, the whole of literature is contained in the act of writing , and no longer in those of thinking, portraying, telling or feeling' (১৯৭০ : ৪১১)। সাহিত্যের পরাসত্তা ও আস্তিত্বিক জগৎ হিসেবে ভাষাকে যখন গ্রহণ করি এবং ভাবি যে লিখন-ক্রিয়ায় সাহিত্যের সর্বস্ব প্রচ্ছন্ন রয়েছে, বক্তব্যটি হয়ে ওঠে আরও বহু চিন্তা-প্রশাখার উৎস। চিন্তন-চিত্রণ-কথন-অনুভাবন : এদের মধ্যে যত মহত্ত্ব বা গভীরতা থাক, সাহিত্যিকতার প্রাতিষ্ঠানিক স্তর থেকে লিখনের প্রবহমানতায় পৌঁছাতে গেলে দৃশ্য ও অদৃশ্য অভ্যাসের শেকলগুলি ভেঙে ফেলতে হবে।

সাহিত্যে ভাষা তো সংযোগের মাধ্যমমাত্র নয় কেবল, তা অস্বচ্ছতা-জটিলতা-বক্রতা নিয়েই অন্তর্বস্তুও হয়ে ওঠে। বিশেষত বহুস্বরিক কবিতার ভাষার দিকে তাকালে এই ধারণার যথার্থতা স্পষ্ট হয়। এছাড়া কমলকুমার মজুমদারের গদ্যভুবনও এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। 'যে ভাষাকে আক্রমণ করে সে-ই ভাষাকে বাঁচায়'— এই মন্তব্য মনে রেখে বলা যায়, সাহিত্যিক যেন অনবরত ভাষার কাছে কিছু প্রশ্ন তুলে ধরেন এবং ভাষার মধ্যেই তাদের সমাধান খোঁজেন। এইজন্যে তাঁকে বারবার যেতে হয় এক আকল্প থেকে অন্য আকল্পে। সাহিত্যিক পাঠকৃতিতে এরই ফলশ্রুতিতে একটিমাত্র তাৎপর্য থাকে না, অনেকার্থদ্যোতনার সন্ধান বস্তুত অনিবার্য। এই সন্ধান যখন করি, লেখকের অভিপ্রায়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া চলে না। তাছাড়া ভাষার চলনে নিহিত থাকে দ্ব্যর্থবোধকতা কিংবা

অর্থবোধের বহুত্ব। ফলে বৈচিত্র্য, আততি, বিপ্রতীপতা, কূটাভাস প্রচ্ছন্ন থেকে যায় সমগ্রতার মধ্যে, লেখকের একতন্ত্রী রচনাপ্রণালীতে এর হদিশ মেলে না। লেখা স্বাধীন, স্বয়ংপ্রভ ও সার্বভৌম বলে লেখক-নিরপেক্ষ ভাবে তা হয়ে ওঠে মুক্ত ও বহুধাচিহ্নায়িত। অর্থের বহুত্ব ও সম্বোধিত - নির্ভরতা সম্পর্কে কোনো সংশয় করা যায় না তাই। বাচক বা সম্বোধক আর কেন্দ্রে থাকে না। ভাষাচিন্তার এই পর্যায়ে বিষয়ীসত্তার বিকেন্দ্রায়ন তাই হয়ে পড়েছে অবধারিত। আকরণোত্তরবাদী পর্যায়ে জাক দেরিদা ও জাক লাকাঁ এই উপলব্ধিকে তাঁদের ধরনে বিকশিত করেছেন।

বয়ানের অর্থ সম্পর্কে লেখকই আগে শেষ কথা বলতেন। সংস্কৃত কবির বক্তব্য অনুযায়ী অপার কাব্যসংসারে কবিকে প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতিনিধি হিসেবে জেনেছি, বহু সহস্রাব্দ ধরে ভেবেছি, তাঁর রুচি অনুযায়ী জগৎ নির্মিত হবে। কিন্তু এখন আর বলতে পারি না — 'যথাবৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ততে'। পাঠকৃতির অর্থ কী হবে, লেখক তার নিয়ন্তা প্রভু নন, আদি প্রস্তাবক মাত্র। অনেক সময় লিখিয়ের অতি-উপস্থিতিকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে অর্থবোধের প্রক্রিয়াও ক্যামোফ্লেজের আশ্রয় নেয়। তখন গ্রহীতা-পাঠক বা সমালোচক হয়ে ওঠেন অভিযাত্রী-আবিষ্কারক, পাঠ যেন পাঠোদ্ধার। জেনে নিতে হয়, অনেক তাৎপর্য নিয়ে বয়ান স্বভাবে বহুবাচনিক। তাই বহু সম্ভাবনা থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার যুক্তিই হলো ভাষ্য বা টিপ্পনি। রোলাঁ বার্ত বলেন, শব্দগ্রন্থনায় যদি একটিমাত্র আভিধানিক অর্থ থাকে, সাহিত্য বলে কিছু থাকবে না। অর্থাৎ 'the very plurality of meanings' (১৯৬৬: ৫০)-ই সাহিত্যের ভিত্তি। কালান্তরেও যে বেঁচে থাকে কোনো পাঠকৃতি, এই চিরকালীনতার মানে এই নয় যে বয়ান বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের ওপর এক ও অদ্বিতীয় অর্থ চাপিয়ে দেয়। বরং ঠিক তার উল্টো। একই মানুষের কাছে বিভিন্ন পাঠে তা ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা বয়ে আনে। এভাবে বাচনের অনেকান্তিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠাই ভাষাচিন্তার প্রধান চালিকাশক্তি। সাহিত্যে ভাষার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সঞ্চারে কত বিচিত্র পদ্ধতি সম্ভব, এটা যিনি লক্ষ করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত তাত্ত্বিক। বিষয়বস্তু বা প্রকরণ সম্পর্কে প্রথাগত মনোভঙ্গি পালটে নেওয়ার আহ্বানই যেন জানান আকরণবাদী ভাবুকেরা। চিহ্নায়িতের বদলে চিহ্নায়কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার নতুন নতুন যুক্তি ক্রমশ যত উত্থাপিত হতে থাকল, ঠিক সেই অনুপাতে নান্দনিক ভাবনায়ও আকরণবাদী পর্যায়ের পরে আকরণোত্তরবাদী পর্যায়।

এই সূত্রে রূপান্তরিত হলো আখ্যানতত্ত্বের আকল্পও। টোডোরোভ, জেনেট ও জোনাথন কুলেরের ভাষ্য অনুসরণ করলে দেখব, রোলাঁ বার্তের ভাষাচিন্তাকে এঁরা কত সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করে নতুন নতুন খাতে বইয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ এখানে নয়।

শুধু যে-কথাটি এখানে লেখা দরকার, তা হলো সাহিত্যিকতার সংগঠনে উপস্থাপনার কত বহুমুখী তাৎপর্য হতে পারে এবং পাঠকৃতির নির্মিতিতে অন্তর্বয়ন ও পরাপাঠের গুরুত্ব কত বেশি, এ সম্পর্কে তাঁরা আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন। কোনও যথাপ্রাপ্ত বাস্তবতার পুনরুত্থাপন করাই শিল্প নয়। ভাষার বহুস্বরিক বিন্যাস ও প্রতিন্যাসের মধ্য দিয়ে বাস্তব অহরহ পুনর্নির্মিত হয়। যে-অনুপাতে ভাষা নতুন হয়ে ওঠে, ঠিক সেই অনুপাতে শিল্পকেও মৌলিক বলতে পারি। এইজন্যে সৃষ্টি ও নির্মাণের দ্বন্দ্ব। আর, এই ধারণাও এখন অচল যে নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী শুধু লেখক এবং পাঠক কেবল নিষ্ক্রিয় ভোক্তা। রোলাঁ বার্ত তাঁর বিখ্যাত S/Z বইতে বাচনিক নন্দনের নতুন পর্যায়ের সূচনা করেছেন। বালজাকের 'সারাসিন' এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পাঠককেন্দ্রিকতা ও লেখককেন্দ্রিকতার নতুন সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। ভাষা থেকে অর্থের উদ্ভাসনে যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়, সেখানে পাঠক সক্রিয় না হয়ে পারে না। স্বভাবত ভাষার অভিব্যক্তিতেও তার ছাপ পড়তে বাধ্য। কিন্তু যেখানে পাঠকৃতিকে আমরা নিষ্ক্রিয় পাঠক হিসেবে গ্রহণ করি, সেখানে ভাষাতেও অর্থাৎ অর্থবোধে সক্রিয়তার বিদ্যুৎস্পর্শ দেখা দিতে পারে না। যেখানে পাঠকের সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যিক সেখানে লিখন-প্রক্রিয়া কার্যত লেখক থেকে পাঠকের কাছে সরে যায়।

ছয়

এই বক্তব্য আকরণোত্তর চেতনারও, আবার দেখা যাচ্ছে পাঠকৃতিতে বার্ত কথিত 'lisible' ও 'scriptible' বৈশিষ্ট্য যুগপৎ উপস্থিত থাকতে পারে কেননা কোনও বয়ান পুরোপুরি পাঠকের কিংবা লেখকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। পাঠকৃতিতে নিশ্চয় তাৎপর্যই সব, কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, তাৎপর্যের চেয়েও বড়ো তাৎপর্যের উপাদান ও বিচ্ছুরণের প্রক্রিয়া। যখন এই প্রক্রিয়া স্তব্ধ ও অবসিত, প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেই পাঠকৃতি অন্বিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না। তার মানে, পাঠকৃতি হলো সক্রিয়তার কেন্দ্র ও ক্রিয়াত্মক ক্ষেত্র। স্বয়ং তাৎপর্যই হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থির নয়, সর্বদা সঞ্চরমান। ভাষার গভীরে এই সঞ্চরমান সম্ভাবনা রয়েছে বলেই তা বহুধা-মূল্যগর্ভ হতে পারে এবং চিহ্নায়কের ঐন্দ্রজালিক ঐশ্বর্য সৃষ্টি করতে পারে। শেষ পর্যন্ত তাই আকরণ ও পদ্ধতির স্থিরতা অটুট থাকতে পারে না, কোনও পর্যায়েই রুদ্ধতা থাকতে পারে না। আদ্যন্ত গতিময় বলেই পাঠকৃতির পাঠক্রিয়া মানে অনবরত প্রেক্ষিতের ধারণার পুনর্মূল্যায়ন এবং অংশ থেকে সমগ্রে ও সমগ্র থেকে অংশে নিরন্তর যাতায়াতের মধ্য দিয়ে রহস্যময় মুক্ত পরিসরের প্রতীতি অর্জন। পাঠক বয়ানের বহুবাচনিকতাকে শুধু আবিষ্কারই করে না, তার নিষ্কর্ষকে অনবরত বদলেও দেয়। বলা বাহুল্য, এই প্রক্রিয়া

পূর্ব-নির্দিষ্ট নয় বলেই বহুরৈখিক। ভাষার পাঁচটি মৌল সংকেতের কথা বার্ত আমাদের জানিয়েছেন। এই সংকেতগুলিও অনড় আর অপরিবর্তনীয় নয়। ভাষার স্থাপত্য যদিও অনেকখানি এদের দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে, সময়-স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্থাপত্য রূপান্তরিত হয় বলে এই সব তত্ত্ববীজও কার্যত মুক্ত ও পুনর্মূল্যায়নযোগ্য। বলা যায়, এদের সম্ভাবনা অন্তহীন।

পড়তে পড়তে সংবেদনশীল পাঠক যখন বয়ানের সঞ্চালক সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষকে আবিষ্কার ও অনুসরণ করেন, বাচনের চিহ্নবিশ্ব ও রূপকের পরিসর তাঁকেও কিন্তু একটু একটু করে বদলে দেয়। রূপান্তরপ্রবণ পাঠকসত্তা লেখককে ক্রমশ নিষ্প্রভ ও অবান্তর করে দেয়, সেই সঙ্গে যথাপ্রাপ্ত ভাষাচিন্তাকেও বদলে দেয়। এই বিন্দুতে রোলাঁ বার্ত থেকে জাক দেরিদায় পৌঁছে যাই আমরা। আকরণবাদী চিন্তার প্রসারণ ও সমালোচনা : দুটোই লক্ষ্য করি দেরিদার বয়ানে। তাঁর মতে, আমাদের ভাবনা আকরণবাদের পরিসরে রয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে মনে করি 'an adventure of vision, a conversion in the way of putting questions to any object'(1978: 3)। এই চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে থেকেই আমরা তার অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করতে পারি, তৈরি করে নিতে পারি উদ্ভাসনী সমালোচনা। দেরিদা ভেবেছিলেন, সোস্যুরের বৈপ্লবিক ভাষাচিন্তা যেসব মূল সূত্রের ওপরে প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতি আকরণবাদী সাহিত্যভাবনা সুবিচার করতে পারেনি। তাঁর মৌলিক অবদান হলো এই ভাবনাসূত্র যে ভাষায় রয়েছে শুধু নিরবচ্ছিন্ন পার্থক্য-প্রতীতি। এই অবস্থান থেকে তিনি আকরণবাদের বহু ধারণাকে জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন। বিশেষত, চিহ্ন ও আকরণ: এই দুটি তত্ত্ববীজ এবং নন্দনতত্ত্ব ও চিহ্নতত্ত্বের মৌল বিন্যাসপদ্ধতির সমালোচনা উপস্থাপিত করেছেন তিনি। বাক্‌কেন্দ্রিকতা ও পার্থক্যবোধ নিয়ে দেরিদার ভাবনা ভাষাচিন্তায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান। বাক্‌কেন্দ্রিকতার নিরিখে সমস্ত ভাববীজকে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি; সত্যের তাত্ত্বিক স্বভাব তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম। দেরিদা প্রস্তাবিত বাক্‌কেন্দ্রিকতা চূড়ান্ত পরোক্ষ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে। লিখনের চেয়ে কথনকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা কথক তাঁর অভিপ্রেত অর্থকে প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করতে পারেন যা লিখনে ঘটে না। কেননা অন্বিষ্ট ভাবনাকে সরাসরি ব্যক্ত না-করে লিখন মূলত কথনক্রিয়ার ধরনকে অনুসরণ করে। এ-প্রসঙ্গে বলা যায়, পরম্পরাগত ভাবে ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে ধরা হয় বলে তা বহির্বৃত প্রেক্ষিত ও উপকরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সোস্যুর অবশ্য ভাষার এই গৌণ মর্যাদাকে মেনে নেননি। তাঁর মতে, ভাষা প্রাথমিক গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী কেননা ভাবনা বা তাৎপর্য ভাষার সাহায্যেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই কথন ও লিখনের মধ্যে কাকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দেওয়া যায়, এই তর্কে না-গিয়ে দেরিদার

মতো ভাষাচিন্তাবিদ লক্ষ করেন পার্থক্যবোধ সৃষ্টির পদ্ধতিগুলিকে। উপস্থিতি, অভিপ্রায় বা উপস্থাপনার নিরিখে ভাষার লিখনরূপ বা কথনরূপকে তাদের প্রয়োগ-সামর্থ্যে বিচার করতে চান তিনি। তাঁর প্রস্তাবিত পার্থক্য-প্রতীতির মধ্যে রয়েছে বাচনের স্থগিত বা বিলম্বিত হওয়া। এতে আভাসিত হচ্ছে সময়ানুভবের নিগূঢ় স্পন্দন। আবার এতে নিহিত রয়েছে কোনও কিছু থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যাওয়ার প্রবণতাও, এতে রয়েছে পরিসরের দ্যোতনা। কোনও পাঠকৃতির মধ্যে ভাষিক উপাদান যখন অন্য উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এদের ব্যবধানের নিরিখে তাৎপর্যের গতি-প্রকৃতিও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অস্তিত্বের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে যুগপৎ উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি, সংলগ্নতা ও অসংলগ্নতা। এদের সম্পর্ক মূলত পার্থক্য-প্রতীতির ।এদের সম্বন্ধের বিচ্ছুরণে নির্ধারিত হয় ভাষার আলো-অন্ধকার, স্থিতি-গতি-রুদ্ধতা-মুক্তির দ্বিরালাপ, এর কোনও শেষ নেই।

দেরিদার ভাষা-চিন্তার নিরিখেই স্বতশ্চল ভাবে পৌঁছে যাই বাচনের অবচেতনে, বোধের সমান্তরালতায়। এই সূত্রে জাক লাকাঁ ও মিখায়েল বাখতিনের চিন্তাবিশ্ব স্মরণীয় হয়ে ওঠে। ভাষাচিন্তায় এঁরা পরস্পরের সহযাত্রী ও পরিপূরক যেমন, তেমনি প্রতিস্পর্ধীও। কিন্তু সেই আলোচনায় আপাতত যাচ্ছি না। দেরিদা চিহ্নায়ন প্রকরণের শৃঙ্খলিত স্থিতি সম্পর্কিত ধারণার কথা বলেছেন। তাঁরই প্রস্তাবিত পার্থক্য-প্রতীতিকে কীভাবে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারি, তা নিয়েও জটিল বিশ্লেষণ রয়েছে। আপাতত লক্ষ করতে পারি তাঁর ভাষা-চিন্তার সময়-মাত্রা ও পরিসর-মাত্রার সহাবস্থান। ভাষার মধ্যে জীবন ও জগৎ থেকে উদ্ভূত বিচিত্র সম্পর্কের শৃঙ্খলা যিনি লক্ষ করেন, তিনিই আবার খুঁজে পান অনিবার্য অন্ধবিন্দুদের। ভাষা-চিন্তায় মুক্ত বয়ানের যে-প্রতিশ্রুতি বিশ শতকের কয়েক দশক ধরে ক্রমশ গড়ে উঠেছিল, দেরিদা তাকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি যখন বলেন পাঠকৃতির বাইরে কিছুই নেই— সে-সময়ে আসলে তিনি জানাতে চান যে ভাষার বাইরে নেই কোনও জগৎ কিংবা জীবন। অজস্র শূন্যের জটিল পরিধি রচিত হওয়া সত্ত্বেও ভাষারই ভেতর দিয়ে পৌঁছাতে হয় ভাষ্যে। জ্ঞানের ভাষ্য নয়, ভাষ্য অস্তিত্বের। অর্থাৎ মুক্তির।

এমন নয় যে দেরিদা কিংবা তাঁর সহযোগীদের ভাষা-চিন্তা সম্পর্কে কোনও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেল। বাচন-সম্পর্কিত কৃৎকৌশল অহরহ রূপান্তরিত হচ্ছে সময়ের অমোঘ সংকেতে। ভাষার প্রতীতি তো শেষ পর্যন্ত সেই সংকেতের প্রতীতি যা গ্রহীতার সামাজিক- সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক অবস্থান, প্রস্তুতি ও ধারণ-ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

অ্যাডোর্নোর নন্দনভাবনা ও তত্ত্ববিশ্ব

ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাপ্রস্থানে অ্যাডোর্নোর অবদান কার্যত অপরিমেয়। এইজন্যে কোনো-একটি প্রবন্ধের সীমিত পরিসরে তাঁর অনেকান্তিক গুরুত্বের সমস্ত দিক পর্যালোচনা করা অসম্ভব। নির্মীয়মান এই প্রতিবেদনে তাঁর নন্দনভাবনার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে চিন্তার বহুবাচনিক পরিসরে বাধ্যতামূলক ভ্রমণ করতে হবে আমাদের। হয়তো যে-কোনো প্রধান তাত্ত্বিকের তত্ত্ববিশ্ব অনুশীলনে এই প্রক্রিয়া অপরিহার্য। আজকের পরস্পর-বিরোধী ও কূটাভাসময় আধুনিকোত্তরবাদী বীক্ষাবিন্দু অনুযায়ী অ্যাডোর্নোর নিবিড় পাঠ করব কি নান্দনিক অভিজ্ঞতার প্রকৃত ও প্রতীয়মান স্তরের ব্যবধান প্রত্যাখ্যান করার জন্যে? সংস্কৃতি যখন শিল্পায়িত ও দীপায়নের দ্বান্দ্বিকতায় নেতিবাদের ছায়া-আগ্রাসী, অ্যাডোর্নোর চিন্তাসূত্রগুলি ঠিক কীভাবে ও কতখানি ব্যবহার করব? যেহেতু প্রতিটি বয়ান সময়ের দাবি মেটানোর পরে সব ক্ষেত্রে সময়াতীত হতে পারে না, ভাষ্য কিংবা অতিভাষ্য দিয়ে ভেতরকার অন্ধবিন্দুগুলি পুরোপুরি আচ্ছন্ন করা শক্ত। তার ওপর মনে রাখতে হয় গ্রহীতার অবস্থান সংক্রান্ত জরুরি প্রশ্নটিও। দীপায়ন-আধুনিকতা-সাংস্কৃতিক রাজনীতি ভারতীয় উপমহাদেশের অধিবাসীদের কাছে, বিশেষত বাঙালির কাছে, কীভাবে প্রতিভাত হচ্ছে—তার ওপর অ্যাডোর্নোর নন্দন-ভাবনার পরিগ্রহণ অনেকখানি নির্ভর করছে।

এইসব কথা মনে রেখেই অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্ব পরিক্রমা করব, যাব স্তর থেকে স্তরান্তরে। এই তাত্ত্বিকের জন্মশতবর্ষ আসন্নপ্রায়, এবছর (১৯০২) ১১ সেপ্টেম্বর তাঁর ৯৯ বছর পূর্ণ হচ্ছে। এই তারিখ এখন অবশ্য বিশ্ববাণিজ্যকেন্দ্র ও পেন্টাগনে বিমানহানার জন্যে স্মরণীয় হয়ে গেছে। ১৯০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর অ্যাডোর্নো যে ফ্রাঙ্কফুর্টে জন্মেছিলেন, এই তথ্য নিষ্প্রভ হয়ে যেতে পারে। নবজাত শিশুটি অবশ্য তখন মা মারিয়া ক্যালভেলি অ্যাডোর্নোর পারিবারিক উপাধিতে পরিচিত হয়নি। শৈশবে তাঁর নাম ছিল থিয়োডোর লুডহিগ হিজেনগ্রুন্ড। জীবনের প্রথম তিনটি ও শেষ দুটি দশকে ফ্রাঙ্কফুর্ট ছিল তাঁর চারণভূমি। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রবাস কাটাতে হয়েছে তাঁকে অক্সফোর্ড, নিউ ইয়র্ক ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়। নাৎসি জার্মানি থেকে দূরে নির্বাসিত জীবনযাপন করার সময়ে তিনি তাঁর সর্বজনবিদিত নামটি গ্রহণ করেন, থিয়োডোর ডব্লিউ অ্যাডোর্নো। তাঁর বাবা ওস্কার হিজেনগ্রুন্ড ছিলেন ধনবান ইহুদি ব্যবসায়ী। মা মারিয়া ও মাসি আগাথার কাছে শৈশবে ও কৈশোরে থিয়োডোর ধ্রুপদী সঙ্গীতের পাঠ গ্রহণ করেন। বৌদ্ধিক জীবন সম্পর্কে তাঁর প্রবল তৃষ্ণা লালিত হয়েছিল জার্মানির সমৃদ্ধ দার্শনিক আবহে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে কান্টের 'Critique of Pure Reason' বইটির সঙ্গে তাঁর

নিবিড় পরিচয় হয়। তখন ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক পরিশীলনের সুযোগ হয়েছিল তাঁর। ফলে বিভিন্ন দার্শনিক পাঠকৃতির নিবিড় পাঠে সম্পৃক্ত হওয়ার জীবন-ব্যাপ্ত প্রক্রিয়ার সূচনা হল। অতি দ্রুত পরিণত মননের অধিকারী হলেন। এইজন্যে মাত্র একুশ বছর বয়সে তিনি, তিন বছরব্যাপী অধ্যবসায়ের পরে, ফ্রাঙ্কফুর্টের যোহান হুলগ্যাঙ্গ গ্যয়ঠেবিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

অভিসন্দর্ভের-বিষয় হিসেবে অ্যাডোর্নো বেছে নিয়েছিলেন এডমুন্ড হুসের্লের প্রাতিভসত্তাবাদী দর্শন। গবেষণা করার সময় দু'জন প্রখ্যাত চিন্তাবিদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, যাঁরা পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর বৌদ্ধিক জীবনের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২২ সালে হুসের্ল সম্পর্কিত একটি আলোচনাচক্রে ম্যাক্স হর্কহাইমারের সঙ্গে আর ১৯২৩-এ তাঁর কান্ট-প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। শেষোক্ত সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল রিসার্চ এবং গিয়র্গ লুকাচের 'History and Class Consciousness' বইটি প্রকাশিত হয়। অ্যাডোর্নো অবশ্য ১৯৩৮-এর আগে সমাজতত্ত্ব গবেষণা প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত সদস্য হননি যদিও ১৯৩১ থেকে এর সঙ্গে তাঁর খানিকটা শিথিল সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি আকৈশোর দার্শনিক মনন সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন, সংস্থার প্রথম সঞ্চালক কার্ল গ্রুনবার্গের (১৯২৩-১৯২৯) কার্যকালে এর ঝোঁক ছিল মূলত ইতিহাস ও অর্থনীতির দিকে। গ্রুনবার্গ প্রারম্ভিক ভাষণে (১৯২৪) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছিলেন : "The materialist conception of history neither is, nor aims to be a philosophical system .... its object is not abstractions, but the given concrete world in its process of development and change."। সুতরাং অ্যাডোর্নো সংস্থার কাজকর্ম সম্পর্কে যে খুব একটা উৎসাহ বোধ করবেন না, তা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু যে-সংস্থার সঙ্গে পরে তিনি গভীরভাবে সম্পৃক্ত হবেন, তার প্রভাব একেবারে অস্বীকার করার মতো ছিলনা। তিনি ঐ সময় প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ বইপত্র খুব অভিনিবেশের সঙ্গে পড়তেন। প্রখ্যাত মার্ক্সীয় তাত্ত্বিক গিয়র্গ লুকাচের ইতিহাস ও শ্রেণিচেতনা বিষয়ক বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পড়ে নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময় লুকাচের 'দি নভেল' ও এর্নস্ট ব্লকের বই পড়া হয়ে গিয়েছিল। দার্শনিক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে অ্যাডোর্নো ক্রমশ যে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছিলেন, এইসব বইপত্র ছিল তার প্রেরণাস্থল। এছাড়া ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের গ্যয়ঠে-বিষয়ক নিবন্ধ এবং 'The Origin of German Tragic Drama' নামক বিখ্যাত বইয়ের প্রভাব কতখানি ছিল, সে-সম্পর্কে স্বয়ং অ্যাডোর্নো 'Aesthetic Theory'-র খসড়া-ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন।

শৈশব থেকে যে সঙ্গীতবোধে পরিশীলিত হয়েছিলেন অ্যাডোর্নো, যৌবনে পশ্চিম

ইউরোপের নব্যসঙ্গীত ভাবনার সঙ্গে নিবিড় সংযোগের ফলে তা তাঁর দর্শনচিন্তা বিকাশের পক্ষেও সহায়ক হয়েছিল। বিশের দশকে প্রকাশিত অধিকাংশ প্রবন্ধের অম্বিষ্ট ছিল সমসাময়িক সাঙ্গীতিক সৃষ্টির পর্যালোচনা। ১৯২৫-২৬ সালে অ্যাডোর্নো ভিয়েনায় এডুয়ার স্টয়েরমানের কাছে পিয়ানো এবং অ্যালব্যান বের্গের কাছে সুরসংহতির তালিম নিয়েছিলেন। ঐ দশকে বার্লিনের অনেক সঙ্গীত-স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত আলোচনা হত। এইজন্যে শিল্পকলা সম্পর্কে ধ্যানধারণা অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি বহির্বৃত পর্যবেক্ষক মাত্র ছিলেন না, ভেতর থেকে বাহিরকে দেখার বিশেষ ক্ষমতাও তাঁর অধিগত ছিল। সাঙ্গীতিক উপকরণের ইতিহাস-নিষ্পন্ন বিবর্তন কিংবা সঙ্গীত-সৃষ্টির আত্মগত ও বস্তুগত সত্যের অভিব্যক্তি বিচার : কোনো কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। একই সঙ্গে আধুনিক শিল্পকলার নান্দনিক বৈধতা কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণির সাংস্কৃতিক প্রকরণ ও ভাববাদী দর্শনের ক্ষয়িষ্ণুতার নিরিখে শিল্পের তাৎপর্য বিচার অ্যাডোর্নোর অভিপ্রেত ছিল — এমনও বলেছেন কেউ কেউ। অবশ্য অভিব্যক্তিবাদী শিল্পকলার নির্যাস ও ভাববাদবিরোধী দর্শন-প্রস্থানের বিচিত্র সংশ্লেষণ হিসেবে তাঁর নন্দনচিন্তাকে গ্রহণ করা যায় কিনা, এবিষয়ে সমালোচকেরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। নিছক সংশ্লেষণের চেষ্টা করেননি তিনি; শিল্পকলার সামাজিক সমালোচনা কতদূর অবধি গ্রাহ্য এবং এই প্রক্রিয়ার পরিধি কতটা বিস্তৃত — তাও বুঝে নিতে চেয়েছেন। লুকাচের রচনা থেকে অর্জিত উপলব্ধি এবং বেঞ্জামিন, হর্কহাইমার সহ গবেষণা-সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা থেকে লব্ধ চিন্তাবীজ সমন্বিত করে তিনি সমালোচনাত্মক প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইছিলেন। এছাড়া বিশের দশকের শেষে বার্লিনে বহুবার যাওয়ার সূত্রে ভাবী পত্নী গ্রেটেল কারপ্লাস এবং রাজনৈতিক চিন্তায় বামপন্থী লেখকদের (যেমন ব্লক, বেঞ্জামিন, তাইসলের, হুইল, বের্টল্ট ব্রেখ্‌ট্) সাহচর্য তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। সামাজিক চেতনা রূপান্তরের ক্ষেত্রে শিল্পের ভূমিকা কী : এই ছিল তাঁদের আলোচনার মুখ্য বিষয়।

আগেই লিখেছি, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের 'The Origin of German Tragic Drama' অ্যাডোর্নোকে উদ্দীপিত করেছিল। এমন নিবিড় কল্পনা-সিঞ্চিত পাঠ কাঙ্ক্ষিত ছিল তাঁর যা শিল্পকর্ম-দার্শনিক পাঠকৃতি-দৈনন্দিন জীবনের অনুষঙ্গে অন্তর্বৃত সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সমস্যার ক্ষেত্রগুলি উন্মোচিত করে। ভাষ্যকার এমন সামাজিক ও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন যা হয়তো শিল্পী-দার্শনিক-সমাজকর্মীর স্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে কাজে লাগুক বা না-ই লাগুক, সমালোচকদের বিশ্লেষণী ভাষ্যের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা থাকে। বেঞ্জামিনের ব্যাখ্যাপ্রণালী থেকে অ্যাডোর্নো যদিও শেষ পর্যন্ত ভিন্ন পথের পথিক হয়েছিলেন, তিরিশের দশকের সূচনা-পর্বের রচনাগুলিতে তাঁদের ভাবনার সাদৃশ্য রয়েছে। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব

বিষয়ে তাঁর দুটি বক্তৃতায় এবং 'Kierkegaard. Construction of the Aesthetic' নামক প্রথম বইতে বেঞ্জামিনের প্রেরণা দুর্লক্ষ্য নয়। ১৯৩৩ সালে যেদিন হিটলার ক্ষমতা দখল করলেন, ইতিহাসের আশ্চর্য সমাপতনে সেদিন বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। কিছুদিন পরেই অবশ্য জার্মানির বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইহুদি অধ্যাপকেরা বরখাস্ত হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে অ্যাডোর্নো, হর্কহাইমারও ছিলেন। ১৯৩০ থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টের সমাজ গবেষণা কেন্দ্রে সঞ্চালক হিসেবে হর্কহাইমার কাজ করেছিলেন।ইতিহাসের কালো প্রহরে গবেষণা-কেন্দ্রটি নিউইয়র্কে স্থানান্তরিত হলো, কিছুটা শিথিলভাবে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাকে সংযুক্ত করা হলো। সে-সময় অ্যাডোর্নো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাগ্রসর ছাত্র হিসেবে নথিভুক্ত হলেন। তবে ভাবী পত্নী গ্রেটেল কারপ্লাসের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তিনি প্রায়ই জার্মানিতে যেতেন। ১৯৩৭ সালে দু'জনের বিয়ে হলো। বেঞ্জামিন ইতিমধ্যে প্যারিসে চলে গেছেন; ১৯৪০ সালে নাৎসিবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করার পরে তিনি স্পেনের সীমান্তে পালিয়ে যান এবং সেখানেই আত্মহত্যা করেন।

দুই

অ্যাডোর্নো ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত থেকে কতখানি পাঠ নিয়েছেন এবং কী কী নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে তাঁর চেতনা-বিশ্বে, এসব বিষয়ে চুলচেরা আলোচনা এখনও অব্যাহত। এই প্রতিবেদনে শুধু লক্ষ করব তিরিশের গোড়ায় নিজের চিন্তা-বিশ্বের প্রধান আধেয় হিসেবে যেসব সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার প্রকল্প তিনি নির্মাণ করেছিলেন, মোটামুটিভাবে সেইসব আমৃত্যু (আগস্ট, ১৯৬৯) অনুসরণ করে গেছেন। দর্শন সম্পর্কে প্রগাঢ় নিষ্ঠা এবং আধুনিক শিল্পকলা, বিশেষভাবে সঙ্গীত সম্পর্কে, প্রবল আকর্ষণ অটুট ছিল। তবে এর মানে এই নয় যে তাঁর চিন্তাবিশ্বে কোনো উচ্চাবচতা নেই, বরং ঠিক তার উল্টো। অন্তত তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিবর্তিতহয়েছে তাঁর বহুরৈখিক ভাবনাপ্রস্থান। যেসব বিষয় নিয়ে তিনি লিখেছেন এবং রচনায় যে-মনোভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে, তাদের মধ্যে লক্ষ্য করি ক্রমিক রূপান্তর। পরিবর্তনশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তত্ত্বচর্চায় সহযাত্রীদের বিভিন্ন প্রকল্পের সম্মেলক প্রভাব ঐ রূপান্তর সম্ভব করে তুলেছে। তাঁর চিন্তাবিশ্বে আকস্মিক কোনও সমাপতন নেই।

অ্যাডোর্নোর ভাবনাবিশ্বের প্রথম পর্যায় ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৯ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সময় তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতির সমালোচনা উপস্থাপিত করার জন্যে বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থানের মধ্যে অন্যোন্য-উদ্ভাসন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল। সঙ্গীত কীভাবে শিল্পোদ্যোগের চরিত্র অর্জন করছে, এ বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি। আর, ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের সঙ্গে লিখেছেন যুগান্তকারী বই 'The Dialectic of Enlightenment';

বিশেষত 'সংস্কৃতি শিল্পোদ্যোগ : গণপ্রতারণার অভিব্যক্তি হিসেবে দীপায়ন' শীর্ষক বহু-আলোচিত অধ্যায়টি রচনা করেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে এই পর্যায়ে অ্যাডোর্নো হেগেলীয় শৈলী এবং নিজস্ব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ফ্রয়েডীয় চিন্তা সূত্র অনুসরণ করেছেন। এছাড়া নীৎশের ভাবনা ও অস্‌ওয়াল্ড স্পেঙ্গলার-এর সংস্কৃতি-সমালোচনাকে কিছুটা পুনর্বিন্যাস করে নিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাস যাপনের সময় তিনি জনপ্রিয় সংস্কৃতির অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন যাতে ফ্যাসিবাদ, ইহুদি-বিদ্বেষ এবং জনসাধারণের চেতনায় সার্বিক অসাড়তার গভীর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলি শনাক্ত করা যায়। এই বিষয়ে লোকায়ত পরিসর সম্পর্কে বেশ কিছু চিন্তাসূত্র উপহার দিয়েছেন তিনি। মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখার মধ্যে কার্যকরী বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যেভাবে তিনি সাংস্কৃতিক সমালোচনার সন্দর্ভ নির্মাণ করেছিলেন, তার উপযোগিতা এখনও পুন:পাঠ করা যায়।

১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ অবধি বিস্তৃত ছিল তাঁর চিন্তা-প্রস্থানের দ্বিতীয় পর্যায়। এসময় তিনি উচ্চসংস্কৃতির সামাজিক প্রতিবেদনে গবেষক-সুলভ নিরাসক্তি নিয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন। ১৯৪৯-এ হর্কহাইমারের সঙ্গে অ্যাডোর্নোও ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে আসেন এবং সামাজিক গবেষণা-কেন্দ্র ১৯৫১ সালে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ের সমাপ্তি হলো ১৯৫৮ তে যখন হর্কহাইমারের পরে গবেষণাকেন্দ্রের সঞ্চালক হিসেবে নিযুক্ত হলেন অ্যাডোর্নো। এ সময়কার রচনায় লক্ষ্য করি, সরকারি মতাদর্শের অভিব্যক্তিকে প্রত্যাহ্বান জানাচ্ছেন তিনি, বেশ কিছু ক্ষেত্রে যেন বিনির্মাণবাদী প্রবণতার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। 'Philosophy of Modern Music', 'Minima Moralia' এবং 'In Search of Wagner' মূলত জার্মানির উচ্চসংস্কৃতির প্রতিপাঠকৃতি। যুদ্ধ-পরবর্তী দিনগুলিতে অ্যাডোর্নো স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন যে সংস্কৃতির জগৎ উত্তরোত্তর পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোয় সম্পৃক্ত হয়ে যাচ্ছে। 'সাংস্কৃতিক সমালোচনা ও সমাজ'নামে যে-প্রবন্ধ ১৯৪৯-এ রচিত ও ১৯৫১-তে প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন অ্যাডোর্নো : 'Cultural Criticism must become social physiognomy ... The more total society becomes, the greater the reification of the mind and the more paradoxical its effort to escape reification on its own. Even the most extreme consciousness of doom threatens to degenerate into idle chatter. Cultural criticism finds itself faced with the final stages of the dialectic of culture and barbarism. To write poetry after Auschwitz is barbaric. And this corrodes even the knowledge of why it has become impossible to write poetry today.' (১৯৫১ :৩০)।

সংস্কৃতি ও বর্বরতার দ্বান্দ্বিকতা কিংবা অমঙ্গলবোধ সম্পর্কিত চূড়ান্ত চেতনা কীভাবে সাংস্কৃতিক সমালোচনা-ধারাকে প্রভাবিত করে, এসম্পর্কে অ্যাডোর্নোর মন্তব্য নিঃসন্দেহে আমাদের ভাবায়। আউস্‌ভিৎস সভ্যতার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিপুল গুরুত্বসম্পন্ন জলবিভাজন রেখা। এই রেখার ওপারে যারা রয়েছে, কবিতা লেখা তাদের কাছে বর্বরতার অভিজ্ঞান কেন — তা তলিয়ে ভাবতে হয়। সৃষ্টির জ্ঞানও ধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে সার্বিক বিনষ্টির গাঢ়তম ছায়ার অভিঘাতে; তাই কবিতার মতো সূক্ষ্ম সংবেদনশীল শিল্পমাধ্যম এখন নিরাশ্রয়। তবে এই কথাগুলিকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা সমীচীন কি না, এই প্রশ্ন উঠে এসেছে। এমনও হতে পারে, দুঃস্মৃতির দহন এই রচনার সময় পীড়িত করছিল অ্যাডোর্নোকে, তাই যন্ত্রণাময় আত্মসমালোচনার সূত্রে বাচনিক আতিশয্য অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। হয়তো নৈরাশ্য-মন্থর চেতনা নিয়ে লেখক তাঁর পাঠকদের কিছুটা বিদ্ধও করতে চাইছিলেন, যাতে শিল্পকর্মকে কেউ কখনো ইতিহাস-নিরপেক্ষ বলে ভাবতে না পারে। উচ্চসংস্কৃতির ভোক্তা উচ্চবর্গীয় সমাজ অপ্রীতিকর বাস্তবকে ভুলে থাকতে চায় বলে তিনি শুধু স্মৃতিকে উস্‌কে দিতে চেয়েছেন।

১৯৫৬ সালে প্রকাশিত 'Against Epistemology' বইতে সত্তাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্বকে ঐতিহাসিকভাবে বিচার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন অ্যাডোর্নো। এছাড়া ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য-সমালোচনামূলক রচনার প্রারম্ভিক বয়ান, 'The Essay as form'। এতে দার্শনিক শৈলীকে সাহিত্যবোধ উন্মোচনের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সঙ্গীত , সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর চিন্তা বিকশিত হয়েছে আরও।

বস্তুত অ্যাডোর্নোর বৌদ্ধিক জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে (১৯৫৯-৬৯) এইসব ভাববীজ আরও বিকশিত হয়ে পারস্পরিক সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে জটিলতর গ্রন্থনা নির্মাণ করেছে। এদের মধ্যে আলাদাভাবে উল্লেখ্য 'Notes on Literature' শীর্ষক নিবন্ধ-সংগ্রহের তিনটি খণ্ড (১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬৫) এবং 'Three Studies on Hegel' (১৯৬৩)। এ সময় তিনি বিভিন্ন ধরনের শৈক্ষিক ও বৌদ্ধিক বিষয় নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বিতর্ক হয়েছিল কার্ল পপারের সঙ্গে। (দ্রঃ The positivist dispute in German Sociology : London : 1976)। পপার যেখানে মূল্য-নিরপেক্ষতার আদর্শ প্রচার করছিলেন, অ্যাডোর্নো দৃঢ়তার সঙ্গে জানাচ্ছিলেন যে কোনও সামাজিক তত্ত্ব রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হতে পারেনা। যে-সমস্ত সমালোচকেরা মার্ক্সবাদ থেকে অ্যাডোর্নোর দূরত্ব প্রমাণ করার জন্যে বিশেষভাবে সচেষ্ট, তারা তাঁর নিম্নোদ্ধৃত বস্তুবাদী বিশ্ববীক্ষার অভিব্যক্তি সম্পর্কে অস্বস্তিবোধ করেন : 'The idea of scientific truth

cannot be split off from that of a true society. Only such a society would be free from contradiction and lack of contradiction.' (১৯৭৬ : ২৭)

অ্যাডোর্নো আসলে চাইছিলেন রাজনৈতিক ভাবে দায়বদ্ধ সমাজতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে সংযোগশূন্যতার সমাধান। বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শৈক্ষিক ও বৌদ্ধিক মূলনীতি কোন্ পথ ধরে চলবে, এসম্পর্কে অ্যাডোর্নোর ভাবনাসূত্র এখনও পথ-প্রদর্শক হতে পারে। য়ুর্গেন হাবেরমাস, অ্যালব্রেখট হ্বেলমের প্রমুখ চিন্তাবিদেরা এক্ষেত্রে অ্যাডোর্নোর কাছেই প্রেরণা পেয়েছেন। তবে তৃতীয় পর্যায়ে তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই হলো "Negative Dialectics" (১৯৬৬) এবং 'Aesthetic Theory' (১৯৭০)। প্রথমোক্ত বইটি হলো পরাদার্শনিক প্রতিবেদন কেননা এতে দর্শন সম্পর্কে দার্শনিক উদ্ভাসন উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যান্য দর্শন-সংক্রান্ত আলোচনায় ইতিমধ্যে অ্যাডোর্নো যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন এবং ভাবনার বর্গ ব্যবহার করেছেন— তাদের আরও বিশদ করা হয়েছে এই বইতে। তেমনি শেষোক্ত বইটিও পরানন্দনের সন্দর্ভ কেননা এতে দার্শনিক নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে দর্শন-নিষ্ণাত ভাবনা উপস্থাপিত হয়েছে। আর, ইতিমধ্যে শিল্পকলা নিয়ে যা কিছু লিখেছেন অ্যাডোর্নো, তাদের মধ্যে অনুসৃত পদ্ধতি ও চিন্তাবর্গগুলি আরও প্রসারিত হয়েছে। বস্তুত এই দুটি বইতে লেখকের বৌদ্ধিক জীবন ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সারাৎসার গ্রথিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের দার্শনিক নির্যাসও এদের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। তাই অ্যাডোর্নোব চিন্তাবিশ্বে এই বই দুটির গুরুত্ব অপরিসীম।

তিন

অ্যাডোর্নোর নন্দন-ভাবনার আলোচনা তাই কার্যত তাঁর জীবন-ব্যাপ্ত বৌদ্ধিক কৃতির সারমর্ম রচনাও। শৈশব থেকেই তিনি শিল্পকলা ও সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার গভীরতর তাৎপর্য সম্পর্কে পরিশীলিত হয়ে উঠেছিলেন। শিল্পকলার মতো তাঁর প্রগাঢ় আবেগ দর্শনের জন্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে সমসাময়িক সমাজের অসঙ্গতি ও স্ববিরোধিতা সম্পর্কে তীক্ষ্ণ সমালোচনা পেশ করার ক্ষেত্রেও সমঝোতা করেননি কখনও। যদিও তাঁর জীবন-ব্যাপ্ত নন্দন-ভাবনার সারাৎসার 'Aesthetic Theory' তে, এও আমরা ভুলতে পারিনা যে এই বইটি অসম্পূর্ণও। কেননা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনে ছেদ পড়ে যাওয়াতে তাঁর বয়ান খণ্ডিত হয়েই রইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শৈক্ষিক রাজনীতিতে জড়িয়ে গিয়ে এবং নিজেরই কট্টরপন্থী ছাত্রদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অ্যাডোর্নো যে প্রবল মনঃকষ্ট পেয়েছিলেন, কারো কারো মতে তা-ই তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ।

তাঁর স্ত্রী গেটেল ও ছাত্র রোলফ্ টিডেম্যান অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিকে প্রকাশনার

উপযোগী করে তোলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষায় বইটি অনূদিত হয়। এছাড়া অজস্র প্রবন্ধ-সংগ্রহ ও আলোচনা-চক্রের মধ্য দিয়ে প্রতীচ্যের বৌদ্ধিক পরিসরে অ্যাডোর্নোর গুরুত্ব দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। বিশেষজ্ঞদের মতে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত অ্যাডোর্নোর প্রতিবেদন নিরবচ্ছিন্ন পুনঃপাঠের যোগ্য। কারো কারো মতে তাঁর জীবনের মর্মসত্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে এই বইতে; এমনকী এ যেন তাঁর 'Indirect epitaph' (Lambert Zuidervaart : 1994 : 9)। এই সমালোচকের মতে : 'Aesthetic Theory has become the last testament, as it were, of a truly remarkable man : a Hegelian Marxist who distanced himself from both Hegel and Marx; an assimilated German Jew who wrote several seminal works in American exile; a polished modern musician who subjected music to a critique of ideology, an imaginative and rigorous philosopher who was better known for his work in the social sciences'. (তদেব)। কোনো সন্দেহ নেই যে অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বে ইতিহাস অন্তঃস্বর যোগান দিয়েছে। কিংবা, বলা যায়, বিশ শতকের বহুবাচনিক সময়ে পরস্পর-বিরোধী প্রবণতার দ্বন্দ্ব যখন সামাজিক প্রেক্ষিতকে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছে— অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্ব ইতিহাস থেকে প্রাণবায়ু আহরণ করেছে। তাঁর যাবতীয় শক্তি ও কল্পনা, মেধা ও অনুভবের উৎস রয়েছে সেই ইতিহাসে যাতে অনায়াসে সহাবস্থান করতে করে পশ্চিমী মার্ক্সবাদ, নান্দনিক আধুনিকতাবাদ, সাংস্কৃতিক নৈরাশ্য ও পীড়াবোধ, প্রান্তিকায়িত ইহুদি বুদ্ধিজীবীর আত্ম-অভিজ্ঞান সন্ধান ও বিনির্মাণবাদী প্রবণতার পূর্বাভাস। তাঁকে যাঁরা প্রগতিপন্থী বা সংশয়বাদী, শিথিল বামপন্থী বা অস্থির বীক্ষণের অধিকারী বলে মনে করেন, তাঁরা কেউই ঠিক ভাবেননা কেনো-না-কোনো-একটি বিশেষ উপাদান বা প্রবণতা অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্বে একমাত্রিক প্রাধান্য বিস্তার করেনি। বরং পরস্পর-বিরোধী উপকরণের সংশ্লেষণ ঘটেছে তাঁর বয়ানে। বিশেষত 'Aesthetic Theory' বইতে ঐ সংশ্লেষণ যেন বিস্ফোরক মাত্রা অর্জন করেছে। আসলে সমকালীন ইতিহাসের ভেতরে প্রচ্ছন্ন ছিল সমিধ-সংগ্রহ ও দহন-ক্রিয়ার সম্ভাবনা; আপন চিন্তার নির্যাসকে স্ফুলিঙ্গের অনুঘটক হিসেবে ব্যবহার করে অ্যাডোর্নো সম্ভাবনাকে আগুনে রূপান্তরিত করেছেন। কতটা আলো পেয়েছি আর কতখানি উত্তাপ, পরবর্তী কালে দ্রুত পরিবর্তিত ইতিহাসের ভস্মস্তূপ দেখে তার হদিশ করা সহজ নয় খুব। তবু এও ঠিক, রূপক এক্ষেত্রে কোনো আড়াল তৈরি করছে না; নন্দন-ভাবাদর্শ-বাস্তব পরিসরের গ্রন্থনা অস্পষ্ট নয়। ইদানীং উত্তর-মার্ক্সবাদ কিংবা আধুনিকোত্তরবাদ যাঁদের চিন্তার সঞ্চালক, তাঁরা পরস্পর-ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অ্যাডোর্নোর তত্ত্ববিশ্বকে ব্যবহার করতে চাইছেন বলে নানা সংশয়মথিত জিজ্ঞাসা উঠে আসছে। গ্রহীতাদের কূট ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে কখনো গৌণ হয়ে যাচ্ছে

অ্যাডোর্নোর জীবনব্যাপ্ত ধারাবাহিক ভাবনা ও চলমান ইতিহাসের স্পষ্ট ও নিরবচ্ছিন্ন দ্বিরালাপ। হাবেরমাস তাই আলোচকদের পরস্পর-বিরোধী বিশ্লেষণ জনিত অনিশ্চয়তার ধোঁয়াশা লক্ষ করে খানিকটা ক্ষুব্ধ স্বরে লিখেছেন : 'Adorno has left philosophy with a chaotic landscape'। এর-মোকাবিলা করতে হলে অ্যাডোর্নোর নন্দন-চিন্তার ঐতিহাসিক অন্তঃস্বর নির্ণয় করা জরুরি। তাঁর অন্যান্য বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন ঘটেছে, 'Aesthetic Theory' -ও বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে নানা মাত্রায় পরিগৃহীত হয়েছে। সম্ভবত বহুস্বরিক তাৎপর্যের নিরিখে এই বইটির পাঠ-প্রতিক্রিয়া সবচেয়ে বেশি কৌতূহলজনক। পশ্চিমী মার্ক্সবাদ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থান প্রবর্তিত সমীক্ষণী সমালোচনাতত্ত্বের ধারণায় যা-কিছু কেন্দ্রীয় ভাববীজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, অ্যাডোর্নোর বইতে সেই সবই কোনও-না-কোনও ভাবে প্রাসঙ্গিক। পুঁজিবাদ ও সংস্কৃতির আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে অ্যাডোর্নো যেসব মৌলিক গবেষণা-প্রকল্পের প্রস্তাবনা করেছেন, ধ্রুপদী মার্ক্সবাদী তত্ত্বভাবনা ও রণকৌশলের সঙ্গে এর পার্থক্য খুব স্পষ্ট বলে অনেকেই তাঁর এই স্বতন্ত্র পথগামিতাকে নিজেদের পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের অনুকূলে ব্যাখ্যা করেছেন। অথচ এই পার্থক্য-প্রতীতির ঐতিহাসিকতা ও যৌক্তিক পরম্পরা ব্যাখ্যার দিকটি প্রাপ্য গুরুত্ব পায়নি। গিয়র্গ লুকাচ, কার্ল কর্শ ও আন্তনিও গ্রামশি র মৌলিক চিন্তাপ্রণালী যখন পশ্চিমী মার্ক্সবাদের স্বাতন্ত্র্য-দীপ্ত পরিসর নির্মাণ করছিল, অ্যাডোর্নো সেই বিশেষ রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের আবহে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন।

একটু আগে ইতিহাসের যে-অন্তঃস্বরের কথা লিখেছি, সেই নিরিখে মনে রাখতে হয়, সে সময় জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের মার্ক্সবাদীরা প্রায়োগিক পার্টি-রাজনীতির লেনিনীয় আকল্প সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের কাছে ভাবাদর্শগত ও দার্শনিক সংগ্রামের তাৎপর্য ভিন্নভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। মতান্ধতার বিরোধিতা করতে গিয়ে তাঁরা মার্ক্সবাদের ইতিহাসে তত্ত্ব ও প্রয়োগের পরিবর্তনশীল সম্পর্ক নিয়েও গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছিলেন। কারো কারো মনে হয়েছিল, সর্বহারার বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে; ক্রমশ পার্টি সংগঠনে স্ট্যালিনীয় ঝোঁকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বেঁধে উঠেছিল। পাশাপাশি ফ্যাসিবাদের উত্থান সাধারণভাবে চিন্তাবিশ্ব এবং বিশেষভাবে বিপ্লবী ভাবাদর্শের জগৎকে সংক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। মত ও পথ নিয়ে ক্রমবর্ধমান বিতর্ক আন্তর্জাতিক মার্ক্সবাদী পরিধিতে বিকেন্দ্রায়নের প্রবণতাকে শক্তিশালী করে তুলেছে। অ্যাডোর্নোর চিন্তা-প্রস্থানে ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত যে গভীর প্রভাব রেখে গেছে, তাতে সংশয় নেই কোনও। মার্ক্সবাদের ধ্রুপদী ঐতিহ্যে তত্ত্বগত ঘাটতি রয়েছে কিনা, অ্যাডোর্নোকে সে-বিষয়েও অভিনিবেশ দিতে হয়েছিল। নিজস্ব অভিজ্ঞতা, দেশান্তরী হওয়ার বহুমাত্রিক অভিঘাত, ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের সহযাত্রীদের বহুমুখী ভাবনার প্রতিক্রিয়া এবং সমসাময়িক অস্তিত্ববাদী মার্ক্সীয় চিন্তাবিদদের

প্রবল বৌদ্ধিক উপস্থিতি : এই সব কিছুর সামূহিক প্রভাব আত্তীকরণ করে অ্যাডোর্নো তাঁর বহুস্বরিক ও বহুমাত্রিক নন্দনচিন্তার স্থাপত্য নির্মাণ করেছিলেন।

চার

বিভিন্ন তাত্ত্বিক পরিভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যত দ্বিধা বা সংশয় থাকুক না কেন, অ্যাডোর্নোর ভাববিশ্বকে বিশ শতকে নানা ধারায় বিকশিত মার্ক্সবাদের ব্যাপক ইতিহাসের পরিসরেই স্থাপন করতে হয় । সেইসঙ্গে পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যে যে বিপুল ও গুণগত পরিবর্তন দেখা গেছে এবং ইতিহাসের বয়ানে যাবতীয় রৈখিকতা ধ্বস্ত করে ও অজস্র অন্ধবিন্দুর সঙ্গে সমঝোতা করে তা শতাব্দির শেষে সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক ও দার্শনিক প্রশ্নগুলি পুনঃপরীক্ষা করছে, তাতে তাত্ত্বিক প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতিও বিনির্মিত হতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্ব বিষয়ক পর্যালোচনাও কোনো সরলীকৃত পথ ধরে চলতে পারে নি। প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের সূত্রে উন্নততর পুঁজিবাদ যেভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধ্বস্ত হওয়ার পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ধত ও আগ্রাসী চরিত্র অর্জন করেছে, আধুনিকোত্তর শিল্পসাহিত্যসমাজ ভাবনা তারই তালে-লয়ে গাঁথা হতে বাধ্য । এর অকল্পনীয় রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে অ্যাডোর্নোর নান্দনিক দর্শন আমাদের কতখানি সাহায্য করতে পারে, এই প্রশ্ন এসেই যায় ।

ইতিমধ্যে আকরণোত্তরবাদ ও উপনিবেশোত্তর-চেতনাবাদের বহুস্বরিক অভিঘাতও চিন্তাবিশ্বে বহুমুখী তরঙ্গ-বিক্ষোভ তৈরি করেছে । নিঃসন্দেহে পরিগ্রহণের প্রেক্ষিত অত্যন্ত জটিল এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের বিশ্লেষণী সমালোচনাত্মক তত্ত্বের আকল্পগুলিও নিবিড়তর অধ্যয়ন দাবি করে । অ্যাডোর্নোর বিকল্প সন্ধান আলোচনা করতে গিয়ে বেশ কিছু মৌলিক জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই । প্রথমত সমসাময়িক জটিল সমাজ ও সংস্কৃতির গ্রন্থনাকে নির্দিষ্ট সামগ্রিক একক হিসেবে গ্রহণ করতে পারি কি ? দ্বিতীয়ত তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য কি পূর্ব-নির্ধারিত অথবা তাদের অনন্বয় সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করা চলে কি ? তৃতীয়ত যুক্তিবাদী মনোভঙ্গির সামগ্রিক ও ঐতিহাসিক ভূমিকা কি অবশ্যমান্য ? এইসব জিজ্ঞাসা থেকে দেখা দেয় শিল্পীর স্বাধীনতা, শিল্পের রাজনীতি ও রাজনৈতিক শিল্পের প্রসঙ্গ, নান্দনিক আধুনিকতাবাদ, শৈল্পিক সত্য ও ভাবাদর্শের নিগূঢ় সম্পর্ক ইত্যাদির পুনর্বিবেচনা।

অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বে সার্বভৌম শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পরম্পরাগত মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজে শিল্পকলার স্থান যেভাবে নির্মিত হয়েছে, অ্যাডোর্নো তা থেকে অনেকখানি দূরে সরে গেছেন । সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতির সংশ্লেষণ সম্পর্কে তাঁর ভাবনা অনেকখানি ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তা-প্রস্থানের বিশ্লেষণী সমালোচনাত্মক ধারাই অনুসরণ করেছে । মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রকল্পের মূল কথা হলো রাজনৈতিক প্রয়োগের সঙ্গে

তত্ত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই দার্শনিক ও কর্মীর কেন্দ্রীয় দায়িত্ব। কিন্তু ফ্রাঙ্কফুর্ট চিন্তাপ্রস্থান এই দায়িত্ব-বোধের বৈধতা স্বীকার করে না, শ্রেণি-সংগ্রাম ও সর্বহারার বিপ্লবের তত্ত্ব তাতে গুরুত্ব পায় না । রাজনৈতিক সংগঠন ও কার্যপ্রণালী কিম্বা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের অস্ত্র হিসেবে কোনো চিন্তাপ্রস্থানের ব্যবহার-উপযোগিতা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই তার । কোনো কোনো মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদের মতে অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বও ঐ মনোভঙ্গি অনুসরণ করেছে। তাঁর বয়ানে রয়েছে ভাবাদর্শগত অবক্ষয়ের নিদর্শন । এটা বিস্ময়কর যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপরীত মেরুর আলোচকেরাও মনে করেন, অ্যাডোর্নোর তত্ত্ব অযৌক্তিক ও দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রশ্রয় দিয়েছে । ষাট ও সত্তর দশকের ছাত্র-বিক্ষোভ ও নাগরিক সন্ত্রাসবাদের মধ্যে এর বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছে । কারও মতে 'Adorno pursued a sterile, unrealistic theory'; কেউবা অ্যাডোর্নোর চিন্তায় ফ্যাসিবাদী লক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন । তত্ত্ব ও প্রয়োগের ঐক্য স্থাপনে তিনি ব্যর্থ কেননা প্রয়োগ সম্পর্কে তাঁর আতঙ্ক আক্ষরিক অর্থেই 'neurotic' (১৯৭১ : ১৫৫) । জর্জ ফ্রিডম্যান তো অভিযোগ করেছেন : 'Adorno flirts with a fascist aestheticizing of politics' অর্থাৎ অ্যাডোর্নোর প্রতিবেদন নিবিড় পাঠ করার ক্ষেত্রে আমাদের বড়ো প্রতিবন্ধক মতান্ধতা ও প্রতিভাবাদর্শ-- এই দুটোই। অ্যাডোর্নো যখন শৈল্পিক সত্যকে তাঁর জিজ্ঞাসার অন্যতম প্রধান অন্বিষ্ট করে তোলেন, পশ্চিমি মার্ক্সবাদের নন্দনতাত্ত্বিক পরিসরের নির্যাস তাতে পরিগৃহীত হয়। এপ্রসঙ্গে অ্যাডোর্নো-বেঞ্জামিন বিতর্ক বিশেষ অভিনিবেশ দাবি করে। খুব বেশি গভীরে না-গিয়েও এইটুকু বলা যায়, গণমাধ্যমের প্রভাব, শিল্পের সামাজিক তাৎপর্য এবং সেই তাৎপর্যের আর্থ-রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে দু'জনের বক্তব্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য ছিল । কেউ কেউ মনে করেছেন অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বের তুলনায় অধিকতর মার্ক্সীয় বিকল্প পাওয়া যায় বেঞ্জামিনের বক্তব্যে । অন্যদিকে ১৯৭২-এ হাবেরমাস ঘোষণা করেছিলেন, নিঃসন্দেহে অ্যাডোর্নো মার্ক্সবাদী হিসেবে বেশি গ্রাহ্য । আত্মদীপ্ত সার্বভৌম শিল্পকর্ম ও সংস্কৃতির বাণিজ্য কীভাবে সম্পর্কিত—এই পর্যালোচনা মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্বের ধারায় এর আগে আর দেখা যায় নি । বেঞ্জামিন ও অ্যাডোর্নো এই বিষয়ে. ভিন্ন মত পোষণ করতেন, তবে পরম্পরাগত শিল্পবোধের ক্রমিক ক্ষয় সম্পর্কে তাঁদের ধারণায় কিছুটা সাদৃশ্য ছিল । বেঞ্জামিন যেখানে গণমাধ্যমের অভিঘাতে ক্ষয়ের কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন, অ্যাডোর্নো আধুনিক শিল্পকলার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের মধ্যে অবক্ষয়ের কারণ দেখতে পেয়েছেন । তাঁর মতে বেঞ্জামিন স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত শিল্পকলার প্রগতিশীল স্বভাব এবং গণমাধ্যম পরিবেশিত শিল্পের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র উপেক্ষা করেছেন । সমগ্র সমাজ-পদ্ধতির অঙ্গ হিসেবে এদের অবস্থান এবং অন্তর্বর্তী দ্বান্দ্বিকতা লক্ষ করে বেঞ্জামিনের

কাছে ১৮ মার্চ, ১৯৩৬ তারিখে লেখা চিঠিতে তিনি মন্তব্য করেছেন : 'Both bear the stigmata of capitalism, both contain elements of change... Both are torn halves of an integral freedom, to which however they do not add up.'। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'Aesthetic Theory' বইটির সূচনায় ও সমাপ্তিতে শৈল্পিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে । সুতরাং তাঁর নান্দনিক দর্শনে এই জিজ্ঞাসার বিশেষ গুরুত্ব সহজেই অনুমেয় । তিনি লিখেছেন : 'Absolute freedom in art ... contradicts the abiding unfreedom of the social whole. That is why the place and function of art in society have become uncertain'। শিল্পের নিজস্ব পরিসরে স্বাধীনতা অন্তহীন যদিও, সামাজিক প্রেক্ষিতে নানা ধরনের দৃশ্য ও অদৃশ্য শৃঙ্খল তাকে আপেক্ষিক বিচারে অনিশ্চিত করে তোলে । শৈল্পিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কিছু কিছু সামাজিক প্রাক্‌শর্তের ওপর নির্ভরশীল। মানবতাবোধের নির্যাস যে-সমাজে মহিমান্বিত, সেই সমাজে শৈল্পিক স্বাধীনতা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ব্যক্ত হয় । তাই সমাজ যত বিমানবায়িত হতে থাকে, সার্বভৌমত্বের বোধ তত ধ্বস্ত হয় । এই বোধের উপস্থিতি শিল্পের ভাবাদর্শগত ভিত্তিকে দৃঢ়তর করে; এর ভেতরকার সত্য-বিষয়বস্তু-শিল্পকে মানব-মুক্তির সঞ্চালক করে তোলে। উন্নততর পুঁজিবাদী সমাজে শৈল্পিক স্বাধীনতার প্রাক্‌শর্তগুলি কতটা রক্ষিত হতে পারে, অবাঞ্ছিত বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করে শিল্পকর্ম কীভাবে অন্য-এক কাঙ্ক্ষিত বাস্তবের প্রকরণ নির্মাণ করে : অ্যাডোর্নো সেসব বুঝতে সাহায্য করেন আমাদের। শিল্পিত সত্য খোঁজার জন্যে আধুনিক শিল্পকলার ওপর নির্ভর করেছিলেন তিনি। তবে এইজন্যে তিনি আধুনিকতার পক্ষ সমর্থন করেননি; বরং আগাগোড়া এর সম্পর্কে বিশ্লেষণী সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

আধুনিক শিল্পকলার ভাবাদর্শগত অবস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি এই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : 'It becomes impossible to criticize the culture industry without criticizing art at the same time' (প্রাগুক্ত : ৩৪) । সেই সঙ্গে তিনি এও ভোলেননি যে আধুনিক শিল্পকলার সব কিছুই মান্যতা পেতে পারেনা; এর মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম ও অকৃত্রিমের বিভাজন । তিনি যখন শিল্পকলার সত্যবস্তুকে 'অবচেতন ইতিহাস-রচনাতত্ত্ব' 'unconscious historiography' (প্রাগুক্ত : ২৮৬) বলেন, তাঁর নিজস্ব শিল্পতত্ত্বে ইতিহাসের নির্যাসকেই প্রতিষ্ঠিত করেন । অর্থাৎ শিল্পিত সত্যে খুঁজে পান ইতিহাসের দর্শন ও নন্দনের সারাৎসার । ইতিহাসের নির্যাস নিঙড়ে নিয়েই শিল্পকলায় সমাজ-নির্ধারিত বৈধ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে । যন্ত্রপ্রযুক্তির ক্রমোৎকর্ষ ও চেতনার দ্রুত বর্ধমান পণ্যায়ন সত্ত্বেও উন্নততর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্তর্বৃত দ্বন্দ্ব ও অন্ধবিন্দুগুলি শনাক্ত করার জোর শিল্পকর্ম নিজের সত্যস্বভাব থেকেই আহরণ করে। ইতিহাস-নিরপেক্ষ উদ্বেগ

ও অবসাদ নেই কোনো, যদি সার্বিক অসাড়তা ও অর্থহীনতার বোধ শিল্পকর্মকে আক্রমণ করে—ইতিহাস ও দর্শনের যুগলবন্দিতে আধারিত ভাষ্যের বয়ান দিয়ে শিল্পিত সত্যের প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করতে চান অ্যাডোর্নো। এইজন্যে শৈল্পিক স্বাধীনতা-রাজনৈতিক শিল্পকলা-নান্দনিক আধুনিকতার ভাবনা তাঁর সত্য-সম্পর্কিত ধারণায় সংশ্লেষিত হয়েছে। আর, এই সংশ্লেষিত ধারণা-সমবায়ের অভিব্যক্তি হলো তাঁর নন্দনতত্ত্বসম্পর্কিত প্রতিবেদন। একে নন্দনের দর্শন বলবেন নাকি দর্শনের নন্দন : এই নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কিছু সমস্যায় পড়েছেন। এতে আমাদের মনে পড়ে যায় ভারতীয় দর্শনের সেই বিখ্যাত পরিহাস-বিজল্পিত তর্ক : পাত্রাধার তৈল নাকি তৈলাধার পাত্র!

অ্যাডোর্নোর বয়ান সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং নন্দনচিন্তা সম্পর্কে বিশেষভাবে যে-সমস্যার কথা বলা হয়ে থাকে, তা হলো, তাঁর রচনা সহজে বোধগম্য নয়। তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন : 'My theorem that there is no philosophical 'first thing' is coming back to haunt me ... I cannot now proceed to construct a universe of reasoning in the usual orderly fashion. Instead I have to put together a whole from a series of partial complexes which are concentrically arranged and have the same weight and relevance. It is the constellation ... of these partial complexes which has to make sense.' (প্রাগুক্ত : ৪৪১)। এই যে পূর্বনির্ধারিত ও সুশৃঙ্খল যুক্তিক্রম থেকে বাইরে গিয়ে সর্বতোভাবে মুক্ত বয়ানের সন্ধান, এর গভীরতর তাৎপর্য বুঝে নিতে হবে আগে। দার্শনিক রচনার পরম্পরাগত প্রণালী প্রত্যাখ্যান করে অ্যাডোর্নো এমন নান্দনিক বোধ-সম্পন্ন পাঠকৃতি নির্মাণ করতে চেয়েছেন যা মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের মতো নিরন্তর অনন্ত কালে ও পরিসরে অপস্রিয়মান।

ভাবনার কোনো আদিপাঠ নেই, উৎস-মুহূর্ত নেই, কোনো প্রত্ন-প্রেরণা নেই : এই বিন্দু থেকে শুরু হয় তাঁর দার্শনিক জিজ্ঞাসা এবং নান্দনিক প্রশ্নও। 'Negative Dialectics' বইতে তাই প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য করেছিলেন তিনি : 'True philosophy resists paraphrasing !' তার মানে তাহলে কী এই : অ্যাডোর্নোর রচনা থেকে সহজ ও সাবলীল কোনো অর্থ পাওয়া যাবেনা কখনো এবং সহজবোধ্য বয়ান নেই তাঁর ভাববিশ্বে ! তাহলে প্রত্যক্ষ সংযোগের প্রতীতি কিংবা আকাঙ্খা কি অবান্তর ? যদি তা-ই হয়, শিল্পকলা কীভাবে জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তুলবে? সংযোগহীন শিল্প আর সোনার পাথরবাটি তো একই কথা। অ্যাডোর্নো তবে কি আমাদের কূটাভাসের কৃষ্ণবিবরে নিক্ষিপ্ত করতে চান ? অজস্র খণ্ড-ভাবনার অণুকেন্দ্রগুলির সমবায়ী উপস্থিতি দিয়ে যদি দর্শন ও নন্দনের পাঠকৃতি গড়ে ওঠে, জুইডেরভার্টের মতো কোন্ বিশ্বাসে বলব : 'The resulting text is neither

a systematic treatise nor a collection of essays yet it is neither haphazard nor disjointed' (১৯৯৪ : ৪৬)। বয়ান এলোমেলোও নয়, শিথিলভাবে গ্রথিতও নয় কিংবা প্রণালীবদ্ধও নয়, অসংবদ্ধ রচনা-সংগ্রহও নয় : কেননা তা আকরণোত্তর মুক্ত পাঠকৃতি।

পাঁচ

হ্যাঁ, এই যে উন্মুক্ততার দ্যোতনা—তা বিশ্বাসেরই কথকতা, তবে তা কোনো সহজিয়া বিশ্বাস নয় । কেননা, এই অর্জনীয় বিশ্বাসের রয়েছে অজস্র অন্তর্বয়ন । অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্ব তাই ঐ অন্তর্বয়নময় মুক্ত পাঠকৃতির নতুন ধরনের পাঠ দাবি করে । যিনি দার্শনিক সিসিফাসের অধ্যবসায়ের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন (Negative Dialectics, ১১৪), নন্দনবোধের তাৎপর্য বোঝার জন্য তিনি যে নিরবচ্ছিন্ন চড়াই-উৎরাইয়ের সংকেত দেবেন—তা প্রত্যাশিত ।একদিকে জ্ঞানের কল্পস্বর্গ, অন্যদিকে নান্দনিক বোধের আধার ও আধেয়ের মধ্যবর্তী অনন্বয় ও কূটাভাস : বস্তুত এদের ছায়ায় সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত । এও অনিবার্য যে কোনও-একটি নির্দিষ্ট আকল্প দিয়ে পরস্পর-বিরোধী অবস্থানের মধ্যে সর্বজনমান্য সামঞ্জস্য অর্জন অসম্ভব ।অ্যাডোর্নোর নন্দন-চিন্তায় কোন্ বয়ানকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব-সম্পন্ন বলে মনে করব, এই নিয়েও ঐকমত্যে পৌঁছানো কঠিন ।

বইয়ের খসড়া ভূমিকায় নন্দন-চিন্তা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের সম্ভাব্য বিশ্লেষণ-পদ্ধতির মান্যতা সম্পর্কে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন অ্যাডোর্নো স্বয়ং : 'A methodology in the ordinary sense of the term ... would fail to be justice to the relation between the aesthetic object and aesthetic thought. The only sound methodological imperative seems to be Goethe's : enter into works of art as you would into a chapel ... method is legitimated in its actual use, which is why it cannot be presupposed.' (প্রাগুক্ত : ৫৩০) এই বক্তব্য অনুযায়ী সৃজনশীল শিল্পের প্রতিটি অনন্য পাঠকৃতি পূর্বনির্ধারিত বিশ্লেষণ-প্রণালীকে প্রত্যাখ্যান করে ।

এইজন্যে প্রতিটি পাঠকৃতি মানে সিসিফাসের পুনর্নবীকৃত উদ্যম; বয়ানের ভেতরে প্রচ্ছন্ন থাকে তাৎপর্যের গভীরে পৌঁছানোর সোপানমালা। অধ্যবসায়ী শিল্পরসিক পাঠক/দর্শক ছাড়া অন্য কেউ তাদের আবিষ্কার করতে পারেনা। অ্যাডোর্নোর ভাবনাবিশ্ব পর্যালোচনা করে মনে হয় শিল্পবোধ ও তাৎপর্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি কোনো ধরনের নির্দিষ্ট অভিমতেও পৌঁছতে চাইছেন না । গ্রহীতা-পাঠক অবরোহী নন্দনতত্ত্ব ও আরোহী নন্দনতত্ত্বের আততি পরিশীলন করে নিজস্ব সিদ্ধান্ত নির্মাণ করুন : এই তাঁর অভিপ্রায় ।

একদিকে তথ্যের প্রতি একমাত্রিক আনুগত্য ও বর্গীকরণ প্রবণতা এবং অন্যদিকে শিল্পাতিরিক্ত নির্দেশনামার ওপর গুরুত্ব আরোপ : এই দুটিকে এড়িয়ে গিয়ে তিনি দ্বান্দ্বিক পথ ও পাথেয় নির্মাণ করতে চান।

অ্যাডোর্নোর অন্বিষ্ট দ্বান্দ্বিক নন্দনতত্ত্ব কেননা 'Deductive aesthetics places art in a theoretical straitjacket, and inductive aesthetics turns art into a meaningless abstraction' (জুইডেরভার্ট : প্রাগুক্ত : ৪৯)। তথ্য ও ধারণার মধ্যে নিয়ত উপস্থিত টানাপোড়েনের গুরুত্ব স্বীকার করেন তিনি; সর্বজনীনতা ও বৈশেষিকতার অবচেতন মিথস্ক্রিয়া কীভাবে আধুনিক শিল্পকলাকে দ্বান্দ্বিকতার চারণভূমি করে তুলেছে, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন।

সাম্প্রতিক তত্ত্বজিজ্ঞাসুরা শিল্প-স্রষ্টা ও শিল্পোপকরণের বিশেষ অবস্থানের প্রতি মনোযোগী হয়েও শিল্প-প্রক্রিয়ার মধ্যে সর্বজনীন প্রতীতির অভিব্যক্তি উপেক্ষা করতে পারেননা। যদিও বৈশেষিক পরিসরের সম্ভাব্য কল্পস্বর্গ-সন্ধান দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের অন্যতম প্রধান উপজীব্য, সামাজিক ইতিহাস প্রসূত দ্বান্দ্বিকতার অভিঘাত দার্শনিক বয়ানে নতুন নতুন কৌণিকতা ও উচ্চাবচতা সঞ্চার করে। শেষ পর্যন্ত বাস্তবের আকরণ ও নির্যাসে দেখা দেয় বেশ কিছু অভাবনীয় কূটাভাস। আগেই লিখেছি, অ্যাডোর্নোব বয়ানের উন্মুক্ততা গ্রহীতার জন্যে একই সঙ্গে সম্ভাবনা ও প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে। কোনও নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ-প্রণালী নয়, সমসাময়িকতার প্রয়োজন ও প্রতিশ্রুতিতে গ্রথিত অন্তর্মুখী সন্ধানের আধারে গড়ে ওঠে শিল্পিত সত্যের অবয়ব। একে যুগপৎ 'retrospective and prosepctive aesthetics' (১৯৯৪ : ৫৬) বলেছেন কেউ কেউ। একদিকে জটিল জীবন থেকে উদ্ভূত নৈর্ব্যক্তিক সমস্যা গ্রথিত প্রেক্ষিত, অন্যদিকে নতুন নতুন প্রত্যাশার দিগন্ত সন্ধান। এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরি করা খুব কঠিন, তবুও যা আছে ও যা হতে পারে : তারই দ্বন্দ্বময় আততিতে শিল্পকর্মের ও সেই সঙ্গে দার্শনিক নন্দনতত্ত্বের সত্য আধেয় নির্ণীত হয়ে থাকে। বস্তুত এভাবেই সত্যের উদ্ভাসন থেকে আলাদা হয়ে যায় অসত্যের প্রপঞ্চ; আর, সমাজ ও ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক অভিঘাত শিল্পবস্তুর কোষে কোষে সঞ্চারিত হয়ে যায়।

অ্যাডোর্নোর একটি অসাধারণ মন্তব্য চমৎকারভাবে তাঁর নন্দনতত্ত্বের দিশা নির্দেশ করে : 'Art is a syndrome in motion. Highly mediated in itself, art calls for intellectual mediation terminating in a concrete concept'. (প্রাগুক্ত : ৫২৩)। সুতরাং শিল্প সময় ও পরিসরের মধ্যে নিয়ত সঞ্চরমান জীবনেরই প্রতীতি। শিল্পের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে তাই লক্ষ করতে হয়, একদা তা কী ছিল। সেই সঙ্গে বুঝে নিতে

হয়, শিল্প এখন কী হয়ে দাঁড়িয়েছে আর ভবিষ্যতে তার কী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ধারণা হিসেবে শিল্পকৃতিও মুক্ত বয়ান। গ্রহীতা হিসেবে আমাদের শুধু মনে রাখতে হয়, সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের বহুমাত্রিক আততিতে জায়মান শিল্পকর্ম যুগপৎ ঐচ্ছিক নির্মিতি এবং ভাবাদর্শগত অবস্থানের অভিব্যক্তি। অবশ্য এর মধ্যেও রয়েছে যথাপ্রাপ্ত ও কাঙ্ক্ষিত পরিসরের আততি। অবস্থান বদলে গেলে রূপান্তরিত হয় বাস্তব ও সেই বাস্তবের দ্বান্দ্বিক আবহ। কখনও কখনও এই পরিবর্তন আরোপিতও হতে পারে। বিশেষত সর্বাধুনিক প্রযুক্তির শক্তিতে দৃপ্ত উন্নততর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এমন বিভ্রম আমরা ইদানীং উৎপাদিত হতে দেখছি। তার মানে বিপুল সত্যভ্রমের বিস্ফোরণ এবং পণ্যসর্বস্ব বিশ্বায়নের পর্যায়ে শিল্পিত সত্যের তাৎপর্য সম্পর্কে অভূতপূর্ব সংশয়ের চতুর উৎপাদন। আজ থেকে তিন দশক আগে নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে যে-প্রতিবেদন রচিত হয়েছে, আজকের আমূল পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তা কীভাবে কতটা প্রাসঙ্গিক হতে পারে—এই জিজ্ঞাসা অনিবার্য। তবে মুক্ত পাঠকৃতির মুখোমুখি হওয়ার জন্যে যথার্থ প্রস্তুতি যদি সম্পন্ন হয়ে থাকে, এই প্রত্যাহ্বান মোকাবিলা করা খুব শক্ত হবেনা।

প্রযুক্তিকেন্দ্রিক আধুনিকতার সঙ্গে শিল্পিত সত্যের মূর্ত হয়ে ওঠাব প্রক্রিয়াকে এক করে দেখা চলেনা। আবার সমস্ত শিল্পকর্মে সত্যের উদ্ভাসন ঘটেও না। তা ঘটে সেই শিল্পে যেখানে 'the most advanced consciousness where sophisticated technical proceedures and equally sophisticated subjective experiences interpenetrate' (প্রাগুক্ত : ৫৭)। এই সূত্রে অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের সীমারেখা এবং তাদের দ্বান্দ্বিকতার তাৎপর্য বুঝে নিই যখন, প্রযুক্তি-পরিশীলন-দায়বোধ-অভিব্যক্তি-অন্যোন্যাশ্রয়িতার গুরুত্বও নতুন ভাবে অনুভব করি। শিল্পকর্ম যখন বাস্তবের নির্মোক ভেদ করে নির্যাসে পৌঁছে যায়, অবভাস ও সত্যভ্রমের বিরোধিতা তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই করে। আরও একটি কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন। অ্যাডোর্নো যখন সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তিনি ভোলেননা যে শিল্পকর্মকে আগে শৈল্পিক নিরিখে গ্রাহ্য হতে হয়। এইজন্যে নান্দনিক বিচারে যা অকৃত্রিম বলে মান্যতা অর্জন করেছে, তা কখনো ছদ্ম-রাজনৈতিক চেতনার বার্তাবহ হতে পারেনা।

সাম্প্রতিক বিমানবায়িত পৃথিবীতে কীভাবে গ্রহণ করব অ্যাডোর্নোর নন্দনতত্ত্বকে, এই জিজ্ঞাসার সূত্রে মনে আসে কবি রণজিৎ দাসের অসামান্য উচ্চারণ: 'সত্য কী, আমরা জানিনা। অথচ মিথ্যাকে জানি, নির্ভুল, নিজের ছায়ার মতো। এই সত্য-সন্দিগ্ধ চিরজীবনে মিথ্যাই শেষ পর্যন্ত আমাদের একমাত্র নিঃসংশয় উপলব্ধি, সেই অর্থে আমাদের একমাত্র বিশ্বস্ত সত্য। আমাদের আশ্রয়। ...... খুব সম্ভবত, আমরা মাতৃগর্ভ থেকেই মিথ্যাকে জানি।

জিনের গূঢ়তম সন্ধ্যাভাষায় হয়তো ইঙ্গিতবদ্ধ আছে মিথ্যার সংজ্ঞা এবং ব্যবহার বিধি।' (ডায়েরি থেকে ২) সত্য ও মিথ্যা সম্পর্কে কবির এই বাচন কিন্তু শিল্প-মাধ্যমের বিশিষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত হয়েছে। কেননা অন্য কোনও ভাবে শিল্পিত সত্য ব্যক্ত হতে পারে না। অ্যাডোর্নো আমাদের জানিয়েছেন, শিল্প হলো সুখের তেমন প্রতিশ্রুতি যা নিরন্তর ভেঙে ফেলা হয় (প্রাগুক্ত : ২০৪)। প্রতিশ্রুতি বা আকাঙ্ক্ষার জন্মও হয় ইতিহাসের বাস্তবে। বাস্তব মানে যেহেতু ঘেরাটোপ, শিল্প তাকে কোনও অজুহাতে অস্বীকার করতে চায়। আসলে সীমাতিযায়িতার অভিব্যক্তি কখনও কখনও শিল্পগত বিভ্রম তৈরি করে; কিন্তু এই বিভ্রমের মধ্য দিয়েই হয়তো রচিত হয় সত্যে পৌঁছানোর পথ। নানা কারণে ধ্বস্ত জীবন যখন দহনবেলার আভাস নিয়ে আসে, সমাজকে আরোগ্য করার জন্যে শুশ্রূষার বিশল্যকরণী আসে সেই পথ ধরে। অ্যাডোর্নো তাই নান্দনিক দর্শনে সংশয় নয়, অন্তহীন পুনর্নির্মাণের প্রত্যয়ই ব্যক্ত করেছেন।

আলত্যুসের,ভাবাদর্শ এবং প্রসঙ্গকথা

ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক হিসেবে লুই আলত্যুসের বহুপঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের জটিল বয়ন অগ্রাহ্য করা যায় না আজও। আপাত-দৃষ্টিতে বিষয়টি সরল বলেই মনে হয়। কিন্তু যত আমরা আলত্যুসেরের প্রাসঙ্গিক বক্তব্য এবং ভাষ্যকারদের মন্তব্য সম্পর্কে অবহিত হই, কিছু সমস্যা দেখা দেয়। এর জন্য দায়ী আলত্যুসেরের মূলসূত্র নাকি ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যা — এই জিজ্ঞাসা জাগে আমাদের মনে। অবশ্য 'মূলসূত্র' কথাটি আক্ষরিকভাবে নিলেও মুশকিল । কারণ, প্রচলিত ধরনে ভাবাদর্শের অভিন্ন সংজ্ঞা আলত্যুসেরের কাছে পাওয়া যায় না। তাঁর 'For Marx' এবং 'Lenin and Philosophy'— এই দুটি বিখ্যাত বইয়ের নির্দিষ্ট কিছু অংশে ভাবাদর্শ সম্পর্কিত আলোচনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়োক্ত বইটির প্রাসঙ্গিক অধ্যায় তাঁর 'On Ideology' নামক সর্বাধিক আলোচিত সংকলনে 'Ideology and Ideological State Apparatuses' নামে পুনর্গৃহীত হয়েছে। প্রথমোক্ত 'For Marx.' বইতে তিনি মোটামুটি চারটি কার্যকরী সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন। তবে ভালভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি, আলত্যুসেরের দেওয়া সংজ্ঞায় কোনো চূড়ান্ত প্রস্তাবের আভাস নেই, বরং এদের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে নেওয়ার জন্যে পাঠকের প্রতি যেন গোপন আমন্ত্রণ আছে। পূর্ববর্তী মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদেরা এধরনের চেষ্টা করেননি, এই ভেবে আলত্যুসের এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে কেউ কেউ সমস্যায় পড়েছেন। কারণ, অনন্বয়ের ছায়ায় এদের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে না সহজে। যাই হোক , 'For Marx' বইতে ভাবাদর্শের প্রথম সংজ্ঞার প্রতি যদি দৃষ্টিপাত করি, দেখব, আলত্যুসের নিজেই যেন রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' গল্পের মেহের আলির মতো সতর্কবাণী উচ্চারণ করছেন : নিখুঁত সংজ্ঞার প্রত্যাশা যেন কেউ না করেন, এই অভিপ্রায়ও তাঁর নেই। তিনি শুধু জগৎ-ব্যাপারের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন কিছু মৌল সম্পর্কের সম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শের অন্তর্নিহিত পার্থক্য কীভাবে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়, তা অনুশীলন করাকে জরুরি মনে করেন তিনি। আলত্যুসের লিখছেন; 'There can be no question of attempting a profound definition of ideology here. It will suffice to know very schematically that an ideology is a system (with its own logic and rigour) of representations (images, myths, ideas or concepts depending on the case) endowed with a historical existence and role within a given society. Without embarking on the problem of the relations between a science and its (ideological) past, we can say that ideology,

as a system of representations, is distinguished from science in that in it the practico-social function is more important than the theoretical function (**function as knowledge)'** (১৯৬৯ : ২৩১)। এই বক্তব্য থেকে যে ব্যাপারটি স্পষ্ট হচ্ছে, তা হল এই যে প্রণালীবদ্ধ চিন্তা ছাড়া ভাবাদর্শের প্রকরণ অনুসরণ করা যায় না। ভাবাদর্শের নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলা আর কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা স্পষ্ট হয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তির মধ্যে। ধারণা ও ভাবনার অনুপুঙ্খ, প্রত্নকথা, চিৎপ্রতিমা প্রভৃতিতে আলত্যুসের বৌদ্ধিক উপস্থাপনার প্রয়োগ-পদ্ধতি লক্ষ করেছেন। কোনো নির্দিষ্ট সমাজে ঐতিহাসিক অস্তিত্ব ও ভূমিকার নিরিখে এদের বুঝে নিতে হয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নিয়ে যদি ভাবি, ভাবাদর্শগত অতীতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা এড়ানো যায় না। তবে আলত্যুসের এই বিশ্লেষণে না-গিয়ে ভাবাদর্শের প্রাথমিক সূত্রায়ন করেছেন এভাবে : জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রয়োগ-প্রস্থান হিসেবে বিজ্ঞানের বিপুল গৌরব থাকলেও বহুমাত্রিক উপস্থাপনার পদ্ধতি রূপে ভাবাদর্শের গুরুত্ব তুলনামূলক ভাবে বেশি তার সামাজিক প্রয়োগমূলক-কার্যকারিতার জোরে। মোদ্দা কথা এই, একদিকে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিকতা আর অন্যদিকে ভাবাদর্শের প্রয়োগ কেন্দ্রিকতা। পরবর্তী আলোচকেরা আলত্যুসেরের সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন ভেবেছেন, তাঁদের কিছু কিছু খটকা লেগেছে। যেমন, নৃতত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি মানবিকী বিদ্যার নিয়মিত শাখার মতো ভাবাদর্শের প্রকরণও কী স্বতন্ত্র একক বলে বিবেচ্য হতে পারে? এর মধ্যে তো স্পষ্টতই নানা উৎস-জাত ধারণা অন্যোন্য-সম্পৃক্ত।

তবে অনেক বেশি মৌলিক আপত্তি উঠেছে এখানে যে বিবিধ বৌদ্ধিক উপস্থাপনার প্রয়োগ-পদ্ধতি বলে যখন ভাবাদর্শকে সূত্রায়িত করা হলো, মার্ক্সবাদী হয়েও কার্যত ভাববাদী ঐতিহ্যের বাচনই ব্যবহার করলেন আলত্যুসের। ভাববাদী চিন্তার একান্ত নিজস্ব ধরনটি 'উপস্থাপনা'র ওপর গুরুত্ব আরোপ করার মধ্যে অন্তর্বৃত। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন তুলছেন ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব সম্পর্কে। এটা ঠিক যে, বেশ কিছু মার্ক্সবাদী বয়ানে তার উপস্থিতি ছায়াবৃত। কিন্তু যখন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় তার ভূমিকার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে, তা ছায়ামাত্র থাকছে না আর। মার্ক্সীয় যুক্তিশৃঙ্খলায় যাঁরা অতিনিয়ন্ত্রণবাদের ভূত দেখে আঁতকে ওঠেন, তাঁদের মতে ভাবাদর্শের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব আসলে ঘটনাপ্রবাহের অতিনিয়ন্ত্রণবাদী ব্যাখ্যার সঙ্গে যুক্ত। প্রকৃতপক্ষে এই আপত্তি স্থিতাবস্থাপন্থী ভাববাদী ভাষ্যকারদের বহু পুরোনো অস্ত্র। এভাবে তাঁরা ইতিহাস-নিরপেক্ষ বিমূর্ত অবস্থানের চিরাভ্যস্ত গোলকধাঁধায় ভাবাদর্শকে সম্পৃক্ত করতে চান। তাতে এর অন্তঃশায়ী শ্রেণী-উৎস ও শ্রেণি-চরিত্র সহ কার্যকরী হওয়ার ক্ষমতাও চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে, এই তাঁদের প্রত্যাশা। যাদুঘরের মহাসরীসৃপদের জীবাশ্মের মতো তখন ভাবাদর্শও হয়ে উঠবে নিরাপদ বৌদ্ধিক চর্চার

বস্তু। তবে ভাষ্যকারেরা আরো সমস্যায় পড়েছেন ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক কার্যকারিতার প্রতিতুলনায় সামাজিক প্রয়োগের কার্যকারিতাকে আলত্যুসের বেশি গুরুত্ব দেওয়ায়। তাঁদের বক্তব্য এরকম : মানবতাবাদকে যদি প্রায়োগিক উৎকর্ষের নিরিখে ভাবাদর্শ বলি, তার সুস্পষ্ট তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতকে অস্বীকার করব কোন্ যুক্তিতে? তাছাড়া, হেগেলের দৃষ্টান্ত যদি তুলে ধরা যায়, তাঁর চেয়ে কার রচনা তাত্ত্বিকতায় বেশি ঋদ্ধ! ভাববাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তাঁরা আরো বলছেন যে, এর প্রকট তত্ত্বসর্বস্বতার জন্যেই ফয়েরবাখ ও তরুণ মার্ক্স হেগেলের বিরোধিতা করে জানিয়েছিলেন, ভাববাদ নিছক তত্ত্ব মাত্র, প্রয়োগের মধ্যে তাকে যাচাই করা যায় না। তাহলে আলত্যুসের মার্ক্সীয় চিন্তাপ্রস্থানের শরিক হয়েও কীভাবে বললেন, কেবলমাত্র বিজ্ঞানই তত্ত্বনির্ভর এবং প্রচলিত প্রায়োগিক বিন্যাসের মূলে রয়েছে ভাবাদর্শ।

দুই

ভাবাদর্শ সম্পর্কিত আলত্যুসেরের দ্বিতীয় সংজ্ঞা-প্রয়াসে তরুণ মার্ক্সের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কেউ কেউ। অবভাস ও বাস্তবের পরস্পব-বিরোধিতার কাঠামোয় এই চিন্তাসূত্রকে বিচার করা যেতে পারে। তিনি বলছেন : 'মানুষ ও তার জগতের উপলব্ধ ও জীবনে অনুশীলিত সম্পর্কের মধ্যে ভাবাদর্শ প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অবচেতন বিষয় হিসেবে গৃহীত হওয়ার শর্তে এই সম্পর্ক যেমন সচেতন বলে প্রতিভাত হয়, তেমনি জটিল বলে উপলব্ধ হওয়ার শর্তে তা সরল বিন্যাস হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এ আসলে কোনো সরল ও প্রাথমিক পর্যায়ের সম্পর্ক নয়, একে বলা যেতে পারে বিভিন্ন সম্পর্কের অন্তর্বর্তী সম্বন্ধ, বস্তুত প্রাসঙ্গিক ইংরেজি শব্দবন্ধ 'lived relation' পারিভাষিক প্রয়োগ হিসেবে বিপুল পরিচিতি পেয়েছে। হুজের্ল ও মের্লোপঁতির অস্তিবাদী তত্ত্ববস্তুবিদ্যায় শব্দভাণ্ডারের কথাটি ঘুরে-ফিরে আসে। আলত্যুসেরের তির্যক প্রকাশভঙ্গিতে মূলত এই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে যে, ভাবাদর্শ সেই কাল্পনিক সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে থাকে যা কিনা যথাপ্রাপ্ত ও চলমান সম্পর্কের অভিব্যক্তি। তার মানে, বিভিন্ন মানুষেরা তাদের জগতের প্রতি যেমন সম্পর্ক গড়ে তোলে, তারই উপলব্ধি ও অনুশীলনের নির্যাস হল ভাবাদর্শ। এবিষয়ে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি এভাবে স্পষ্ট করেছেন আলত্যুসের : 'In ideology men do indeed express, not the relation between them and their conditions of existence, but the way they live the relation between them and their conditions of existence, this presupposes both a real relation and an 'imaginary', 'lived' relation. Ideology, then, is the expression of the relation between men and their 'world', that is, the

(overdetermined) unity of the real relation and the imaginary relation between them and theiı real conditions of existence. In ideology the real relation is inevitably invested in the imaginary relation, a relation that expresses a will (conservative, conformist, reformist or revolutionary), a hope or a nostalgia, rather than describing a reality', (1969 : 233-234).

নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষান্তরে উদ্ধৃত বক্তব্যের চেয়ে এই বয়ান অনেক বেশি সহজ ও স্বচ্ছন্দ। বাক্যের অন্তর্বর্তী শূন্যায়তন সহ যদি নিবিড় পাঠ করি, দেখব, আলত্যুসের যেন নিজস্ব সূত্রের বিশদ ব্যাখ্যার পথও নিজেই নির্দেশ করছেন। আমাদের প্রত্যেকের মনেই প্রচ্ছন্ন আছে জীবন-জগৎ-পারস্পরিক সম্পর্কের ঈপ্সিত আদল; অনিবার্য কিছু কিছু বিচ্যুতি সত্ত্বেও সাধারণত যাপিত জীবনে আমরা সচেতন ও অবচেতন ভাবে ঐ আদলটি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। বাস্তব যদিও বাস্তবই থেকে যায়, আদর্শ আকল্পকে আমরা প্রতিমার মতোই মান্যতা দিই। এবার আলত্যুসেরের সূত্রটি লক্ষ্য করলে দেখব, তিনি বলছেন, ভাবাদর্শের মধ্যে মানুষেরা নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক আর তাদের অস্তিত্বের শর্ত ও পরিবেশই প্রকাশ করে না কেবল, পূর্বনির্দিষ্ট সম্পর্ক-বিন্যাস ও অস্তিত্বগত পরিবেশ উপলব্ধির বিশেষ প্রকরণকেও ব্যক্ত করে। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের উপযোগিতা পরীক্ষিত ও পুনঃপরীক্ষিত হয়ে থাকে। কীভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে আমাদের জীবন ও মননকে সঞ্চালিত করব এবং অস্তিত্বের প্রেক্ষিতে তাদের সমন্বিত করব—এই জিজ্ঞাসা খুব মৌলিক। বস্তুসত্য ও ভাবসত্য একই সঙ্গে আমাদের জীবনে কার্যকরী। সম্পর্ক কখনো বাস্তব, কখনো বা কাল্পনিক। এদের ঐক্য-প্রতীতি অতিনির্ধারিত কিনা অর্থাৎ এদের মধ্যে কোনো আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য সম্ভব কিনা এবং কতদূর তা গ্রাহ্য— এইসব কূটপ্রশ্নও এড়ানো যায় না। আলত্যুসের ভাবাদর্শের মধ্যে কাল্পনিক সম্পর্ক-বিন্যাসে আধারিত বাস্তব সম্পর্কের বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করেছেন। তাঁর চিন্তাসূত্র অনুসরণ করে আমরা সম্পর্কবোধে অন্তর্নিহিত দ্বিবাচনিকতার সন্ধান পাই যেন। এতে অভিব্যক্ত হচ্ছে এক আকাঙ্ক্ষা যা রক্ষণশীল, সাযুজ্যবাদী, সংস্কারপন্থী বা বৈপ্লবিক আবেগসম্পন্ন। ঐ সম্পর্ক নিছক বাস্তবতার বিবরণ না-দিয়ে আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাশা বা স্মৃতিপীড়া প্রকাশ করে থাকে।

প্রশ্ন এই, উপলব্ধ সম্পর্কের এই ধারণাকে শুধুমাত্র কাল্পনিক প্রকরণের মধ্য দিয়ে যদি যাচাই করে নিতে হয়— জীবন ও জগতের সঙ্গে নিরন্তর বিনিময়ের মধ্যে অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন কি তবে পূর্ব-নির্ধারিত আকল্পের বাইরে সম্ভব নয় আদৌ ! এই বয়ানে তরুণ মার্ক্সের বক্তব্য থেকে আলত্যুসের অনেকটা দূরে সরে গেছেন নাকি ! কারণ, তরুণ মার্ক্স বাস্তব আর কাল্পনিক অস্তিত্বকে পরস্পর-বিরোধী ভেবেছেন; কিন্তু

আলত্যুসের অভিজ্ঞতা আর কাল্পনিকতাকে অন্যোন্যসম্পৃক্ত করে তুলেছেন। তার মানে, কোনো ভাবাদর্শ যুগপৎ অভিজ্ঞতায় বৃত এবং কাল্পনিক; ফলে তাকে বলা যেতে পারে কাল্পনিক বলে গৃহীত যাপিত বাস্তব। অতএব আমরা এমন-এক ধরনের বাস্তব সম্পর্কের মুখোমুখি হচ্ছি যা কিনা কাল্পনিক সম্পর্কের মধ্যে কিছুটা তির্যক হয়ে পড়ছে। কিন্তু এ ধরনের সংজ্ঞা সম্পর্কেও ভাষ্যকারদের সমস্যা হয়েছে। কেননা আলত্যুসের যখন বাস্তব সম্পর্কের কথা বলেন, তা কিন্তু রক্তমাংসের বাস্তব ব্যক্তিদের কথা ভেবেই বলেন। কিন্তু তাত্ত্বিক বাচনের মধ্যে বাস্তব ব্যক্তিদের মৌলিক উপজীব্য করা চলে না। কোনো মানুষ যখন বাস্তব জীবন যাপন করে, সে-সময় তার অস্তিত্বের প্রকরণ যেমন থাকে — সেই একই মানুষ যখন স্বপ্ন দেখে বা কল্পনা করে, তার অস্তিত্বের অনুষঙ্গ কিন্তু বদলে যায়। দু'টি ক্ষেত্রে ভাবাদর্শ কার্যকরী হলেও এদের পদ্ধতি ও অভিব্যক্তি ভিন্ন হতে বাধ্য। যখন সংজ্ঞার সূত্রায়ন করি, তার আঁটোসাঁটো গাঁথুনির মধ্যে এত সব কৌণিকতা ও উচ্চাবচতার প্রতি সুবিচার করা সহজ নয়।

মার্ক্সীয় চিন্তাবৃত্তে অতিনিয়ন্ত্রণের ধারণা সাধারণত অবসংগঠন ও অধিসংগঠনেব বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে বিতর্কেরও অভাব নেই। আলত্যুসের কিন্তু পুরোনো প্রসঙ্গে ধারণাটি ব্যবহার করেননি; বাস্তব ও কাল্পনিক বিষয়ের সম্পর্ক অনুশীলনের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করেছেন। কোনো কোনো ভাষ্যকার এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন ফ্রয়েডীয় ভাববৃত্তের ছায়া। বাস্তব ও কাল্পনিকের সংমিশ্রণ মূলত সাহিত্যিকের সৃষ্টি-প্রতিভায় বেশি প্রাসঙ্গিক, একথা আমাদের মনে হয়। আলত্যুসেব লিখছেন : 'It is this over-determination of the real by the imaginary and of the imaginary by the real that ideology is active in principle.' (তদেব : ২৩৪)। আসলে 'অতিনিয়ন্ত্রণ' শব্দটি অনেকের মনেই বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি কবে। তাঁরা ভাবেন, এতে চিন্তার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়, পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণা গ্রহীতার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আলত্যুসের একথা বলতে চান যে, ভাবাদর্শ রুদ্ধ-পরিসর ধারণা নয়, বরং বিপরীতের সমন্বয় বা সংশ্লেষণ সম্ভব বলে তার মধ্যে রয়েছে মুক্তির প্রতিশ্রুতি। তাই আর যাই হোক, তাকে মন্দ ভাবা চলে না। চিন্তার প্রগতি দিয়ে চিহ্নায়িত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে ভাবাদর্শকে আমরা বর্জ্যবস্তু হিসেবে পেছনে ফেলে আসি না। বরং একে বলা যেতে পারে অনমনীয় নিয়মের বহির্ভূত এক সৃষ্টিশীল প্রেরণা যা আমাদের অনবরত উৎসাহ যোগায় এবং সামনের দিকে এগিয়ে দেয়। বাস্তব ও অবাস্তবের পরিধি যদি অতিব্যক্ত হত এবং এদের মধ্যেকার লক্ষ্মণের গণ্ডি যদি অনতিক্রম্য হত— তাহলে যান্ত্রিকতার প্রভাব কিছুতেই এড়ানো যেত না। কিন্তু এদের মধ্যে যেহেতু স্পষ্ট বিভাজন

নেই, ভাবাদর্শ সৃষ্টিশীল প্রেরণার প্রকরণ হিসেবে বিকশিত হয়ে চলেছে।

তিন

বাস্তব ও কাল্পনিকের সম্পর্ক-বিন্যাসের সূত্রে যেমন ভাবাদর্শকে বুঝি, তেমনি তাকে আলাদাভাবে বুঝে নিতে হয় বাস্তব ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সূত্রে। অর্থাৎ প্রশ্নটা দাঁড়ায় খোদ ভাবাদর্শের বাস্তবতা নিয়ে। বাস্তব সত্তা হিসেবে ভাবাদর্শকে ব্যক্ত হতে হবে বাস্তব দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে, বহুস্তরে বিন্যস্ত বাস্তব উপাদানের অভিব্যক্তিতে ও বাচনে। একটু আগে আমরা যে প্রাসঙ্গিক কাল্পনিক উপাদানের কথা বলেছি, নিশ্চিতভাবে তা যথেষ্ট নয়। অন্তত আলত্যুসেরের তৃতীয় সংজ্ঞাসূত্রে দেখা যাচ্ছে যে কাল্পনিকের মধ্যে নিহিত রয়েছে এক ধরনের অস্তিত্বশূন্যতা। পরবর্তী পর্যায়ে আলত্যুসের যখন তাঁর বহু-আলোচিত ভাবাদর্শগত কৃৎকৌশল বিষয়ক নিবন্ধটি লিখলেন, দেখা গেল, তিনি নিজের দেওয়া সংজ্ঞাকে খানিকটা পরিমার্জিত করে নিচ্ছেন যাতে ভাবাদর্শ যুগপৎ অবভাস এবং ঐতিহাসিক অস্তিত্বের উপকরণগুলিকে আত্মস্থ করে নিতে পারে। তাঁর মতে ভাবাদর্শগত কৃৎপ্রকরণ নিহিত থাকে বস্তুভিত্তিতে ও বস্তুসত্তায় যা কিনা মানুষের স্বপ্ন ও কল্পনাপ্রতিভাকে যথেষ্ট পরিমাণে বাস্তব অস্তিত্বে সম্পৃক্ত করতে পারে। আসলে 'For Marx' লেখার সময় বিভিন্ন সংজ্ঞাসূত্রের মধ্যেকার সূক্ষ্ম অসামঞ্জস্য মীমাংসা করতে পারেননি আলত্যুসের। আমরা আলোচ্য তৃতীয় সংজ্ঞায় দেখছি, ভাবাদর্শ সম্পর্কিত পূর্ববর্তী বাচন কিছুটা বদলে গেছে। তিনি এবার অভিজ্ঞতায় বৃত প্রত্যয় থেকে দৃষ্টান্তমূলক প্রত্যয়ে পৌঁছেছেন। লক্ষণীয় ভাবে এই পর্যায়ে আলত্যুসেরের বাচন থেকে বিমূর্ত দ্যোতনা অনেকখানি ঝরে গেছে। ফলে তাঁর বক্তব্যে এসেছে ঋজুতা ও স্পষ্টতা : 'So ideology is as such an organic part of every social totality. It is as if human societies could not survive without these specific formations. These systems of representations (at various levels), their ideologies, human societies secrete ideology as the very element and atmosphere indispensible to their historical respiration and life. Only an ideological world outlook could have imagined societies without ideology and accepted the utopean idea of a world in which ideology (not just one of its historical forms) would disappear without trace. to be replaced by science.' (তদেব : ২৩২)।

এখানে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা হয়েছে। প্রতিটি সামাজিক সমগ্রতায় ভাবাদর্শ উপস্থিত জৈব সাংগঠনিক উপাদানের মতো অর্থাৎ তা সমাজ-সত্তার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য। মানুষের সমাজ বহু সহস্রাব্দ ধরে অজস্র স্তর-পরম্পরায় যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে, তা অনুশীলন করে মনে হয়, নির্দিষ্ট সময়-পরিধিতে সুনির্দিষ্ট অন্তঃসার হিসেবে ভাবাদর্শ

প্রতিটি স্তরের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিতে উপস্থিত। সমাজে স্বতশ্চল ভাবে কিছু নির্দিষ্ট আকরণ গড়ে ওঠে প্রয়োজনের তাগিদে। এইসব নির্দিষ্ট গঠনের বাইরে মানুষের সমাজ টিকে থাকতে পারে না। এই নিবন্ধের অন্যত্র যে-সমস্ত উপস্থাপনাকে সামাজিক অস্তিত্বের বিভিন্ন স্তরে প্রত্নকথা আদিকল্প কিংবদন্তি হিসেবে সক্রিয় হওয়ার কথা বলেছি— তাদের মধ্য দিয়েই সামাজিক সমগ্রতার উপলব্ধি ভাবাদর্শের নির্যাসকে ধারণ করে। একটা পরিচিত দৃষ্টান্ত দিয়ে আলত্যুসেরের বক্তব্যকে খানিকটা স্পষ্ট করা যেতে পারে। মৌচাক থেকে মধু কিংবা খেজুর গাছ থেকে রস যেভাবে ক্ষরিত হয়ে থাকে, তেমনি মানুষের সমাজের বিচিত্র আকরণ থেকে ভাবাদর্শ জীবনের মৌল উপকরণ ও আবহ হিসেবে নিয়ত বিচ্ছুরিত হয়। জৈব সংস্থানের পক্ষে শ্বাস-প্রশ্বাস যেমন অপরিহার্য, সামাজিক জীবনের পক্ষে ভাবাদর্শ তেমনি অনিবার্য। আমরা যখন বিশ্ববীক্ষার কথা বলি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনিবার্য কিছু পক্ষ নেওয়ার কথা বলি— ভাবাদর্শ তখনই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গী হয়ে ওঠে। একথার যদি আরো গভীরে যাই, দেখব, আমাদের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ভাবাদর্শই মূল সঞ্চালক শক্তি। তার মানে, ভাবাদর্শ বর্জিত কোনো সমাজের কল্পিত অভাবকেও বুঝে নিতে হয় কোনো-না-কোনো ভাবাদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে। তর্কের খাতিরেও যদি আমরা এই ইউটোপীয় ধারণাকে মেনে নিই যে এমন কোনো জগৎ সম্ভব যাতে ইতিহাসের সমস্ত আখ্যান ক্রমশ শূন্যে মিলিয়ে যাবে এবং ভাবাদর্শও পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এবং ভাবাদর্শের স্থান নেবে বিজ্ঞান— সে-ক্ষেত্রেও ভাবাদর্শ ও প্রতিভাবাদর্শের দ্বিবাচনিকতা আমরা এড়িয়ে যেতে পারব না।

এভাবে আলত্যুসেরের বক্তব্য নিবিড় পাঠ করে আমরা ভাবাদর্শের প্রতি প্রবল ইতিবাচক দৃষ্টিকোণের মুখোমুখি হই যেখানে সামাজিক সংবেদনায় ভাবাদর্শের অপরিহার্যতা উপলব্ধির পক্ষে জোর সওয়াল করা হয়েছে। 'For Marx' থেকে তিন দশকের দূরত্বে দাঁড়িয়ে দেখছি, ক্রমাগত জটিলতর-হওয়া বিশ্বপ্রেক্ষিতে অসংখ্য স্তরে শুধু তথ্য ও তত্ত্বের অনন্বয়, বিশ্বাসের অপমৃত্যু, সূক্ষ্মতার বিলয়, প্রত্যাশার বিপর্যয় এবং সর্বগ্রাসী যন্ত্র -প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ। সাময়িক প্রয়োজনের নিরিখে সব কিছুই বিচার্য এখন। জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে যন্ত্র-প্রযুক্তির উৎকর্ষ ছায়াপাত করেনি। অনেকেই এই ধারণায় বিশ্বাসী যে ইদানীং আমরা ভাবাদর্শের যুগকে পুরোপুরি পেছনে ফেলে এসেছি এবং এখন আমরা স্বচ্ছন্দে সমস্ত ভাবাদর্শের মৃত্যু নিয়ে নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক আলোচনা শুরু করে দিতে পারি। বিশেষত আধুনিকোত্তরবাদ যখন অজস্র বিভঙ্গের মধ্য দিয়ে মানুষের মৌল মানবিকতাই নস্যাৎ করে দিতে চাইছে, সে-সময় আলত্যুসেরের ভাবাদর্শ বিষয়ক চিন্তাসূত্রের নিবিড় পুনঃপাঠ অত্যন্ত জরুরি।

নিজস্ব সময়-প্রেক্ষিতের প্রতি সচেতন থেকেই যদিও তিনি সন্দর্ভকে নির্মাণ করেছেন, বিশ শতকের বিলীয়মান প্রহরের উৎকণ্ঠা-যন্ত্রণা-স্ববিরোধিতা-কূটাভাসে কিছু কিছু চিন্তাসূত্র উদ্ভাসনী আলো হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আলত্যুসের এই নিশ্চয়তা আমাদের দিতে চান, মানুষের পৃথিবী জুড়ে স্রোত ও প্রতিস্রোতের যত সংঘর্ষই ঘটুক না কেন—ভাবাদর্শ চিরকাল ছিল, চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। এর কারণ হিসেবে অত্যন্ত সহজ, সরল ও মৌলিক এই সত্যের কথা বলা যায় যে মানুষ যতদিন তাদের জীবন যাপনের অর্থ খুঁজবে, ততদিন অক্ষুণ্ণ থাকবে ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা। গুহাবাসী আদিম মানুষ যখন প্রকৃতির বিপুল উপস্থিতির মধ্যে নিজের জীবনের বিবর্তনশীলতা থেকে অপার বিস্ময়ে নানাভাবে অর্থ খুঁজত তখনও ছিল ভাবাদর্শ। সভ্যতার স্তরে স্তরান্তরে নিজেকে যত সমৃদ্ধ করেছে মানুষ এবং নবার্জিত সমৃদ্ধির আদলে বারবার নতুন করে অস্তিত্বের অর্থ খুঁজেছে, ভাবাদর্শই ছিল তার সন্ধানের মৌল আধেয়। তেমনি তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনা-মুহূর্তে দাঁড়িয়ে যারা আজ আধুনিক-আধুনিকোত্তর-উত্তরাধুনিক জগতের নিষ্কর্ষ নিয়ে কূট তর্ক করছে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির যাবতীয় পূর্বাগত আকরণের ধ্বংস ঘোষণা করছে— তারাও জীবনেব প্রকট অর্থহীনতার মধ্যে তাৎপর্য-ই খুঁজে চলেছে। তার মানে, ভাবাদর্শের অনুপস্থিতি উপস্থিতি। বাঙালির পরিচিত একটি প্রবচনের ভাষায় বলতে পারি, 'মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরি ।'

চার

জীবন-যাপনের মধ্যে অর্থ খোঁজার এই প্রক্রিয়া তো বিজ্ঞানের একক এলাকা নয়! বিজ্ঞান জীবনের অনেক দিক ছুঁয়ে থাকে নিশ্চয়, কিন্তু তাই বলে তাকে তো আর সর্বার্থসাধক বলা যায় না। জীবন থেকে নির্যাস ছেঁকে নেওয়া বা ঐ নির্যাসের সঞ্চালক আদলকে বুঝিয়ে দেওয়া ভাবাদর্শেরই দায়। একটু আগে লক্ষ্য করেছি, আলত্যুসের চেয়েছেন ইতিবাচক প্রতীতি। কিন্তু তাঁর দ্বিতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী সমাজের বাস্তব ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সমান্তরাল ভাবে ভাবাদর্শকে যদি অবভাস বলেও ভেবে নিতে হয়, একটু সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে জীবনকে 'স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু' বলে মনে হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু স্বপ্ন বা মায়া বা মতিভ্রম বা এক কথায় প্রকল্প তো বাস্তবের বিপ্রতীপ পরাঅস্তিত্ব। একে সাধারণ সত্য বলি কী করে? বাঙালি কবি জীবনানন্দ চেতনার পরাগতি অনুভব করে লিখেছিলেন : 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে।' নীৎশের বক্তব্যও ছিল এরকম : জীবনের কঠোর কর্কশ বাস্তবের মধ্যে টিকে থাকতে হলে আমাদের চাই স্বপ্ন, চাই অবভাস। খানিকটা বাখতিনের সুর যেন বেজে ওঠে আবশ্যিক অপরতার সমান্তরাল উপস্থিতি বিষয়ক এই ধারণায় । মানব-অস্তিত্বের প্রকৃত সত্য যদি আমরা দেখতে চাই,

যেতে হবে মৃত্যুর প্রান্তে। উপলব্ধির দ্বিবাচনিকতা যেন সূত্রাকারে রয়েছে এই বিশ্লেষণে। প্রশ্নটা আসলে সমগ্রতার, অন্য কিছুর নয় । মৃত্যু জীবনকে দেয় সম্পূর্ণতা, আর দেখার জন্যে ঈপ্সিত সেই নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব। তার মানে কি তবে এই যে, ভাবাদর্শের গাঁটছড়া বাঁধা জীবনেরই সঙ্গে অথচ তার প্রকৃত তাৎপর্য বোঝার জন্যে আমাদের যেতে হবে জীবন পেরিয়ে। এর মধ্যে তাহলে দেখতে পাই নেতিবাচক ও নৈরাশ্যবাদী দৃষ্টিকোণ, যার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় এই ব্যঞ্জনা যে বিজ্ঞান জীবনের অর্থ বুঝতে সাহায্য করে না বলেই মানুষ ভাবাদর্শের প্রয়োজন অনুভব করে। যাঁরা মনে করেন কোনো একদিন বিজ্ঞান ভাবাদর্শের স্থান নিয়ে নেবে, আলত্যুসের তাঁদের ইউটোপীয় ধারণার শিকার বলে মনে করেছেন। তাঁর বক্তব্য নীতিশাস্ত্রের নির্যাস হলো ভাবাদর্শ, তাকে সরিয়ে দিয়ে বিজ্ঞান কোনোদিন তার জায়গা নেবে বা নীতিশাস্ত্র স্বয়ং খোলনলচে পাল্টে বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের বিষয় হয়ে উঠবে —এই ধারণা ইউটোপীয়, কেননা তার কোনো ভিত্তি নেই। তেমনি কেউ যদি মনে করেন, বিজ্ঞান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে ধ্বংস করবে বা কোনো উপায়ে তার জায়গা নিয়ে নেবে কিংবা শিল্প মিশে যাবে জ্ঞানের সঙ্গে বা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার বিষয় হয়ে উঠবে—তাহলে তাদেরও একইভাবে ইউটোপীয় বলে গণ্য করতে হবে। (তদেব : ২৩২)

গত তিরিশ বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় আলত্যুসেরের বক্তব্য বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে যেন। এখানে যদিও বিস্তারিত ব্যাখ্যার কোনো অবকাশ নেই, তবুও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের ঘটনা-প্রবাহ প্রমাণ করে, ভাবাদর্শের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপযোগিতার উপর প্রথম বিশ্বের আধিপত্যবাদী শক্তি যখন সুপরিকল্পিত ভাবে আক্রমণ শানিয়েছিল, ভোগবাদ ও পণ্যায়নের তুমুল প্রচার ছাড়াও ধর্মীয় সংস্কার উসকে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান হাতিয়ার। পোল্যাণ্ডে স্পষ্টভাবে এবং অন্যান্য দেশে গৌণভাবে গির্জার ভূমিকা দেখিয়ে দিয়েছে যে, বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের দিনেও ধর্মতন্ত্র নতুন নতুন উপায়ে তার শেকড় ছড়িয়ে দিতে পারে। সুতরাং ভাবাদর্শ হোক বা ছদ্ম-ভাবাদর্শ, বিজ্ঞান তার স্থান দখল করতে পারে না কখনও। বরং প্রতাপ-সর্বস্ব শ্রেণির চক্রান্তে বিজ্ঞান ছদ্ম-ভাবাদর্শকে সঙ্গে নিয়ে চলে। নব্বই-এর ঘটনা-প্রবাহ যদি চুলচেরা বিশ্লেষণ করি, দেখব, উত্তর-সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নতুন নতুন কল্পমায়া তৈরি করে ভাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা মুছে ফেলতে চাইছে। প্রতিভাবাদর্শ দিয়ে অনবরত অন্তর্ঘাত করছে ভাবাদর্শে যাতে মানুষের যুগযুগান্তর ব্যাপ্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে ধ্বস্ত করে দিয়ে কার্যত না- মানুষ এবং যান্ত্রিক জীবন ও যন্ত্র-সর্বস্ব জগতের প্রতিষ্ঠা ঘটতে পারে। নীতিশাস্ত্র ও শিল্পকলা পুনর্গঠিত হচ্ছে তারই মাপে। কিন্তু আলত্যুসেরের সংজ্ঞা-সূত্র দিয়ে এহেন উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্ব-পরিস্থিতিরও বিশ্লেষণ সম্ভব। মনে রাখতে হবে শুধু এই

কথা যে ভাবাদর্শের তাৎপর্য-পরিধিকে আজ বাড়িয়ে দিতে হবে অনেক গুণ, তার আলো-অন্ধকার ছায়া- প্রচ্ছায়া সমেত। সুতরাং ভাবাদর্শকে নিঃশেষে মুছে ফেলা অসম্ভব, পুরোপুরি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তা অব্যাহত রাখে তার নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়ন সন্ধানের প্রক্রিয়া। এক গোত্রের চিহ্নায়ক মুছে যায় হয়তো, কিন্তু অচিরেই তার স্থান নেয় অন্য গোত্রের চিহ্নায়কেরা। যতদিন মানুষের পৃথিবী থাকবে, বিদূষণের হাজার সন্ত্রাস সত্ত্বেও এই প্রক্রিয়ার অন্ত হবে না কখনও।

যাঁরা মনে করেন নীতিশাস্ত্র, শিল্পকলা ও ধর্মীয় দর্শন নিতান্তই পেছনে ফেলে-আসা প্রাক্-বৈজ্ঞানিক যুগের নাছোড়বান্দা অবশেষ মাত্র, তাঁরা অভিজ্ঞতায় লব্ধ ব্যবহারিক জগৎকে অকারণে উপেক্ষা করেন। কেননা এ সমস্ত যে-কোনো সমাজের অপরিহার্য উপকরণ। আজকের দিনে বিজ্ঞান নিশ্চয় আমাদের জীবনে অনেক কিছু, কিন্তু তা কখনো সব কিছু হতে পারে না। ভাবাদর্শের অনিবার্য উপস্থিতি সম্পর্কে সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কারণ তা যুগপৎ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সত্য। তাছাড়া অন্য আরেক দিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের সার্বিক উপস্থিতি সত্ত্বেও আমাদের অস্তিত্বকে যদি বিজ্ঞানসর্বস্ব বলে ভাবি, তাহলে তা মানুষের আওতার বাইরে চলে যাবে। অর্থাৎ চরম বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির চোখ-ধাঁধানো মন-ভোলানো উপস্থিতি হয়ে উঠবে কার্যত প্রভুত্ববাদ এবং আমরা মুগ্ধভাবে তার কাছে আত্মসমর্পণ করব। ব্যবহারকারীর তুলনায় আয়ুধ যখন বড়ো হয়ে ওঠে, তা নব্য বৌদ্ধিক সন্ত্রাসের জন্ম দেয় এবং সমস্ত উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ঝাপসা হতে হতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। আজকের আধুনিকোত্তর জগতে আমরা যে প্রায়ই প্রতিজগতের প্রকাণ্ড ছায়া দেখে আঁতকে উঠছি, এর কারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন আর সর্বমানবের আয়ত্তাধীন নয়। প্রথম বিশ্বের মুষ্টিমেয় প্রতাপভোগী বর্গের হাতিয়ার হিসেবে তা মানবিক নির্যাসকেই অনিকেত করে দিচ্ছে।

অবশ্য কেউ কেউ বলবেন, বিজ্ঞান সম্পর্কিত আমাদের ধারণাকে যদি আমরা বেশ কিছুটা উঁচু তারে বেঁধে নিই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ভাবাদর্শের ক্ষেত্রও ব্যাপকতর হয়ে উঠবে। কেননা এদের বুঝে নিতে হয় পারস্পরিক ইতিবাচক ও নেতিবাচক সম্পর্কের ভিত্তিতে। কোনো তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনের ওপর যদি বেশি গুরুত্ব আরোপ করি, তাহলে দৈনন্দিন জীবন-যাপনের তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে তার ক্ষমতাকে হারিয়ে ফেলি। ফলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে ভাবাদর্শের ক্ষেত্র অনেকটা প্রসারিত হতে পারে যেহেতু বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের ক্ষেত্র সীমিত। আলত্যুসের এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এভাবে লক্ষ্য করেছেন কারণ ভাবাদর্শকে তিনি মূলত স্থির ও অনড় বলে ভাবেননি। ব্যক্তি-সত্তা ও সামাজিক সত্তার অনির্ণেয় পরিস্থিতিতে ভাবাদর্শ হয়তো সত্য হয়ে ওঠার

জোরটুকু সর্বদা আয়ত্ত করতে পারে না কিন্তু তবু তাকে অন্তত প্রয়োজনীয় অবভাসের আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে হয়। কথাটি আরো বিশদ করে বলতে পারি, এই বিশ্বাসের সজীবতা যদি না থাকত, মানুষের ইতিহাসে তিতিক্ষা ও ঐকান্তিকতা জাতীয় শব্দের কোনো অর্থই থাকত না। এই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সম্ভবত একথাও বলা চলে যে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকট ঘাটতি দেখা দেওয়ার ফলেই মুখ্যত সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশে এবং গৌণত অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্র সন্ধানী অংশের মধ্যে আমাদের দেখতে হলো উল্টোরথের পালা আর ইতিহাসের প্রত্যাখ্যান।

পাঁচ

এই প্রেক্ষিতে আমাদের মনে পড়ে মার্ক্সের একটি পরিচিত বক্তব্য : শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসক বর্গের ভাবাদর্শই আধিপত্যবাদের নিজস্ব যুক্তিশৃঙ্খলায় সর্বজনীন মান্যতা ও মর্যাদা অর্জন করে নেয়। এর কারণ, সমাজের গভীরে প্রোথিত থাকে ঐতিহাসিক ভাবে নির্মিত ও নির্ধারিত এমন-কিছু প্রকরণ, যার সাহায্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রচারিত হতে থাকে শ্রেণি-প্রভুদের মহিমা এবং তাদের উপযোগী সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও ধর্মাচার। আধিপত্যবাদীদের ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরক, বাস্তব-কল্পনা এমন সর্বগ্রাসী যে তাদের দ্বারা নির্মিত ও নির্দিষ্ট জগৎ আর জীবনের অভিজ্ঞান হয়ে ওঠে দীন অভাজনদেরও আবশ্যিক মান্যতার বিষয়। আরোপিত এই সার্বভৌমতা যুগ যুগ ধরে গোটা সমাজের ভাবাদর্শ হিসেবে বিনাপ্রশ্নে ও নির্বিচারে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য সন্ত্রাসে পুরোপুরি প্রান্তিকায়িত জনদের প্রয়োজনও একই উৎস থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সচেতন ও অবচেতন ভাবে আরোপিত সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে বহুধা-বিভক্ত সমাজের অন্তেবাসীবর্গ। কয়েক প্রজন্মের নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাসে কোনো আকরণ যখন নিগড়ে পরিণত হয়, তাকে আর চাতুর্য বা কৌশল দিয়ে কিংবা পরিশীলিত মিথ্যার সাহায্যে আরোপ করতে হয় না। বাস্তবের সঙ্গে সমান্তরাল কাল্পনিক উপস্থিতির আকরণ এত শক্তিশালী ও অনিবার্য হয়ে ওঠে যে বহুধা-বিভাজিত সমাজে তা বাস্তবকে অনায়াসে নিজের মাপে তৈরি করে নিতে পারে।

সামাজিক মনস্তত্ত্বের আদলও এমনভাবে গড়ে ওঠে যে চিন্তা-বিশ্বাস-অনুভূতি অভ্যাসবাহিত সত্যের ধারণাকেই খাঁটি সত্য বলে জানে। একটু আগে যে অবভাসের কথা লিখেছি , তা এভাবেই প্রয়োজনের সংজ্ঞা ও চরিত্র নির্ধারণ করে এবং সত্য ও ছদ্মসত্য এভাবে জটিল বুনটের মধ্য দিয়ে ভাবাদর্শেরও সামাজিক ভিত্তি গড়ে নেয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই একই অবভাস সক্রিয় ছিল, এই বক্তব্যের তাৎপর্য আলত্যুসেরের প্রতিবেদন থেকে বিচ্ছুরিত চিন্তাসূত্রের আলোয় গভীর নিষ্কর্ষ বয়ে আনে যেন। ভাবাদর্শ

বিষয়ে মায়া কী তবে এতদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, সমান্তরাল বাস্তব শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যাত হয়ে গেল ? অথবা অন্তর্ঘাত এমন আত্মবিদারক হয়ে উঠল যে, প্রকৃত বাস্তব আর কল্পিত বাস্তবের ভার বইতে পারল না! অবসংগঠন থেকে অধিসংগঠনের ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা কী এতটাই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, পারস্পরিক সংযোগসূত্র হারিয়ে এরা সম্বন্ধ-সংস্থাপক ভাবাদর্শ সহ মুছে গেল অচিরেই ? এইসব প্রশ্ন যখন উঠে আসে নতুন নতুন জটিল জিজ্ঞাসা নিয়ে, আমরা যেন ভাবাদর্শের অনন্ত সম্ভাবনাই আবিষ্কার করি। কেননা শ্রেণিদ্বন্দ্বে বিক্ষত সমাজগুলিতেও ঐতিহাসিক ভাবে বিবর্তিত হয়েছে ভাবাদর্শের অজস্র বিভঙ্গ, আবার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে দেখেছি ভাবাদর্শের কত বিচিত্র কৌণিকতা ও উচ্চাবচতা। শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থার যে-আকল্পটি আমাদেব মননে ও স্বপ্নে রয়েছে, তার মধ্যেও কিন্তু ভাবাদর্শের অবৈখিকতা এবং অবভাস ও বাস্তবের দ্বিবাচনিকতা অনিবার্য সত্য। শ্রেণীহীন সমাজের রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনা না-করেও আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সম্ভাবনার সূত্রে তার পরিসর অনন্ত বলেই ভাবাদর্শের তরঙ্গভঙ্গ এবং অবভাসের দ্বিবাচনিক উপস্থিতি অনস্বীকার্য।

অবশ্য এই অনন্ত ও চিরন্তনের নির্যাস নিয়ে প্রতিপ্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। আমরা শুধু লক্ষ্য করব, আলত্যুসের ভাবাদর্শের কৃৎপ্রকরণ বিষয়ক প্রখ্যাত নিবন্ধে এই চিরন্তনতা নিয়ে ভেবেছেন। সেখানে একে ফ্রয়েড-কথিত অবচেতনের সময়-শূন্যতা বিষয়ক ধারণার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আলত্যুসের লিখেছেন : 'It is clear that ideology (as a system of mass representations) is indispensable in any society if men are to be formed. transformed and equipped to respond to the demands of their conditions of existence.' (তদেব : ২৩৫) । এই বক্তব্যকে যদি ব্যাখ্যা করি, তাহলে দেখব , মানুষেরও একটি কার্যকরী সংজ্ঞা এখানে দেওয়া হয়েছে এবং তারই নিরিখে ভাবাদর্শও বিচার্য হয়ে উঠছে। এর আগে যেসব সংজ্ঞা-সূত্র নিয়ে আলোচনা করেছি, তাদের চেয়ে খানিকটা আলাদাভাবে, ভাবাদর্শকে গণ-উপস্থাপনার পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করা হলো। মানবিক অস্তিত্বের প্রেক্ষিত ও তৎসংশ্লিষ্ট উপকরণের বিন্যাস থেকে অহরহ যে-সমস্ত দাবি জীবনের কাছে উত্থাপিত হচ্ছে, তাদের প্রতি উপযুক্ত সাড়া দেওয়াই মানুষের দায়। বস্তুত এই সাড়া দেওয়ার ক্ষমতাতেই মানুষের মানবিক অস্তিত্বের সার্থকতাও প্রমাণিত হচ্ছে। মানুষকে যদি তার ঈপ্সিত জগৎ গড়ে তুলতে হয় বা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রূপান্তরিত করতে হয়—তাহলে তাকে অস্তিত্বের শর্ত ও দাবি পূরণ করার জন্যে উপযুক্ত কৃৎকৌশল রপ্ত করতেই হবে। ইতিহাসের যে পর্যায়েই থাকুক না কেন, প্রতিটি সমাজে এই প্রক্রিয়া অনিবার্য। আর, তাই ভাবাদর্শের গুরুত্বও স্বতশ্চলভাবে প্রমাণিত। সময়ের স্বভাব যত পরিবর্তিত হোক না কেন, এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম নেই। এই সূত্রে

ভাবাদর্শকে সময়-নিরপেক্ষ বলা যেতে পারে। একদিকে বাস্তবতার বিভিন্ন দাবি এবং অন্যদিকে তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা—এদের মধ্যে সর্বদা সামঞ্জস্য থাকে না। প্রতিটি সমাজে এমন পরিস্থিতি থাকা সম্ভব। এমনকি তেমন কোনো সমাজ যদি সত্যিই চোখে পড়ে যেখানে শ্রেণি-সংঘর্ষ আর নেই, সেখানেও চোখে পড়বে, বাস্তবতা ও তার মুখোমুখি হওয়ার ক্ষমতার মধ্যে রয়ে গেছে দুরপনেয় অনন্বয়। আসলে আমাদের ক্ষমতা কখনো বাস্তবতা ও অবভাস কিংবা আকাঙ্ক্ষা ও জীবনের মধ্যে সেতু গড়ার পক্ষে পর্যাপ্ত হয় না। আমরা যতটুকু ভাবতে পারি, তার চেয়েও ঢের বেশি মূল্য দিয়ে বাস্তবকে জানতে হয়। মৃত্যু ও জীবনের কঠোরতা সম্পর্কে ফ্রয়েড যে-সমস্ত মন্তব্য করেছিলেন, এখানে হয়তো সেসব মনে পড়বে আমাদের। মানুষের ক্ষমতা অন্তহীন, একথা ঠিক, কিন্তু সেই ক্ষমতার চেয়েও প্রকৃত বাস্তবতা অনেক বড় বলে এর সঙ্গে মানুষ এঁটে উঠতে পারে না। বস্তুত পারে না বলেই জীবনের রহস্য সম্পর্কে তার আগ্রহ ফুরোয় না কোনোদিন। আর, জগৎকে মনে হয় অফুরান বিস্ময়ের উৎস।

ছয়

আলত্যুসের লিখেছেন : 'It is in ideology that the classless society lives the inadequacy / adequacy of the relation between it and the world, it is in it and by it that it transforms men's 'consciousness' that is, their attitudes and behaviour so as to raise them to the levels of their tasks and the conditions of their existence, (তদেব) শ্রেণিহীন সমাজের অধিবাসীদের সঙ্গে তাদের জগতের সম্পর্ক থেকে কখনও পর্যাপ্ততা আর কখনও অপর্যাপ্ততার বোধ জেগে ওঠে। এই সবই প্রতিফলিত হয় ভাবাদর্শের আকরণে। বস্তুত ভাবাদর্শের মধ্যে এবং ভাবাদর্শের সাহায্যে ঐ সমাজ মানুষের চেতনাকেও ক্রমশ রূপান্তরিত করতে পারে। রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহার সেই পর্যায়ে উন্নীত হয় যে-বিন্দু থেকে শ্রেণিহীন সমাজের অধিবাসীরা নিজেদের অস্তিত্ব-সংশ্লিষ্ট কর্তব্য ও শর্তাবলী পালন করার পক্ষে উপযুক্ত হয়ে ওঠে। এই বক্তব্য থেকে বুঝতে পারি, ভাবাদর্শ এমন-এক সচল ও সজীব সত্তার অধিকারী যা আপাত-উন্নত সমাজ-ব্যবস্থাকেও ক্রমাগত উৎকর্ষের দিকে সঞ্চালিত করতে পারে। ফলে মানুষের চেতনাও নিরন্তর পরিশীলিত হতে-হতে নতুন নতুন দায়িত্ব পালনের জন্যে যোগ্যতর ও শানিততর হয়ে ওঠে।

সব মিলিয়ে, এখানে আমরা পাচ্ছি ভাবাদর্শ বিষয়ে আলত্যুসেরের আরো একটি সংজ্ঞার প্রস্তাবনা। সাধারণভাবে সমাজে পরিবর্তনের ফলে প্রকৃত পরিস্থিতি যেভাবে তৈরি হয়, তার সঙ্গে যথাযথ ভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে আমরাও নিজেদের বদলে নেওয়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে চাই। যেসব কৃৎপ্রকরণের মধ্য দিয়ে আমাদের পরিবর্তনশীলতা

পরীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাদের এক কথায় বলা যেতে পারে ভাবাদর্শ। এদিক দিয়ে যদি ভাবি, ভাবাদর্শের মধ্যে দেখতে পাব নৈতিক সক্রিয়তা। কেননা জীবন তো সরলরেখায় চলে না কখনও; তার মধ্যে রয়েছে অজস্র চড়াই-উৎরাই, উপত্যকা ও মালভূমি এবং আকস্মিকতার সমাবেশ। অস্তিত্বের সমস্ত অনুপুঙ্খ তো আনন্দ দিতে পারে না; বিষাদের কুয়াশা ও যন্ত্রণার দহন আমাদের সত্তার বড় অংশ দখল করে রাখে। এদের সম্মিলিত উপস্থিতির স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস থেকে কোনো অর্থই আমরা ছেঁকে নিতে পারতাম না ভাবাদর্শের প্রাগুক্ত নৈতিক অনুষঙ্গ ছাড়া। অস্তিত্ববাদীরা অবশ্য এই প্রক্রিয়াকে আরো বিশদ ও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন। আমরা শুধু লক্ষ্য করি, যখনই কেউ স্ববিরোধিতা বা কূটাভাসের কথা বলছেন, তা কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রের দ্বন্দ্ব বা বিভিন্ন আকরণের মধ্যে সংঘর্ষ নয়। এই নিবন্ধের অন্যত্র ব্যবহৃত পারিভাষিক বাচনের সূত্রে বলতে পারি, এই স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস ব্যক্ত হয় জীবনে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সূত্রে। কিংবা, একটু আগে উত্থাপিত সূত্র অনুযায়ী বলা যায়, এই স্ববিরোধিতা প্রকাশ পায় যখন বাস্তবতার ভিন্নমুখী দাবি এবং আমাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে অনন্বয় দেখা দেয়।

সাত

এতক্ষণ আলত্যুসেরের বিভিন্ন সংজ্ঞা-সূত্র যেভাবে আলোচিত হলো তাতে বেশ কিছু প্রশ্ন ধারাবাহিক ভাবে উঠে এসেছে। এইসব প্রশ্নের মীমাংসা-প্রয়াস জন্ম দিচ্ছে আরো অনেক প্রশ্নের। ভাবাদর্শকে বিজ্ঞান-বহির্ভূত বলে যদি ভাবতে চাই, বিজ্ঞান-চিন্তার পরিধি সম্পর্কে আমাদের আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তাছাড়া নৈতিকতার সম্পর্ক-বিষয়ক প্রশ্নটি কতদূর এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, এই জিজ্ঞাসার বিকল্প হিসেবে দেখা দিতে পারে প্রতিপ্রশ্নও। যেমন, ভাবাদর্শ ও নীতিশাস্ত্র কী আদৌ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত? অথবা, বিজ্ঞান ও ভাবাদর্শকে যদি মূল্যের দিক দিয়ে সমান বলে ধরে নিই--তাহলে তাত্ত্বিক বয়ানের পক্ষে কোনো হানি হয় কি? এছাড়া কল্পনা ও বাস্তবের পার্থক্য-প্রতীতি ভাবাদর্শের সংগঠনে কতদূর গ্রাহ্য-- এই প্রশ্ন শেষ পর্যন্ত রয়ে যায়। বাস্তবে যেমন অন্তর্ঘাত করে কল্পনা, তেমনি কল্পনাতেও অন্তর্ঘাত করে বাস্তব এবং ফলে তৈরি হয় অভিনব কত সুরসাম্য ও মনোমৈত্রী। বাস্তবে যদি অন্তত প্রতীকীভাবেও হস্তক্ষেপ না করে পরা-অস্তিত্বের ছায়া, তাহলে কাল্পনিকের দ্যোতনাও স্পষ্ট হবে না। কেননা জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত ভাবাদর্শের বহুস্বরিক উপস্থিতি গড়ে ওঠে এদের অন্বয়, অনন্বয়, টানাপোড়েন, সংশ্লেষণ ও বিভাজনের ফলে। এদের মধ্যে কী সবচেয়ে প্রাথমিক প্রবণতার স্ফুরন দেখা যায় না? একে কি সংহতিমূলক নাকি বিকৃতিমূলক বলা যাবে? এই প্রসঙ্গে আমরা আলত্যুসেরের একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের

কথা মনে করতে পারি যেখানে তিনি কল্পনার এমন দুটি স্তরের কথা বলেছেন যাদের একটি যথাপ্রাপ্তের বিকৃতি ঘটায় এবং অপরটি নিজেই তার বিকৃত প্রকাশ। মন্তব্যটি রয়েছে 'Lenin and Philosophy and Other Essays' বইতে। সেখানে তিনি লিখছেন : 'All ideology represents in its necessary imaginary distortion not the existing relationship of production (and the other relationship that derive from them) but above all the imaginary relationship of individuals to the relations of production and the relations that derive from them. What is represented in ideologies therefore not the system of the relations which govern the existence of individuals, but the imaginary relation of those individuals to the real relations in which they live.' (১৯৭১ : ১৫৫) ! এখানে উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ক থেকে অর্জিত অন্যোন্য-সম্পর্ক কীভাবে ব্যক্তি-অস্তিত্বের যাবতীয় কাল্পনিক সম্পর্ককে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে— সে-বিষয়ে কিছু সংকেত দেওয়া হয়েছে। যথাপ্রাপ্ত উৎপাদন-সম্পর্কে কাল্পনিক বিকৃতির সূত্রধার নয় ভাবাদর্শ; ঐসব উৎপাদন-সম্পর্ক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সম্পর্ক যখন ব্যক্তি-অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে পরিশীলিত হয়, কেবলমাত্র তখনই তা ভাবাদর্শের আলম্বন হয়ে ওঠে। এইজন্যে এখানে আলত্যুসের আবার জোর দিয়ে বললেন, ব্যক্তি-অস্তিত্বের নিয়ন্ত্রক প্রকৃত সম্পর্কগুলির বিন্যাস ভাবাদর্শে উত্থাপিত হয় না, জৈব সংগঠনের মধ্যে উপলব্ধ বাস্তব সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্যে ব্যক্তির ভাবনা-প্রতিভা ও কল্পনা-প্রতিভা যখন সঞ্চালক সম্পর্কের দ্যোতনা নিয়ে আসে—কেবলমাত্র তখনই তা ভাবাদর্শের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়। স্পষ্টত উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ও আমাদের মনোযোগ দাবি করে। কেননা এইসব অনুষঙ্গের সামগ্রিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ স্পষ্ট না হচ্ছে, আমরা ভাবাদর্শের সম্পূর্ণ দ্যোতনা সম্পর্কে অনবহিত রয়ে যাব।

আট

সাম্প্রতিক গবেষকেরা ভাবাদর্শের প্রশ্নটিকে দার্শনিক নৃতত্ত্বের বিষয় বলে বর্ণনা করছেন। জীবন ও জগৎ থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সূত্রে উত্থাপিত পরিসর এবং কাল্পনিক পরিসর কীভাবে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত, তা ঐ দার্শনিক নৃতত্ত্বের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি দিয়ে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝে নিতে পারি। এই সূত্রে আরো একটি কথা বলা যেতে পারে। ভাবাদর্শ সংক্রান্ত তাঁর বক্তব্য যেভাবে তুলে ধরেছেন আলত্যুসের, তাতে তাঁকে মানবতাবাদী চিন্তা-প্রস্থানের খুব সংলগ্ন বলে মনে হয়। 'For Marx' বইতেএই ধারণার প্রতি খানিকটা সমর্থন জুগিয়ে তিনি লিখেছেন : 'In a classless society ideology is the relay whereby and the element in which, the relation between men and their

conditions of existence is lived to the profit of all men' (১৯৬৯ : ২৩৬)। মানবতাবাদ যদি শেষ পর্যন্ত এক চির সজীব স্বপ্নের নাম হয়ে থাকে, তাহলে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার দুর্মর স্বপ্নে দীক্ষিত আলত্যুসেরের বাচনে আমরা যেন খুঁজে পাই ঈপ্সিত পরমতারই বিন্দু। বারবার যাত্রীর পথ হারিয়ে যায় কুয়াশায় ও অন্ধকারে, চোখের সামনে থেকে মুছে যায় আলোর রেখা; তবু কবি জীবনানন্দের অমোঘ উচ্চারণে বলা যায় :

'সকল মানব প্রেমে উৎসারিত হয়, যদি, তবে
নব নদী নবনীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।'

(অন্ধকার থেকে, বেলা অবেলা কালবেলা)

হ্যাঁ, ভাবাদর্শ আলত্যুসেরের কাছেও 'মানুষের কাছেও মানুষের মানবিক দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতা'র অন্য নাম। ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সূত্রপাত হয়ে গিয়েছিল তাঁর সময়েই, তবু তিনি ভাবাদর্শের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে খুঁজে পেয়েছেন 'নব নবীন প্রাক্ সাধনার' বার্তা। একটু আগে যে মানবতাবাদের কথা লিখেছি, তারই নির্যাস তিনি শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থার সঞ্চালক ভাবাদর্শে লক্ষ্য করেছেন। এ হয়তো এক স্বপ্নেরই কথা, কিন্তু তা আলত্যুসেরের একক স্বপ্ন নয়; এ হলো সেই যৌথ স্বপ্নের বাচন যেখানে নিয়ত উপস্থিত 'শুশ্রূষার মতো শত শত জলঝর্ণার ধ্বনি' ('হে হৃদয়', বেলা অবেলা কালবেলা) আলত্যুসেরের প্রাগুক্ত বক্তব্যে সেই উজ্জ্বল সমাজের জাগ্রত স্বপ্ন ফুটে উঠেছে যেখানে বিভিন্ন মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং অস্তিত্বের পরিসর জুড়ে অনুরণিত হয় সার্বিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতি। আমরা যত সূক্ষ্ম তর্কই করি না কেন, এই হলো ভাবাদর্শের মৌল প্রতিবেদন। এই প্রতিবেদনের নির্যাস উপেক্ষা করে ভাবাদর্শ সম্পর্কে অন্য কোনো কূট তর্কের বাচন তৈরি করা যায় না। শুধুমাত্র এই প্রাথমিক শর্তটুকু স্বীকার করে নিলে ভাবাদর্শের দৃষ্টান্ত, আকরণ, কৃৎপ্রকরণ, অবসংগঠন ও অধিসংগঠন সংক্রান্ত পরবর্তী আলোচনার সূত্রপাত করা সম্ভব। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, শুধুমাত্র ভাবাদর্শই ভাবাদর্শ সংক্রান্ত আলোচনার আয়ুধ ও অধিকারী।

এই শেষোক্ত মন্তব্য নিয়ে— মার্ক্সবাদী ও অমার্ক্সবাদী দুই পক্ষের পণ্ডিতদের মধ্যেই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। কিন্তু আলত্যুসেরের বক্তব্য পূর্বসূরি মার্ক্সবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যেও যেহেতু তাত্ত্বিক অসম্পূর্ণতা রয়েছে— ভাবাদর্শের বাচন দিয়েই ভাবাদর্শকে বুঝে নিতে চেয়েছেন তিনি। প্রসঙ্গত তিনি জানিয়েছেন, ইতিহাসের কৃত্য ঐতিহাসিক পরিস্থিতির প্রতিতুলনায় বিষমানুপাতিক বলেই মানুষের জগৎ ও জীবন বোঝার জন্যে ভাবাদর্শের প্রয়োজন এত বেশি। বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আত্তীকৃত না-হলে

সমাজ-দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয় না এবং তাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুশীলনও করা যায় না। সম্পর্ক-বিন্যাসের অসামঞ্জস্য থেকে আমরা বিচ্ছিন্নতাবোধের তত্ত্বে পৌঁছাই। এপ্রসঙ্গে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হয়তো প্রয়োজন কিন্তু এখানে আপাতত এইটুকু লক্ষ্য করতে পারি যে, আলত্যুসেরের মতে ভাবাদর্শের বিজ্ঞান তৈরি না-হওয়ার ফলেই প্রকৃত বাস্তব সম্পর্ক ও অবভাসের প্রায়োগিক দ্বন্দ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধের বাচনে পৌঁছাই আমরা। যাই হোক, আগেও ইঙ্গিত দিয়েছি, এত-সব সম্পর্ক-বিন্যাসের মধ্যে লক্ষণের রেখা অটুট রাখা কঠিন। সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত কথাই যেহেতু নিজের নিয়ম-নিজেই-সৃষ্টিকারী মানুষ নিয়ে, ভাবাদর্শের প্রাতিষ্ঠানিক স্বভাব ও প্রবণতা, কৃৎপ্রকরণ ও পরিণতি বিষয়ক যাবতীয় আলোচনা শেষ পর্যন্ত তত্ত্বকেন্দ্রিক না-হয়ে প্রয়োগ-নির্ভর হতে বাধ্য।

'Ideology and Ideological State Apparatuses' শীর্ষক বিখ্যাত নিবন্ধে আলত্যুসের দেখিয়েছেন, রাষ্ট্রসংস্থার নিয়ামক বিধিবিন্যাসে নাগরিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং সামাজিক পদ্ধতির পুনরুৎপাদন ভাবাদর্শের প্রাথমিক লক্ষ্য। মার্ক্স বলেছিলেন সামাজিক উৎপাদনের কথা, আলত্যুসের 'পুনরুৎপাদন' কথাটি পাবিভাষিত দ্যোতনায় ব্যবহার করেছেন। এতে ভাবাদর্শ প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র অর্জন করে রাষ্ট্রযন্ত্রের আয়তনে পরিণত হল। তবে তা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকারী। এই সন্দর্ভে আলত্যুসের খুব জোর দিয়ে কল্পনার অবভাস বিষয়ে বলেছেন। কখনও স্পিনোজা কখনও লাকাঁর ছায়া লক্ষ্য করি তাঁর বয়ানে। জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, জীবনে তার অবস্থানের স্বরূপ কিংবা কাল্পনিক ও প্রতীকী সত্তার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ে আলত্যুসেরের বক্তব্য আরো পরিশীলিত হয়েছে। মার্ক্সের 'The German ideology' তে তিনি লক্ষ্য করেছেন, ভাবাদর্শকে বিশুদ্ধ অবভাস বা বিশুদ্ধ স্বপ্ন বলে ব্যাপ্ত নেতির আদলে গ্রহণ করা হয়েছে। তার সমস্ত বাস্তবতাই যেহেতু বহির্বৃত, ভাবাদর্শকে কাল্পনিক নির্মিতি বলে ভাবা হয়েছে যা কিনা ফ্রয়েড-পূর্ববর্তী আলোচকদের প্রতিবেদনে প্রাপ্ত স্বপ্নের তাত্ত্বিক অবস্থানের কথা মনে করিয়ে দেয়। এর বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে আলত্যুসের বলেছেন, কাল্পনিকের বাস্তবতাই ভাবাদর্শের নিজস্ব বাস্তবতা। ভাবাদর্শ স্বভাবে অনৈতিহাসিক; এর মানে এই নয় যে তার কোনো ইতিহাস নেই। বরং ফ্রয়েডের চৈতন্যের মতো ইতিহাসের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত বলেই কোনো ধরনের সীমিত ঐতিহাসিক পর্বে তা রুদ্ধ নয় এবং পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মে বদ্ধ নয়। 'The unconscious' নিবন্ধে ফ্রয়েড অবচেতনাকে বলেছেন সময়হীন কারণ সময়ের মাপ ও গ্রন্থি তৈরি হওয়ার আগেই এই ধারণার জন্ম। ভাষা-সংস্কৃতি-অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে পার্থক্য-প্রতীতি তখনো দেখা দেয়নি। এই একই ধারণার ছাঁচে যেন আলত্যুসের বললেন ভাবাদর্শের কথা; সময়হীনতা ও চিরন্তনতা তাঁর কাছে

সমার্থক হয়ে উঠল। তিনি স্পষ্টই লিখলেন : 'Ideology is eternal, exactly like the unconscious' (১৯৭১ : ১৫২)! সমস্ত সাংস্কৃতিক আকরণের মর্মমূলে যেমন যৌথ অবচেতনা, তেমনি প্রতিটি মানবিক প্রত্যয়-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার প্রকাশে সক্রিয় রয়েছে ভাবাদর্শ।

যুক্তি ও পাল্টা যুক্তির কোনো শেষ নেই। আলত্যুসের-সংলগ্ন সময়ে যা সত্য ছিল, দ্রুত রূপান্তরপ্রবণ সাম্প্রতিক কালপর্বেও তা সত্য। তাঁর সময়কার প্রকৃত পৃথিবী এবং চিন্তাবিশ্ব দুই-ই বদলে গেছে; কিন্তু তাঁর ভাবাদর্শ-বিষয়ক বক্তব্যের বহুস্বরিকতা আজও বাস্তবের রূপকে এবং রূপকের বাস্তবে নিরবচ্ছিন্ন আলোক-সম্পাত করে চলেছে।

উমবের্তো একো, তাঁর চিহ্নবিশ্ব

এমন-এক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি আমরা যখন সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যকৃতির মধ্যবর্তী জল-বিভাজনরেখা অজস্র সমালোচক ও তাত্ত্বিকেরা ইচ্ছে করে ঝাপসা করে দিচ্ছেন। সব কিছুই তো সংযোগ গড়ে তোলার জন্যে পরিকল্পিত; অথচ সাম্প্রতিক জটিল দুনিয়ায় মুহূর্তের সংরাগ এত প্রাধান্য পাচ্ছে যে সংযোগের প্রয়োজনই হারিয়ে যাচ্ছে। বস্তুসর্বস্বতার পর্যায়ে প্রতিটি বস্তুই চিহ্নায়ক; কিন্তু কথাটা এখানেই থেমে থাকছে না এখন। বুদ্বুদের মতো ক্ষণস্থায়ী যাবতীয় চিহ্নায়ন প্রকরণ। সমস্ত ভাবাদর্শ যখন অবান্তর, কোন্ তাৎপর্যের জন্যে কীভাবে ঐসব অস্থির চিহ্নায়কদের ব্যবহার করব — এই প্রশ্ন আর এড়িয়ে যেতে পারি না। বাখতিন/ ভোলোশিনোভ জানিয়েছিলেন, 'without signs there is no ideology........ Everything ideological possesses semiotic value' (১৯৭৩ : ৯)। চিহ্নতাত্ত্বিক মূল্য ও ভাবাদর্শ অন্যোন্য-সম্পৃক্ত : এই বার্তাকে কীভাবে গ্রহণ করব আজকের উৎকট বিয়োগপর্বে যখন কোথাও কোনো ধরনের ভাবাদর্শকেই প্রাসঙ্গিক বলে স্বীকার করা হচ্ছে না? এমন পরিস্থিতিতে চিহ্নতাত্ত্বিক অধ্যয়ন অর্থাৎ ভাষ্য-ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোন পথ ধরে চলবে? জীবন-যাপনের আকরণই কেবল বদলে যাচ্ছে না এখন, আঙ্গিক ও অন্তর্বস্তু আমূল রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। অহরহ তাই সংকেত তৈরি হচ্ছে এবং মুছে যাচ্ছে। এ অবস্থায় সংকেত-সন্ধান, সংকেত-পাঠ এবং সংকেত-ভাষ্য ধরা-বাঁধা পথ ধরে চলতে পারে না। এসব বিষয়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভঙ্গ এবং তাদের অধিকারের সীমা নিয়ে যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে চলেছেন, সেই উমবের্তো একোর কাছেই যেতে হয় চিহ্নবিশ্বের তাৎপর্য বোঝার জন্যে। আর, তাঁর বয়ানকে বুঝে নিতে হয় সমসাময়িক ভাবুকদের উদ্ভাসনী চিন্তার প্রতিতুলনায়।

নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে (১৯৯৬) একো মন্তব্য করেছিলেন, 'আমার তো মনে হয় চিহ্নবিজ্ঞান এই শতাব্দিতে দর্শনের একমাত্র প্রকাশ।' ধীরে ধীরে আমরা যখন একুশ শতকের যাত্রা শুরু করেছি, তাঁর এই দাবির অনেকান্তিক তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতা তলিয়ে ভেবে দেখতে হয়। প্রকৃত চিহ্নতাত্ত্বিকের কাছে জীবন তো চিহ্নের অগাধ অবাধ সমুদ্র। সমাজ-সময়-ইতিহাস-সংস্কৃতির অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে সার্থক প্রতিবেদন তৈরি করতে চাই যদি, চিহ্নায়কের নিত্য নবায়মান গ্রন্থনায় চিহ্নায়ন প্রকরণের বিচিত্র বিচ্ছুরণ সম্পর্কে আমাদের অবহিত হতে হবে। প্রশ্ন এই, নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্যে নির্দিষ্ট চিহ্নতাত্ত্বিক প্রকরণ কি ব্যবহার করব যেখানে যথাপ্রাপ্ত অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গ আমাদের সিদ্ধান্তের উৎস হবে, নাকি সাধারণ চিহ্নবিজ্ঞান যেভাবে নিজস্ব তাত্ত্বিক বয়ান

ও দার্শনিক বর্গ নির্মাণের জন্যে বস্তুর নির্যাসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়— তা অনুসরণ করব? যেহেতু মূল কথাটা হলো অভিপ্রেত সংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে, তত্ত্বজ্ঞ এবং তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ সাধারণজনের দৃষ্টিকোণ আর তজ্জনিত সমস্যা মনে রাখতে হয় এই চিন্তাপ্রস্থানে। কেননা চিহ্নায়ক সার্বভৌম নয়; সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বহির্ভূত কোনো চিহ্নায়ন প্রকরণ হতে পারে না। কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ অর্থাৎ তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞজন বস্তু-ঘটনা-সংকেত সম্পর্কিত উপলব্ধিতে পৌঁছাচ্ছেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের অনুভব থেকে তা কেন ও কতটা আলাদা— চিহ্নবিজ্ঞান এই প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারে না। এই দায় কিন্তু অন্য কোনো তত্ত্বপ্রস্থানে দেখি না।

আরো একটি কথা আছে। যেভাবে বলি আবহমণ্ডল কিংবা সামাজিক/ঐতিহাসিক/সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের কথা, ঠিক তেমনি য়ুরি লোটম্যান প্রস্তাবিত চিহ্নতাত্ত্বিক পরিমণ্ডল বা Semiosphere এর কথাও বলতে চান একো এবং অন্য তত্ত্বজ্ঞেরা। এই পরিসরে বৈশ্বিক আবহ ব্যক্ত হয় বলে বস্তু ও চিহ্নের সংযোগ কিংবা বিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক কিছু প্রতিফলিত হতে পারে। ফলে যিনি ভাষ্যকার বা ব্যাখ্যাতা হতে চান, তাঁকে সংশ্লেষণী দৃষ্টিরও অধিকারী হতে হয়, কেবলমাত্র অন্তর্ভেদী রঞ্জনরশ্মির ওপর কর্তৃত্ব থাকলেই চলে না। অর্থাৎ গভীরতার সঙ্গে ব্যাপ্তিও আবশ্যিক। একোর মধ্যে সেই বিরল গুণের সমাবেশ ঘটেছে। একদিকে দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যযুগীয় আবহ তাঁর মনোযোগের বিষয়, অন্যদিকে তিনি আমাদের চমৎকৃত করে দিতে পারেন 'The Name of the Rose', 'Foucault's Pendulum', The Island of the Day before'-এর মতো আধুনিকোত্তর উপন্যাস লিখে। এদের মধ্যে প্রাগুক্ত চিহ্নতাত্ত্বিক পরিমন্ডল উপস্থিত অন্তর্বয়ন ও পরা-আখ্যানের কৃৎকৌশল নিয়ে। ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষায় চিহ্নবিজ্ঞান সম্পর্কে অজস্র প্রতিবেদন দিয়ে যিনি জিজ্ঞাসু পড়ুয়াদের জন্যে প্রতিনিয়ত চিন্তার নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছেন— তিনটি উপন্যাস যেন তারই পরীক্ষাগার। প্রতিটি বস্তুর মধ্যে নিহিত রয়েছে অনন্ত অন্তর্বৃত ভিন্নতা; বৈচিত্র্যের মধ্যে কেবল বিস্তার নেই, আততিও রয়েছে। একো উপন্যাসের প্রতিবেদনে অবভাস ও তত্ত্ববস্তুর দ্বিরালাপ যেমন সন্ধান করেন, তেমনি তাত্ত্বিক সন্দর্ভে সমকালের আকাঙ্ক্ষা-উৎকন্ঠা- বিতর্ক এবং গোলকধাঁধার তাৎপর্য নির্ণয়ের জন্যে চিহ্নতাত্ত্বিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলেন। ১৯৬২ সালে 'Opera aperta' প্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাবিশ্ব নির্মাণের সূত্রপাত হয়। যেহেতু ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রতিবেদন ছাড়া আমাদের অনেকের পক্ষে একোর চিন্তাবিশ্বের শরিক হওয়া সম্ভব নয়, পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাচ্ছি না তাঁর— এটা ধরেই নেওয়া যায়। এই সীমাবদ্ধতা মনে রেখেই একোর চিন্তাপ্রণালী বিশ্লেষণে এগোতে হবে।

মুখ্যত নিম্নোক্ত বই ও নিবন্ধ থেকে একোর চিহ্নবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা তৈরি করে নিচ্ছি আমরা :

১। David Robey সম্পাদিত 'Structuralism; An Introduction' বইতে 'Social life as a sign system' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭২)।

২। T.A. Sebeok সম্পাদিত 'The Tell-Tale Sign : A survey of Semiotics' বইতে 'Looking for a logic of culture' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৫)।

৩। 'A Theory of Semiotics' (১৯৭৬)।

৪। 'Drama Review' পত্রিকায় 'Semiotics of theatrical performance' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৭)।

৫। 'Yale Italian studies' পত্রিকায় 'On level of literary form' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৭)

৬। 'Yale Italian studies' পত্রিকায় "The code : Metaphor or interdisciplinary Category' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৭)।

৭। T.A Sebeok সম্পাদিত 'Sign, Sound and Sense' বইতে 'Semiotics : A Discipline or an Interdisciplinary Method?' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৭৮)।

৮। 'The Role of the Reader' (১৯৭৯)।

৯। 'Poetics today' পত্রিকায় 'Two problems in textual interpretations' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮০)।

১০। 'Versus' পত্রিকায় 'Guessing : From Aristotle to Sherlock Holmes' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮১)।

১১। T.A. Sebeok এবং U. Eco সম্পাদিত 'The sign of three : Dupin, Holmes, Peirce' বইতে 'Horns, Hooves. Insteps :Some Hypotheses on Three Types of Abduction' (১৯৮৩)।

১২। U. Eco. V. Ivanov এবং M. Rector সম্পাদিত 'Carnival' বইতে 'The frames of Canic freedom' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৪)।

১৩। 'Semiotics and the Philosophy of Language' (১৯৮৪)।

১৪। 'Postscript to the Name of the Rose' (১৯৮৪)

১৫। 'Daedalus' পত্রিকায়'Innovation and repetition between modern and postmodern aesthetics' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৫)।

১৬। M.Blonsky সম্পাদিত 'On signs' বইতে 'Strategies of lying' শীর্ষক

নিবন্ধ (১৯৮৫)।

১৭। 'Substance' পত্রিকায় 'Casablanca: Cult movies and intertextual collage' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৮৫)।

১৮। 'Reflections on The Name of the Rose' (১৯৮৫)।

১৯। 'Art and Beauty in the Middle Ages' (১৯৮৬)।

২০। 'Travels in Hyperreality' (১৯৮৬)।

২১। 'Faith in fakes' (১৯৮৬)।

২২। 'The open work'(১৯৮৯)।

২৩। 'The Aesthetics of Chaosmos : The Middle Ages of James Joyce' (১৯৮৯)।

২৪। 'The Limits of Interpretation' (১৯৯০)।

২৫। 'Times literary supplement' পত্রিকায় 'Some paranoid readings' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৯০)।

২৬। J.Lotman রচিত 'Universe of the Mind : The Semiotic Theory of Culture' বইয়ের ভূমিকা (১৯৯০)।

২৭। 'Interpretation and Overinterpretation' (১৯৯২)।

২৮। 'Modern Language Notes' পত্রিকায় 'Reading any readers' শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৯২)।

২৯। 'Misreadings' (১৯৯৩)।

৩০। 'The search for the Perfect Language' (১৯৯৩)।

৩১। 'Apocalypse postponed' (১৯৯৪)।

৩২। 'How to Travel with a Salmon and Other Essays' (১৯৯৪)

৩৩। 'Sir Walks in the Fictional Woods' (১৯৯৪)।

৩৪। 'G.Braodbent , R. Bunt এবং C.Jenks সম্পাদিত 'Signs, Symbols and Architecture'বইতে 'Function sign : The semiotics of Architecture'শীর্ষক নিবন্ধ (১৯৯৫)।

এছাড়া অন্য সহযোগীদের সঙ্গে চিহ্নবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু প্রবন্ধ-সংগ্রহও তিনি সম্পাদনা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'Meaning and Mental Representation' (১৯৮৮); 'On the medieval theory of signs' (১৯৮৯)। আগেই লিখেছি, এই তালিকার মধ্যে শুধু ইংরেজি ভাষায় রচিত বই ও নিবন্ধ রয়েছে। মূল

ইতালীয় রচনা থেকে কিছু কিছু ইতিমধ্যে অনূদিত হলেও, বেশ বড় অংশই রয়ে গেছে মুল ইতালীয় ভাষায়। তবু এই তালিকার দিকে তাকালে বুঝি, জিজ্ঞাসা কত বিচিত্র পরিসরে ব্যাপ্ত হয়েছে। কিংবা পরিসরই নয় কেবল, সময়ের বিভিন্ন পর্বেও তিনি চিহ্নায়ন প্রকরণের প্রত্নতত্ত্ব ও নির্যাস সন্ধান করেছেন। মধ্যযুগের ইংরেজ মনীষী ডাঃ জনসনের দুটি বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি দিয়ে একোর জীবনাদর্শকে সম্ভবত ব্যাখ্যা করা চলে :

'Let ovservation with extensive view
Survey mankind, from China to Peru.'

ব্যক্তি-জীবনে এবং সামাজিক ইতিহাসে যত ঘটনা-প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে, তাদের কেন্দ্রে রয়েছে মানুষ আর তার তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। বস্তুপুঞ্জ কিংবা ঘটনাপুঞ্জ বহিরঙ্গে যে অভিঘাত তৈরি করে, তাকে অস্বীকার না-করেও বলা যায়, বস্তু বা ঘটনা থেকে অর্জিত সংকেত কিংবা চেতনা-নির্যাসই দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে যায়। সার্থক চিহ্নতাত্ত্বিক তাই অনবরত বাহির ও ভেতরের মধ্যে সংযোগ ও অন্বয়ের সূত্রগুলি খুঁজতে থাকেন। বস্তুর স্বরূপ নিয়ে যখন কথা বলি, আমরা আসলে তার চিহ্নায়ক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কিংবা অসম্ভাব্যতা খুঁজতে চাই। ১৯৬২ সালে 'opera aperta' বইতে যে-যাত্রার শুরু হয়েছিল, ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে আজ তা মানবিকী বিদ্যার নানা শাখা-প্রশাখায় শতপুষ্প বিকশিত করে চলেছে। সূচনা-পর্বে একোর চিহ্নতাত্ত্বিক ভাবনা কীরকম ছিল, ঐ বইয়ের নির্বাচিত অংশ ইংরেজি -অনুবাদে 'The open work' (১৯৮৯) নামে প্রকাশিত হওয়ার পরে ইংরেজি জানা পড়ুয়ারা বুঝতে পারলেন।

দুই

দেরিদার বিনির্মাণবাদী চিন্তাপ্রস্থান যখন সমান্তরাল ভাবে বিকশিত হচ্ছে, চিহ্নতত্ত্বের অধ্যয়ন কোনো ভাবেই তার প্রভাব অস্বীকার করতে পারে না। একদিকে পাঠকৃতির এবং অন্যদিকে ভাষ্যকারদের অধিকার কি পরস্পরের সঙ্গে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে অন্বিত? দ্বান্দ্বিকতা কি দ্বিরালাপের সম্ভাবনাকে ব্যাহত বা প্রত্যাখ্যান করছে? এরকম আরো কিছু প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। বিনির্মাণের দীর্ঘায়ত ছায়ায় চিহ্নতাত্ত্বিক পাঠ কাকে বেশি গুরুত্ব দেবে— ভাষ্যকারকে না তার ভাষ্য-প্রক্রিয়াকে অথবা অন্বিষ্ট পাঠকৃতিকে? বয়ানের অন্তর্বৃত সম্ভাবনার দোহাই দিয়ে ভাষ্যের সাহায্যে পাঠকৃতির সীমানা কত দূর প্রসারিত করতে পারি আমরা? যখন পাঠকৃতির মুখোমুখি হই, সমস্ত পাঠক কি ভাষ্যকারের ভূমিকা নিতে পারেন? ভাষ্যের যেমন সীমা আছে, তেমনি তার সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় চরিত্রের বিচ্ছুরণও আছে। একো পরে যে আদর্শ পাঠক (Model Reader) -এর সন্ধান করেছিলেন, সেই ঈপ্সিত সত্তা কি মুক্ত-সমাপ্তি-সম্পন্ন পাঠেই শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে? একটু

আগে যে পাঠকৃতির অধিকারের কথা বলেছি, তা কিন্তু আদর্শ পাঠকের মর্যাদাবান অবস্থানের নিরিখে খানিকটা জটিল হয়ে পড়ে।

১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'The Limits of Interpretation' বইতে একো জোর দিয়ে বলছেন : 'an open text is always a text and a text can elicit infinite reading without allowing any possible reading. It is impossible to say what is the best interpretation of a text, but it is possible to say which ones are wrong:...... Texts frequently say more than their authors intended to say, but less than what many incontinent (i.e. dermeticist or deconstructionist) readers would like them to say.' (পৃ.১৪৮)

অন্তঃসঙ্গতির শক্তিতে যা সুমিত ও সুসংবদ্ধ, তাকেই বলি প্রণালীবদ্ধ বয়ান। মুক্ত পাঠকৃতির ধারণা কি তাহলে এর বিরোধী? না, মোটেই তা নয়। মনে রাখতে হয় এই কথা যে, মুক্ত মানে বিশৃঙ্খল ও খাপছাড়া নয়। বয়ানও মূলত স্থাপত্য। তাই তার অস্তিত্ব পৌর্বাপর্য ও বহমানতার ওপর নির্ভরশীল। যথাপ্রাপ্ত সংস্থানে কোনো নতুন পাঠকৃতি যখন হস্তক্ষেপ করে, তখনও ছেদ ও ধারাবাহিকতার দ্বিরালাপে নিয়মই প্রতিষ্ঠিত হয়, বেনিয়ম নয়। একো যেহেতু মুক্ত পাঠকৃতিকে অনন্তপাঠের উৎস বলেছেন, কোনো একটি নির্দিষ্ট একক পাঠে বয়ানের আয়ু কখনো ফুরিয়ে যেতে পারে না। তার মৌল বৈশিষ্ট্যই হলো বর্তমানত্ব। কোনো-এক ভবিষ্যৎ সময়-পর্বে যদি তা ঝাপসা বা নিষ্প্রভ হয়ে যায়, তখন তা আর বর্তমানের বিষয় থাকে না, হয়ে ওঠে প্রত্নবস্তু। ভাষ্যকার-পাঠক সেক্ষেত্রে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। একোর মন্তব্য-সূত্রে বলা যায়, যত পাঠক তত পাঠ এবং তত ভাষ্য। এদের মধ্যে কোন্‌টি সর্বশ্রেষ্ঠ বা সত্যের সবচেয়ে ভালো উন্মোচক— তা বলা অসম্ভব। তবে কোন্ বিশ্লেষণ ঠিক নয়, সেগুলি নিশ্চয় চিহ্নিত করা চলে। আমাদের বাংলা সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতায় এর যথেষ্ট সমর্থন মেলে।

বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্যের পুনঃপাঠে ভাষ্যের অতিরেকও যে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে, তাও মনে রাখা দরকার। প্রশ্ন হচ্ছে, ভাষ্যের সীমানা নির্ধারণ করব কীভাবে? একো এসম্পর্কে নিজস্ব প্রতিবেদন পেশ করেছেন যার সতর্ক ও নির্দিষ্ট অনুশীলন প্রয়োজন। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ভাষ্য কত আশ্চর্যজনক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যের ভাষ্য দেশে দেশে কালে কালে কত শিখর থেকে শিখরান্তরে পর্যটন করেছে — তাও স্মরণীয়। বস্তুত বিশ্বসাহিত্যে কালোত্তীর্ণ এমন কিছু পাঠকৃতি রয়েছে যা পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছে কার্যত চিহ্নায়কের আকর হয়ে উঠেছে। প্রমিথিউস বা অয়দিপাউস বা আন্তিগোনে বিষয়ক পাঠকৃতি এখন কি নিছক কাহিনি শুধু? নাকি আখ্যানের ওপর বহু শতাব্দীর ভাষ্যকারদের অনেকার্থদ্যোতক পাঠের

প্রলেপ পড়তে পড়তে বয়ানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে অন্তঃশায়ী চিহ্নায়ন প্রকরণও! তেমনি ঘটেছে প্যারাডাইজ লস্ট বা ফাউস্টের ক্ষেত্রে; হ্যামলেট-ম্যাকবেথ-কিং লীয়ার প্রভৃতির ক্ষেত্রেও তা-ই। বাংলা সাহিত্যেও রক্তকরবী-ডাকঘর-রাজা-অচলায়তন যদি পড়ি আজ, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভাষ্যও কি অলক্ষ্যে সম্পৃক্ত হয়ে যায় না মূল পাঠকৃতির সঙ্গে? আর, সেই সঙ্গে অন্য ভাষ্যকারদের বয়ানও। আসলে মানুষ চিহ্ন-উৎপাদক প্রাণী; বস্তুকে নিছক বস্তু হিসেবে দেখে তৃপ্তি নেই তার। বস্তু থেকে চিহ্ন তৈরি না-করা পর্যন্ত 'বস্তুস্বরূপ' সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না মানুষ।

বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ প্রথম ব্যাপকভাবে ভাষাকে বিবরণ থেকে চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় সরিয়ে আনেন। তাঁর কাজই ছিল, অনবরত নতুন-নতুন চিহ্নায়ন প্রকরণ গড়ে তোলা আর ভেঙে ফেলা। চিহ্নায়কের উদয় আর বিলয় এত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ঘটে গেছে তাঁর কবিতায় যে বিনির্মাণ শুধুই কৃৎকৌশল নয় তাঁর চিন্তাবিশ্বে, নান্দনিক দর্শনেরই অভিজ্ঞান। একো যে-পাঠকসত্তাকে আদর্শ পাঠক (Model Reader) বলে উপস্থাপিত করেছেন, প্রাগুক্ত সমস্ত বয়ানের পক্ষে তাঁর উপস্থিতি আবশ্যিক। এই সত্তা ভাষ্যের রাজপথে ও শাখাপথে, প্রকাশ-অপ্রকাশের আলো-আঁধারিতে সমান সাবলীল ভাবে এগিয়ে যায়। প্রমাণ করে যে 'any act of interpretation is a dialecic between openness and form, initiati ve on the part of the interpreter and contextual pressure.'। প্রকরণ মানেই তো কোনো-না-কোনো ধরনের রুদ্ধতা, যার উল্টো মেরুতে রয়েছে ভাষ্যকারের কাঙ্ক্ষিত মুক্ত পরিসর। এই দুইয়ের দ্বিবাচনিকতা মানে কি তবে প্রকরণের প্রতি অস্বীকৃতি? কিন্তু প্রসঙ্গের চাপ কীভাবে উপেক্ষা করতে পারেন ভাষ্যকার-পাঠক!

এরকম আরো কিছু প্রশ্নের প্রেক্ষিতে একোর 'সীমাহীন চিহ্নায়ন' (Unlimited Semiosis) বিষয়ক প্রস্তাবনা মনে আসে। উপন্যাস, প্যারডি এবং অন্য কল্পনা প্রসূত বয়ানের ক্ষেত্রে ঐ তত্ত্ববীজ কতটা কার্যকরী— একোর বক্তব্য অনুসরণ করে আমরা বুঝে নিই। যে-ধরনের ভাষ্য রুদ্ধ আকরণে গিয়ে পৌঁছায় এবং চিন্তা ও প্রত্যয়কে সীমায়িত করতে চায়, তাদের প্রত্যাখ্যান করাই চিহ্নজিজ্ঞাসুর জরুরি কৃত্য। বিকল্প ভাষ্য ও বিকল্প তাৎপর্যের সম্ভাবনাকে প্রতিহত করতে চাইলে মুক্ত পাঠের প্রক্রিয়া ধ্বস্ত হতে বাধ্য। বয়ানে বিবরণের গুরুত্ব থাকবেই; কিন্তু বয়ানের অনন্যতা তার ওপর নির্ভর করে না। প্রতীক বা ভাবকল্প বা সংকেত যদি চিহ্নায়কের গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তবেই সীমাতিযায়ী পাঠকৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কেননা এর মানে আদর্শ পাঠকের জন্যে নবায়মান প্রত্যাহ্বান, তাৎপর্যের অনন্ত বিস্তার ধারণ করার উপযোগী মননমুদ্রার সন্ধান। প্রতীক বা ভাবকল্প বা সংকেত বা রূপক আবশ্যিকভাবে বহুস্বরিক ও অনেকার্থদ্যোতক। চিহ্নায়ক

কীভাবে আক্ষরিক বিন্যাসের মধ্য দিয়ে তাদের ধারণ করে, সেই রহস্য উন্মোচন করেন আদর্শ পাঠক। কোনো ভাষ্যবিশেষের কর্তৃত্ব দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত অনন্য তাৎপর্য খুঁজতে হবে পাঠকৃতিতে— এ জাতীয় ধারণার মধ্যে আধিপত্যবাদের ছায়া লক্ষ্য করে আদর্শ পাঠব তার বিরোধিতা করেন। আবার কোনো পাঠকৃতির অন্তহীন ভাষ্য করা সম্ভব, এমন বক্তব্যও তিনি সমর্থন করেন না। এবার একটু অন্যভাবে জিজ্ঞাসা পেশ করা যায়; চিহ্নায়ন প্রকরণের সঙ্গে ভাষ্যকার-পাঠকের সম্পর্ক ঠিক কীরকম? অন্বিষ্ট তাৎপর্য কি অনেকটা পরিমাণে ঐ সম্পর্কের চরিত্রের ওপর নির্ভর করে না!

তিন

বলা বাহুল্য, এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা শুধুমাত্র প্রণালীবদ্ধ বিশ্লেষণেই সম্ভব। একোর বয়ান ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করলেই কেবল বুঝতে পারি, তাঁর চিহ্নতাত্ত্বিক আবহমণ্ডল কীভাবে ধাপে-ধাপে গড়ে উঠেছে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় যিনি ইতালীয় ও ইংরেজি ভাষায় তাত্ত্বিক ও ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন সহ অজস্র প্রাক্‌কথন, ভূমিকা, টীকা-টিপ্পনি ও স্মারক প্রবন্ধ লিখে গেছেন এবং প্রাগুক্ত দুটি ভাষা ছাড়াও যিনি ফরাসি, জার্মান ও স্পেনীয় ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারেন— সেই একোর বাচনে বৈদগ্ধ্য ও সূক্ষ্ম অনুভূতির মণিকাঞ্চন সংযোগ হওয়া প্রত্যাশিতই। বহুভাষাবিদ একো অস্তিত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার প্রকাশ হিসেবে বাস্তবতাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার মধ্য দিয়েই চিহ্নায়ন প্রকরণে পৌঁছেছেন। দর্শনের সমগ্র ইতিহাসকে যিনি চিহ্নতাত্ত্বিক প্রেক্ষিতে পুনঃপাঠ করতে চেয়েছেন, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁর চিহ্নবিশ্বের নন্দনতত্ত্ব নিশ্চয় অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, ভাষ্য ও ভাষ্যকার মিলেই চিহ্নবিজ্ঞানের পরিসর গড়ে ওঠে। বোধ ও তাৎপর্যের মুক্ত ও চলমান উৎপাদন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে চিহ্নতাত্ত্বিকেরা কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। সাধারণ চিহ্নতত্ত্বের পরিসরের মধ্যেই রয়েছে ভাষ্যের বিশেষ চিহ্নতত্ত্ব, রয়েছে সংকেতায়ন থেকে বিসংকেতায়নে পৌঁছানোর আলাদা চিহ্নতত্ত্ব। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্কে রৈখিকতা অস্বীকার করে কেউ কেউ বলেছেন এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্কের বিপর্যাস ঘটে যাওয়ার কথাও। বস্তু থেকে সংকেতে পৌঁছানো মননের বিশেষ একটি প্রবণতা, আবার অন্য-এক প্রবণতায় সংকেতের অন্তর্নিহিত সাংকেতিকতা বিনির্মাণ করারও প্রয়াস দেখা যায় সাহিত্যে, সমাজে এবং দর্শনে। বহু শতাব্দী ধরে চলমান চিহ্নতাত্ত্বিক পরম্পরা থেকে একো কেন ও কতটা আলাদা— তা যেমন জানা জরুরি তেমনি সমসাময়িক দার্শনিক ও সাহিত্যতাত্ত্বিকদের চিহ্নায়ন বিষয়ক ভাবনার সঙ্গেও প্রতিতুলনা করা প্রয়োজন। কিন্তু এই দুটি বিষয় আলাদা নিবন্ধের পরিসর দাবি করে।

অতএব এখানে সামান্য কিছু প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উত্থাপন করছি মাত্র।

মধ্যযুগ ও তার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে একো যেভাবে নিবিড় পাঠ করেছেন, তা থেকে বুঝতে পারি, বস্তু থেকে চিহ্নে পৌঁছানোর প্রবণতা সমস্ত যুগেই মানুষের মধ্যে বর্তমান ছিল। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে-কর্মে এর প্রকাশ ঘটেছে। তবে বিশ শতাব্দীর শুরুতেই এই প্রবণতা প্রণালীবদ্ধ ভাবে বিকশিত হতে শুরু করে। চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স এর কথা মনে রাখলে বলতে হয়, উনিশ শতকের শেষ দিকে চিহ্নতত্ত্বের নতুন পর্যায় শুরু হয়েছিল। ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর ১৯১৫ সাল নাগাদ এই প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ করেন। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, বিশেষত ষাটের দশক থেকে, চিহ্নতাত্ত্বিক আবহমণ্ডলকে পুষ্ট করতে থাকেন মিখায়েল বাখতিন। মিশেল ফুকো, রোলাঁ বার্ত, মরিস ব্লাশোঁ, রোমান য়্যাকবসন, য়্যুরি লোটম্যান, জোনাথন কুলের, জন ডিলি, জাক দেরিদা, জুলিয়া ক্রিস্তেভা, জাক লাকাঁ, পল রিকো, মিশেল রিফাটেরে, টমাস সেবেওক প্রমুখ দার্শনিক ও ভাষ্যকারদের সম্মেলক উপস্থিতিতে গড়ে উঠেছে ঐ আবহমণ্ডল । তাই এমন অন্যোন্য-নির্ভর চিন্তাপ্রস্থান আজকের পৃথিবীতে দুর্লভ ।

জীবন ও মননের, সত্তাতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের অজস্র স্তর সমান্তরাল ভাবে ছুঁয়ে থাকে চিহ্নতত্ত্ব। একোর রচনা যেন হাজার-দুয়ারি প্রতিবেদন। এই চিন্তাপ্রস্থানের নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছুরণ তাঁকে কেবল সন্দর্ভ নির্মাণেই প্রাণিত করেনি, সংগঠক হিসেবেও বিপুল মান্যতা দিয়েছে । 'International Assoiciation for Semiotic Studies' নামক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সংগঠনের সাধারণ সচিব (১৯৭২ - ৭৯), সহসভাপতি (১৯৭৯ - ৮৪) এবং সাম্মানিক সভাপতি (১৯৯৪ থেকে) হিসেবে তিনি গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছেন। এছাড়া সংগঠনের মুখপাত্র 'Semiotica' -র সম্পাদক সমিতির তিনি স্থায়ী সদস্য । ১৯৬৯ সালের ২১ - ২২ জানুয়ারি পারিতে এই সংগঠনের যখন জন্ম হয়, একো ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য । বিখ্যাত ফরাসি ভাষাতাত্ত্বিক এমিল বেনভেনিস্ত ও রোমান য়্যাকবসন্ এর প্রধান স্থপতি । য়্যুরি লোটম্যান আমৃত্যু এর অন্যতম সহসভাপতি ছিলেন (১৯৬৯ - ১৯৯৩) । জুলিয়া ক্রিস্তেভার সঙ্গেও সংগঠনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল, যদিও তিনি বিদ্যাচর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেকে বেশি প্রসারিত করায় চিহ্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ খানিকটা শিথিল হয়ে পড়ে । একোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রোক্কো ক্যাপোজ্জি জানিয়েছেন, চিহ্নতত্ত্বের সাম্প্রতিক পরিসর যে যুগপৎ অনেকান্তিক ও নবায়মান-- এর পেছনে ঐ সংগঠনের, বিশেষভাবে একোর, অবদান অসামান্য ।

পিয়ার্সের প্রতিবেদন ধারাবাহিক ভাবে পুনঃপাঠ করে সি, কে, ওগডেন ও আই, এ, রিচার্ডস্ যে তাৎপর্যতত্ত্বে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন, তাকে আরো প্রসারিত করে গেছেন চার্লস মরিস, য়্যুরি লোটম্যান ও রোমান য়্যাকবসন্ । একোর চিন্তাসৌধ গড়ে

উঠেছে সহযাত্রীদের সমস্ত উপাদান ও বয়ান আত্মস্থ করে । জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্রে (১৯৭৬) একো নিজেকে 'Peircist' বলে ঘোষণা করেছিলেন ।অর্থাৎ ঐতিহ্য-পরম্পরাকে স্বীকৃতি জানিয়েই চিহ্নবিজ্ঞানী হিসেবে নিজস্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তিনি । মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় কেবল চিহ্নবিজ্ঞানকে প্রসারিত করেননি একো, বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে তার অন্বয় তৈরি করার কথা ভেবেছেন । ইতালির বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী জর্জিয়ো প্রোদি (১৯২৮-১৯৮৭) চিকিৎসাবিজ্ঞান, চিহ্নবিজ্ঞান ও জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে ভাষাদর্শন ও যুক্তিবিদ্যার আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় 'জৈবচিহ্নতত্ত্ব' নামে নতুন এক ঘরানার জন্ম হয়। বিভিন্ন বিদ্যাপরিসরের মধ্যে অনোন্য-উদ্ভাসন কী অমেয় উচ্চতায় পৌঁছাতে পারে, প্রোদি তা দেখিয়েছেন। একোর সঙ্গে তাঁর নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল। দু'জনের সম্মিলিত উদ্যোগে ১৯৮৬-তে জৈবচিহ্নতত্ত্বেরও আরো একটি প্রশাখা প্রস্তাবিত হয় যাকে পণ্ডিতেরা 'immunosemiotic'. (ব্যাধি-নিরোধ-বিষয়ক চিহ্নবিদ্যা) বলেছেন। অর্থাৎ, জীবন ও মননের সম্ভাব্য সমস্ত অনুপুঙ্খ সম্পর্কে প্রগাঢ় কৌতূহল একোর। পিকাসোর মতো তিনিও এই বার্তা নিয়ে এসেছেন যেন, 'I am curious about every aspect. moment and phenomenon of life. I am curious about every dream. My curiosity crosses over every frontier of curiosity.' (Understanding Picasso : 1974 : 88)

আসলে এভাবে সংস্কৃতিতত্ত্বেও নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচনের সম্ভাবনা প্রসারিত করে যাচ্ছেন একো। এতে বিদ্যাচর্চার পরস্পর-ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে বিশেষজ্ঞরা যোগ দিতে পারছেন অভাবনীয় উৎসাহে। চিহ্নবিশ্ব হয়ে উঠছে অন্তহীন সংশ্লেষণের আধার ও আধেয়। এতে ক্রমশ সমস্ত চিন্তা-প্রস্থানের আকল্প-নির্মাণে রৈখিকতা ভেঙে যাচ্ছে, প্রতিবেদনের সীমানা মুছে যাচ্ছে, ঐতিহ্য ও মৌলিকতার আততি নতুন তাৎপর্য নিয়ে আসছে এবং জ্ঞানের সন্ধিৎসায় অন্তর্বস্তু ও আকরণের চিরাগত আন্তঃসম্পর্কও পুনর্নির্ণীত হচ্ছে। সব মিলিয়ে, আমাদের চোখের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে প্রকৃত অর্থেই বিশ্বব্যাপ্ত এক 'Semiotic Landscape !' এই শব্দটিও একো দিয়েছেন আমাদের। ১৯৭৪ সালে তাঁর নিজের শহর মিলানে 'International Association for Semiotic Studies'— এর প্রথম অধিবেশন যখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেসময় তিনি কথাটি ব্যবহার করেন। পরে আলোচনাচক্রের ১২৩৮ পৃষ্ঠার বিপুলাকৃতি স্মরণিকায় তা প্রধান শিরোনাম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

আজ আমরা ঐ চিহ্নতাত্ত্বিক দৃশ্যসংস্থানের বাসিন্দা। অর্থাৎ শুধু যে চিহ্নবিজ্ঞানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও অন্বিষ্ট অনুশীলন করছি, তা-ই নয়। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, সন্ধানক্রিয়া-সন্ধিৎসুজন-অন্বিষ্ট একই মহাপ্রসৃতির আবশ্যিক ও অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে পড়েছি। আজ

ইতিহাস নিয়ে কথা বলি কিংবা সাহিত্য চিত্রকলা স্থাপত্য ভাস্কর্য সঙ্গীত নিয়ে, আর্থ-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতা কিংবা বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, তথ্য-বিনোদন আর বহির্বৃত উপস্থিতি নয়। সর্বতোভাবে চিহ্নায়িত অস্তিত্ব থেকে এক গণ্ডুষ চিহ্ন তুলে আনছি, হয়তো পরমুহূর্তে কিংবা পরবর্তী অবকাশে চিহ্নসাগরে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমরা একদিক দিয়ে কোনো-এক চিহ্নায়ন প্রকরণ দিয়ে নিজেদের সম্মোহিত করছি, আবার অন্য দিক দিয়ে নতুন ধরনের বার্তা উৎপাদন করে সেই সম্মোহন থেকে নিষ্ক্রমণের প্রস্তাবনাও করছি। সর্বত্র একোর সঞ্চরমান ছায়া ; বার্তা-সংকেত-ভাবাদর্শ কিংবা চিহ্ন-প্রতীক-ভাষ্য জুড়ে জীবন ও মননের গ্রন্থিল দ্বিরালাপের দিকে যখনই তাকাই, কোনো-না কোনো ভাবে ঐ ছায়ার অভিজ্ঞান স্পষ্ট হয়। একোর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রোক্কো ক্যাপোজ্জি তাই 'Reading Eco : An Anthology' বইয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য উপসংহার করেন এই বলে : 'Eco's fecund creativity and myriad enterprises evident as much in his life as in his writings, are bolstered by charm, wit and vigor This book is offered as an unpretentious iconic index of his persona ; the dynamic object and its multifarious symbols, taken together, certainly spice with exhilarating' brio these propitious times of the sign (১৯৯৭ : ষোলো)

চার

আজকের সময় চিহ্নের অভূতপূর্ব বিস্তারের সময়। আধুনিকোত্তর সাম্প্রতিক বস্তুত চিহ্নের সন্ত্রাস ও উন্মত্ততা প্রত্যক্ষ করছে বিহ্বলভাবে। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের রৈখিক সম্পর্কে বিপর্যয় ঘটে যাচ্ছে মুহুর্মুহু। চিহ্নায়ক-খচিত নিহিত পরাভাষ্য ও ভাষ্যকারের প্রস্তাবিত ভাষ্য ফলে সমান্তরাল, এমন কি, বিপ্রতীপ হয়ে পড়ছে। এ কেবল তাত্ত্বিকদের সমস্যা নয়, সাধারণ পাঠকেরও সংকট। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা থেকে কয়েকটি চিহ্নায়ন প্রকরণের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি প্রাগুক্ত ঐ সমান্তরালতা ও বিপ্রতীপতার। কবিসত্তা ও কথকসত্তার লুকোচুরি কখনো কখনো বিভ্রান্ত করে পাঠককে। পাঠক বিভ্রান্ত হন, কারণ বয়ানে-নিহিত পরাভাষ্য কৌতুকী-বিষণ্ণ-সংক্ষুব্ধ কবির বহুস্বরিক কল্পনা ও প্রত্যাঘাতপ্রবণ চাতুর্যের যুগলবন্দির ফসল। সম্ভবত জীবনানন্দ এর আদি পুরোহিত। নিম্নোদ্ধৃত পঙ্ক্তিগুলি এবার লক্ষ্য করা যাক;

ক. 'জীবন : ভারতের, চীনের, আফ্রিকার নদী পাহাড়ে বিচরণের মূঢ় আনন্দময় নয় আর
বরং নির্ভীক বীরদের রচিত পৃথিবীর ছিদ্রে ছিদ্রে
ইস্ক্রুপের মতো আটকে থাকবার শৌর্য ও আমোদ ;

তারপর চুম্বক পাহাড়ে গিয়ে নিস্তব্ধ হবার মতো আস্বাদ ?
জীবন : নির্ভীক নারীদের সৌন্দর্যের আঘাতে
নিগ্রো সংগীতের বেদনার ধুলোরাশি ?
কিন্তু এ বেদনা আত্মিক, তাই ঝাপ্‌সা— একাকী ; তাই কিছু নয় —,
(জীবনানন্দ : আজকের এক মুহূর্ত)

খ. 'এ-দেহ সঙ্কেতময় তুমি পড়ো, তুমি পাঠ করো
পাঁচটি আঙুলে ধরা অস্ত্রখণ্ড, তবু মন ভয়ে জড়োসড়ো—
ললাট আলেখ্যপ্রায়, ধাতা জগতের এ প্রতিফলন,
দেহ, যার ক্ষয় নেই, অশ্বহীন রণ,
সেতুহীন নদী, তার ঘাটে ঘাটে জ্বলছে শিবির,
গত রাত্রির যুদ্ধে, ক্ষপণক, তুমি নাকি বীর
প্রতিপন্ন হয়েছিলে ? অন্য পাড়ে কারা ছিল— কাদের বিলাপ
এখনও শুনছ তুমি ? জানো, যুদ্ধ শেষ। শুধু হিংসার অবলীঢ় তাপ
কিছু অবশিষ্ট আছে। আছে বটবৃক্ষে মানত, বাঁধুনি
এবং দেয়াল ঘেঁষে, মৃত্তিকায়, ফেটে যাওয়া মূর্তি শাক্যমুনি।'
(উৎপল কুমার বসু : সংহিতা ২)

এই দুটি বয়ানে বাচনভঙ্গি আলাদা। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই উদ্দিষ্ট গ্রহীতা-সত্তার অনুপস্থিত উপস্থিতি অনুভবগম্য। দুটি ক্ষেত্রেই কবিসত্তা নিজেরই অপর সত্তার সঙ্গে দ্বিরালাপে মগ্ন। শব্দের অন্তর্বর্তী শূন্যতা পাঠ করে মনে হয়, কবি নিজেই কিছু ইশারা দিতে চাইছেন। আবার, সেইসঙ্গে সংশয়ও সঞ্চারিত করছেন। দু'জন দু'রকমভাবে অস্তিত্বের অন্তর্বৃত বিপ্রতীপতার দিকে তর্জনি সংকেত করছেন। কিন্তু চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় এমন কিছু দূরান্বয় রয়েছে যার ফলে বয়ানে-নিহিত-পরাভাষ্য আর পাঠকের নির্ণীত তাৎপর্যের মধ্যে বড়সড় সংঘাতও যেন অনিবার্য হয়ে যায়। এই সংঘাতকেও শেষ পর্যন্ত তাৎপর্য-প্রতীতির কৃৎকৌশল বলে বুঝতে পারি।

কখনো-কখনো কবি ঐ সংঘাতের সম্ভাবনাকে আড়ালে সরিয়ে দেওয়ার জন্যে নানা ধরনের ছদ্মবেশ পরে নেন। জয় গোস্বামীর বাচন থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেখানে অন্তর্নাট্যের আকরণে আপাত-অলংকৃত বাক্‌রীতি সূক্ষ্ম বিপ্রতীপতার দ্যোতনা নিয়ে এসেছে। পরাভাষ্য ও সম্ভাব্য ভাষ্যের মধ্যে অনন্বয়ই এই কবিতার শক্তির উৎস ; এখানে বাচনের আপাত- সারল্য আসলে ছদ্মবেশ :

'নির্বাপণের একদিকে জলরাশি। অন্যদিকে
পোড়া মরুভূমি।

নির্বাপণের মাথায় একটা দাঁড়কাক বসে আছে।
ও-ই হল শেষ-হওয়া শিখা।
আমি বললাম : আমার তো
এখনও অনেক লেখা বাকি। আগুনের সঙ্গে
কথা বলা দরকার। সে কোথায় ?
নির্বাপণ বলল : ওই হোথা।
নির্বাপণের অঙ্গুলি-নির্দেশের সামনে একটা পাহাড়।
বিষাদ-পাহাড়।
তার নিচু গুহায় আগুন বসে আছে। ঘুঁষিতে রাখা থুতনি।
জুতোয় জন্মেছে ঘাস। ঊরুতে জন্মেছে। মস্ত পিঠ আর বাহুর
পেশী থেকে নামছে শেকড়। চুলে দাড়িতে কাঁটালতা দৃষ্টি ফাঁকা।
এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।' ('জয়ী' : ও: স্বপ্ন)

পাশাপাশি রণজিৎ দাশের আগাগোড়া চিহ্নায়ক-খচিত বয়ানে আপাত-জটিলতা কবির আড়াল রচনার কৃৎকৌশল। জয়ের উল্টো মেরুতে রণজিৎ-এর বাচন, কিন্তু এখানেও বয়ানে-নিহিত-ভাষ্য আর সম্ভাব্য ভাষ্যের মধ্যে বিপ্রতীপতা অনিবার্য :

'বাস্তবতার একমাত্র প্রমাণ স্মৃতি। একটি বৃদ্ধ মাকডসার স্মৃতি। আমি দেখছি সেই মাকড়সার জাল— যার মধ্যে আটকে আছে চাঁদ, জেলেনৌকো, কিশোরীদেব গানের বই, অজস্র ডাকটিকিট, রঙিন প্লাস্টিকের গ্লোব, মৃত্যু-টেলিগ্রাম। আমি নিজে সেই জালের সরু তারের ওপর দিয়ে হেঁটেছি। হাততালির শব্দ, ক্লাউনের হাসি এবং রোগা সিংহের গর্জন আমার দ্বারাই প্রমাণিত হয়েছে। এরপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে সার্কাসতাঁবুর বাইরে, এটাই নিয়ম। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখছি, কীভাবে বিহার জুড়ে গ্রীষ্মে লু বয়, ... কীভাবে পর্যটক বাঙালি দম্পতিরা আরো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে শিমূলতলা থেকে ফিরে আসে।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে দেখেছি, আমিই সেই বৃদ্ধ মাকড়সা ..... , ('মাকড়সা' : ঈশ্বরের চোখ)

এই যে চিহ্নায়ন প্রকরণের চার রকম উপস্থাপনা লক্ষ করলাম এতক্ষণ, প্রতিটি ক্ষেত্রে বিবরণ আমূল বিনির্মিত হয়েছে। এ এক নতুন আবহমণ্ডল, যেখানে শব্দ কখনো জ্যোৎস্না, কখনো খর-রৌদ্র। পরিচিত ভূগোল ও ইতিহাসের, দৈনন্দিনের অতিতুচ্ছ অনুপুঙ্খও চিহ্নায়কে রূপান্তরিত হওয়ার পরে কেমন রহস্যমেদুর। আবার বিচিত্র উৎসজাত চিহ্নায়কগুলি যখন একটি পাঠকৃতি গড়ে তোলার জন্যে পরস্পর-সংলগ্ন হয়ে পড়ে, ঐ

রহস্যমেদুরতাও আরো অজানা অচেনা গোলকধাঁধার সোপানে পরিণত হয়। লোটম্যান, একো ও তাদের সহযোগীরা যাকে 'Semiosphere' বলে বুঝেছেন, রহস্যের প্রগাঢ় উপস্থিতিতে চিহ্নায়ন প্রকরণের মধ্যেও নতুন ধরনের দ্বিবাচনিক পরিস্থিতি প্রকট হয়ে ওঠে। মনে পড়ে, খুব চমৎকার ভাবে ভিক্টোরিয়া লেডি হেলবিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন পিয়ার্স (১২ অক্টোবর, ১৯০৪) : 'A Sign of something by knowing which we know something more.' (হার্ডউইক : ১৯৭৭ : ৩১)। এর চেয়ে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে চিহ্নায়কের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট করা যায় না। 'যাকে জেনে আরো জানার ইচ্ছে জেগে ওঠে, তাকে বলি চিহ্ন'। ঠিক কথা। শুধু উদ্ধৃত চারটে কবিতার বয়ানেই নয়, আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতায় অর্জিত যে-কোনো সার্থক চিহ্নায়কের মধ্যে ঐ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা যে-পদ্ধতিতে বস্তুর মধ্যে চিহ্ন খুঁজি এবং সেই চিহ্ন থেকে অর্থ ছেঁকে নিই— তার কি ইতিহাস-নিরপেক্ষ কোনো অস্তিত্ব থাকা সম্ভব? সময় ও পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যদি কোনো ব্যাখ্যাতা চিহ্নবিজ্ঞানকে কাজে লাগান, বিশুদ্ধ (বা বিমূর্ত) জ্ঞানতাত্ত্বিক অধ্যয়ন হিসেবে তাঁর অধ্যবসায়কে গুরুত্ব দেওয়া যাবে কি? আজকের পণ্যায়ন-সর্বস্ব বিজ্ঞাপন-শাসিত বিশ্বায়নের মাদক-আচ্ছন্ন পৃথিবীতে প্রতিটি ভোগ্যবস্তু যখন তথ্যপ্রযুক্তির সর্বাত্মক সন্ত্রাসের কল্যাণে মর্যাদা ও প্রতাপের প্রতীক হয়ে উঠেছে— বিলম্বিত পুঁজিবাদী পর্যায়ের মানুষজন 'Commodity - fetishism'-কে অস্বীকার করতে পারেন না। সমস্ত দ্রব্যই তাঁদের কাছে আধিপত্যবাদের চিহ্নায়ক হিসেবে হাজির হচ্ছে ; চিহ্নের মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে ভোক্তার বর্গগত পরিচয়ের সূত্রে।

এ সম্পর্কে জাঁ বদ্রিলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রতিবেদন পেশ করেছেন; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য : The system of objects, The consumer society, For a Critique of the Political Economy of the Sign. The Mirror of Production ইত্যাদি। রাজনৈতিক অর্থনীতি কীভাবে চিহ্নের মূল্য নির্ধারণ করে এবং বহুবর্গ-বিভাজিত সমাজে কীভাবে ঐ মূল্য অবস্থানের ওপর নির্ভরশীল— সে-সম্পর্কে বদ্রিলার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন : 'Sign values are generated through hierarchical ordering among commodities, in which, for instance, certain types of cars or perfumes attain varying prestige through signifying the rank, social position and status of their owners or consumers. Sign values are thus characterized by differences and hierarchy, and are produced by a sumptuary operation connected to expenditure and social prestige.' (Dauglas Kellner : 1991 : 22-23)

এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধির জন্যে তত্ত্বজ্ঞ হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

আজকের ভারতবর্ষের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতের দিকে সাদা চোখে তাকালেই বর্গ-নির্ভর মূল্য-সূচকের অর্থ বুঝে নিতে পারব। মধ্যবিত্তের আওতায় যখন মারুতি ৮০০ বা ভ্যান এসে গেছে, ততক্ষণে মারুতি জেন ক্লাসিক ওয়াগন কিংবা মাতিজ ইন্ডিকা নির্ধারিত হয়ে গেছে উচ্চতর বর্গের অধিবাসীদের জন্যে। অন্যান্য ভোগ্যসামগ্রীও একইভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, চিহ্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ইদানীং অজস্র চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় অন্তর্নিহিত হয়েই আছে। কী রাষ্ট্রীয় প্রতাপে শৃঙ্খলিত আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে, কী শিল্প-সাহিত্যের নান্দনিক আবহে। কোনো ভাষ্যকারের পরিশ্রম ছাড়াই সময়ের সত্য (এবং সামাজিক ইতিহাসের সত্য) স্বয়ংপ্রকাশ এখন। বস্তুত সাম্প্রতিক আকরণোত্তরবাদী ও বিনির্মাণবাদী চিন্তাবিদেরা যে বলছেন, মানবিকী বিদ্যার পার্থক্য-নির্দেশক সীমারেখা দ্রুত অবান্তর হয়ে যাচ্ছে— এই উপলব্ধিতে চিহ্নতাত্ত্বিকেরা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই পৌঁছে যাচ্ছেন। তাই বাখতিন-বার্ত-দেরিদা-ফুকো-জেমসন-বদ্রিলার সাবলীলভাবে মিশে যাচ্ছেন একোর চিহ্নতাত্ত্বিক আবহমণ্ডলে।

পাঁচ

বিমানবায়নের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসে পীড়িত ও অজস্র বিয়োগ-প্রকরণে লাঞ্ছিত এ সময়ে একোর চিহ্নবিশ্ব পরিক্রমা কেন করব আমরা? করব এইজন্যে যে, তিনি চিহ্নায়কের নিবিড় পাঠে নন্দন, দর্শন ও সমাজতত্ত্বকে সার্থকভাবে মিলিয়ে নিয়ে প্রমাণ করেছেন, এই চিন্তাপ্রস্থানের মূল প্রেরণা সংযোগ। জীবন মানে যেহেতু অংশের সঙ্গে সমগ্রের নিরন্তর গ্রন্থনা, জীবনের মূল অন্বিষ্ট সংযোগ। এভাবে চিহ্নবিজ্ঞানের পাঠ হয়ে ওঠে জীবনের পাঠ। এ বিষয়ে একোর মন্তব্য যখন পড়ি, সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশও থাকে না · 'Semiotics studies all cultural processes as processes of communication. Therefore each of these processes would seem to be permeated by an underlying system of signification.'(A Theory of Semiotics : 1975 : 8)। প্রতিটি সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে অন্তর্লীন চিহ্নায়ন প্রকরণ— এই উচ্চারণের গুরুত্ব অনেকখানি। পিয়ার্স বা সোস্যুর বা লেভিস্ট্রাউস বা চমস্কির মতো চিন্তাবিদেরা চিহ্নায়ন ও সংযোগের যত ধরনের আকল্প উপস্থাপিত করেছেন, তাদের সবগুলিকে আত্তীকরণ করেই নান্দনিক ও সাংস্কৃতিক চিহ্নবিজ্ঞান নিজস্ব তত্ত্বপ্রস্থান গড়ে তুলেছে। এই নিবন্ধের শুরুতে লিখেছি, একো এমন-এক ব্যাপক তত্ত্বপ্রস্থানের কথা ভেবেছেন যা এমন কি দর্শনেরও সার্থক বিকল্প হয়ে উঠবে। চিহ্নায়ন প্রকরণ ও সংযোগের মধ্যে মৌলিক কিছু পার্থক্য রয়েছে বলে এদের চিহ্নতত্ত্ব দুটি স্বতন্ত্র পথে বিকশিত হয়ে থাকে। কিন্তু একো এদের মধ্যে আপাত-স্বাতন্ত্র্য মাত্র দেখেছেন, বিরোধিতা স্বীকার করেননি। তাঁর মতে এরা

'mutually exclusive approaches in opposition'(তদেব) নয়।

সংযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে একোর বক্তব্য হল : এতে আছে (ক) বার্তার সঞ্চরণ (খ) নির্দিষ্ট উৎস (গ) নির্দিষ্ট সঞ্চারপথ এবং উদ্দিষ্ট গ্রাহক। এক্ষেত্রে একো মূলত রোমান য়্যাকবসনের অনুগামী। তিনি ধরে নিয়েছেন যে, সংযোগের মুখ্য আধেয় অর্থাৎ বার্তা মোটামুটিভাবে পাঁচটি প্রধান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। এই সূত্রে বলা যায়, চিহ্নায়ন প্রকরণ কেবলমাত্র তখনই সক্রিয় হতে পারে যদি আশ্রয় করার মতো সংকেত ইতিমধ্যে বর্তমান থাকে। মানে, কোনো-একটি বস্তু দিয়ে কোনো-কিছুর প্রতীতি যখন হয়, সংকেত দেখা দেয়। একটু আগে যেসব কবিদের বয়ান নিবিড় পাঠের জন্যে উদ্ধৃত করেছি, তাঁদের বাচনে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। জয় গোস্বামী যখন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেন 'ঘুমিয়েছো ঝাউপাতা'— নিশ্চয় তা সাধারণ ঘুম বা ঝাউপাতার কথা জানাতে চায় না। 'ঘুম' এবং 'ঝাউপাতা' দিয়ে কোনো বিশেষ তাৎপর্যের প্রতীতিতে আমাদের পৌঁছে দিতে চান জয়। তেমনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাত নেই, পাথর রয়েছে' কিংবা রণজিৎ দাশের 'জিপসিদের তাঁবু' ইত্যাদি। সংযোগ ঘটানো যখন অভিপ্রায়, উদ্দিষ্ট গ্রাহকের কাছে পৌঁছানোর জন্যে চাই সার্থক সঞ্চার-পথ এবং পরিবাহক। আর, অবশ্যই বহির্বৃত বস্তুর উপযুক্ত ও যুক্তিনিষ্ঠ বিকল্প। তবে এই প্রক্রিয়া সমস্যাশূন্য নয়। গ্রাহক-সত্তার কাছে কোন্‌টা তাৎপর্যবহ হবে, তা কিন্তু ঐ সত্তার প্রস্তুতি ও মানসিক প্রবণতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। অর্থাৎ সংযোগ ঘটানোর প্রকরণ যুগপৎ উদ্দিষ্টকে প্রকাশ ও আড়াল করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, অতি উদ্ভাসিত ও ঝাপসা করতে পারে একই সঙ্গে। আবার গ্রাহক-সত্তার দিক দিয়ে যদি ভাবি, তাঁর অর্থোপলব্ধি মানে সংকেতের রহস্য-মোচন। কিন্তু কোনো সংকেত বা চিহ্নায়ক পরম্পরার নিহিতার্থ সত্যিই উন্মোচিত হলো কিনা বা হলেও তা সবার কাছে সমান মান্যতা পাবে কিনা —তা জোর দিয়ে বলা যায় না। একো মনে করেন, সাধারণ চিহ্নবিজ্ঞানের তত্ত্ব যদি প্রতিটি চিহ্নের ক্রিয়াকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এবং চিহ্নায়ন প্রকরণের প্রতিটি উপাদানকে এক বা একাধিক সংকেতের নিরিখে অন্যোন্য-সম্পৃক্ত বলে দেখাতে পারে, তবেই তার সার্থকতা। চিহ্নবিজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য দুটি : সংকেতের তত্ত্ব এবং চিহ্ন উৎপাদনের তত্ত্ব।

এ বিষয়ে একো লিখেছেন : 'In principle, a semiotics of signification entails a theory of codes. while a semiotics of communication entails a theory of sign-production. The distinction between theory of codes and a theory of sign-production does not correspond to the ones between langue and parole, competence and performance, syntactics (and

semantics) and pragmatics.' (তদেব : ৪) অনেক চিহ্ন প্রয়োজনের খাতিরে কৃত্রিমভাবেও তৈরি করা যায়। যেমন সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনে তৈরি সংকেত কিংবা সমাজে তৈরি ভব্যতার সুনির্দিষ্ট কিছু বিধি-বিন্যাস। ইদানীং সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞান নিয়ে স্বতন্ত্র ধরনের প্রতিবেদন যদিও রচিত হচ্ছে, অভিপ্রায়, সঞ্চারমানতা ও সত্তাতত্ত্ব বা জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে বিচার্য সার্থকতা চিহ্নজিজ্ঞাসুদের কাছে বেশি গুরুত্ব পায়। তার ওপর রয়েছে সামান্য ও বিশেষের প্রচলিত দার্শনিক দ্বন্দ্বও।

একটু আগে চিহ্নায়ক খচিত বয়ানে নিহিত পরাভাষ্য ও ভাষ্যকারের প্রয়াসলব্ধ ভাষ্যের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্যের কথা লিখেছি, পরবর্তী পর্যায়ে রচিত বইগুলিতে একো তা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। তবে 'A Theory of Semiotics' লেখার সময়ই তিনি ভাষ্যকারের অবস্থান ও পদ্ধতি সম্পর্কে সানুপুঙ্খ আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর এই মন্তব্যটি লক্ষ করতে পারি : 'The interpretant is not the interpreter (even if a confusion of this type occasionally arises in Peirce). The interpretant is that which guarantees the validity of the sign, even in the absence of the interpreter' (তদেব :৬৮)। বয়ানে নিহিত পরাভাষ্যই যেহেতু চিহ্নায়কের বৈধতাকে নিশ্চিত করে, ভাষ্যকাবের শারীরিক উপস্থিতিও অপ্রয়োজনীয়। বিশ্বসাহিত্যের সমস্ত ধ্রুপদী পাঠকৃতি এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে। বাচনাতিরিক্ত উপস্থিতির প্রতি তর্জনি সংকেত করে ঐসব প্রতিবেদনে অন্তর্লীন পরাভাষ্য এবং এভাবে তা হয়ে ওঠে অদৃশ্য কিন্তু অমোঘ চিহ্নায়ক। একোর ভাষায় — 'The interpretant becoming in turn a sign and so on ad infinitum.' (তদেব · ৬৯)। অনন্ত এই বিচ্ছুরণই পাঠকৃতির শক্তি, কেননা এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে সাংস্কৃতিক অণুবিশ্বে।

পিয়ার্স এবং বাখতিন —দুজনেই বিশ্বাস করতেন, মানুষ নিজেই চিহ্নায়ক। যত ভাষ্যই করি, মানুষ সমস্ত সম্ভাব্য ভাষ্যের চেয়ে বড। অন্তহীন এই বিস্ময়ের উপলব্ধি যাঁর আছে, তিনি তো ভাষ্যের সীমাবদ্ধতাই লক্ষ করবেন। উপলব্ধি মানে নিত্য-নবায়মান প্রশ্নপরম্পরার মীমাংসা-প্রয়াস। বয়ানে নিহিত পরাভাষ্য যখন নিজে চিহ্নায়কে পরিণত হয়, দ্বিবাচনিকতার ক্ষেত্র আরো তীক্ষ্ণ ও প্রসারিত হয় মাত্র। চিহ্নায়ন প্রকরণের বিস্তার থামে না কখনো; চিহ্নবিজ্ঞানী এর বিভিন্ন অনুপুঙ্খের পারস্পরিক সম্পর্ককে জীবন-স্পন্দনে 'ঋদ্ধ' বলে অনুভব করেন। পরাভাষ্য ও ভাষ্যের দ্বিরালাপে ঐ জীবন্ত সম্পর্কের অনুশীলনই করে চলেছেন একো।

চিহ্নবিজ্ঞান, কথনবিশ্ব ও পাঠকের নির্মিতি

তথ্যের অভূতপূর্ব বিস্তার আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে অস্থির, অনিশ্চিত ও বিকেন্দ্রায়িত করে দিচ্ছে। কুইজ এখন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমের কল্যাণে জ্ঞানের লোকপ্রিয় বিকল্প। সমগ্রতার উপলব্ধি নিয়ে মাথাব্যথা নেই কারও। টুকরো-টুকরো মুহূর্তের-অস্তিত্বের -অণুতথ্যের মধ্যে অভিনিবেশ ফুরিয়ে যাচ্ছে। হয়তো অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি খণ্ডায়নে। এ এক জটিল সংকটের প্রহর যখন তথ্য হয়ে ওঠে সত্যভ্রমের আকর এবং আচ্ছন্ন করে দেয় সত্যের প্রতীতিকে। কিন্তু তথ্যের অরণ্যে পথ খুঁজতে খুঁজতে একসময় আবিষ্কার করি, ঝোপ থেকে মহীরূহ অথবা লতা থেকে কাঁটাগুল্ম পর্যন্ত প্রতিটি অনুপুঙ্খের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। আর, প্রতিটি অস্তিত্ব পৃথক তাৎপর্যের দ্যোতনা বহন করছে। ফলে আপাত-দৃষ্টিতে যাকে তথ্য বলে মনে হচ্ছে, তা আসলে সম্ভাব্য প্রতীকের আশ্রয়। কিংবা, বলা ভাল, তথ্যের ছদ্মবেশে প্রতীকের বয়ন ঘটছে বলেই সত্যের উপলব্ধি নিরালম্ব হচ্ছে না। এইজন্যে বোদলেয়ারের মতো সংবেদনশীল কবি বলেছেন, প্রতীকের অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিযত চলেছে মানুষ। চোখ তো আছে প্রত্যেকের, কিন্তু তা কেবল তাকিয়ে থাকার জন্যে নয়, দেখার জন্যে। যে-চোখ দেখে না তা কবির নয় কেননা দৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি হয় না। তাই শুধুমাত্র 'দ্রষ্টা' চোখের অধিকারীজনই তথ্যের খোসা থেকে সত্যের শাঁসকে চিনে নেন এবং এইভাবে আসলে পুনর্গঠন করেন বাস্তবকে। এখানে স্রষ্টা এবং ভাষ্যকার খুব কাছাকাছি, কেননা এঁরা উভয়েই পাঠকৃতিকে 'performance' হিসেবে প্রমাণ করেছেন। দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে তাঁরা সক্রিয় অংশ-গ্রহণ করেন তথ্যের সত্য হয়ে ওঠায় এবং আমাদের বুঝিয়ে দেন, সম্ভাবনা মূলত সংগঠন।

চিহ্নবিজ্ঞান (Semiotics) আজকের তত্ত্ববিশ্বে অন্যতম প্রধান চিন্তাপ্রণালী। তার মুখ্য প্রতিপাদ্য, এই জগৎ অজস্র চিহ্ন-পরম্পরায় বিধৃত। বিভিন্ন চিহ্নায়কের মিথষ্ক্রিয়া থেকে জন্ম নেয় তাৎপর্য। যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তা নিছক তথ্যের আশ্রয়ভূমি নয়, তথ্যের ভিত্তিতে সংগঠিত স্বাধীন চিহ্নায়কের আকব বলেই এই পৃথিবী এত রহস্যময়। পাঠকৃতি এই রহস্যের ছোঁয়ায় দীপ্যমান। নানা পদ্ধতিতে সংকেত ও তথ্যের দ্বিবাচনিকতা ব্যক্ত হচ্ছে অহরহ। স্রষ্টা এবং ভাষ্যকার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই অভিব্যক্তির অংশীদার অর্থাৎ কখনও তাঁরা সংকেতকে তথ্যায়িত করছেন আর কখনও বা তথ্যকে সাংকেতিকতায় ঋদ্ধ করছেন। সমস্ত তাৎপর্য প্রসঙ্গনির্ভর ও ক্রিয়াত্মক। প্রতিটি মানবিক ক্রিয়ার প্রাসঙ্গিকতা প্রমাণিত হয় যখন তা তাৎপর্য বহনের উপযোগী হয়ে ওঠে। তাই এমন-এক জগতে আমরা বাস করি যাতে কোনো শুদ্ধ বা সরল প্রসঙ্গ নেই। তাৎপর্যের সংকেত এইজন্যে নৈর্ব্যক্তিক

অভিজ্ঞতার বিষয় নয় কেবল, চিহ্নায়ক থেকে চিহ্নায়িতে পৌঁছানোর পথ অনবরত খুঁজে যাওয়াতেই ঘটে পাঠকৃতির বিস্তার। চিন্তার রৈখিকতা ভেঙে দিয়ে চিহ্নবিজ্ঞান কথার অন্তরালে অন্য কথা, রূপের অন্তরালে অন্য রূপ, সম্পর্কের অন্তরালে অন্য সম্পর্ক আবিষ্কার করতে শেখায়। এই স্বেচ্ছাবৃত বিপর্যাসের পরে দৃষ্টিও পুরোপুরি নতুন হয়ে ওঠে। যা এতদিন ছিল অন্ধকারে রুদ্ধ, সেখানে দেখা দেয় আলোর ঝলকানি। এই আলো কিন্তু চোখ ধাঁধায় না, দেখার দিগন্তকে বরং বাড়িয়ে দেয়। পুরোনো পাঠ থেকে ঝলসে ওঠে অভাবনীয় পাঠকৃতির নবীন রৌদ্রবলয়।

আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা জগৎ বলে জানি, সেই জানাকে বিভিন্ন সৃষ্টি-প্রকরণে রূপান্তরিত করি। এই প্রক্রিয়া পরিচিতকে অপরিচিত এবং অপরিচিতকে পরিচিত করে তুলছে। আমাদের জগৎ ভাষার জগৎ, বাচনের জগৎ, সংকেতের জগৎ, প্রতীকের জগৎ। ফলে যা আছে, শুধুমাত্র তার ভাষ্য করে নয়—যা নেই অথচ যাব থাকা সম্ভব, তার ভাষ্য করেও গড়ে ওঠে আমাদের প্রতিবেদন। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি আসলে নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ফসল। আবার, তা বিচিত্র ধরনের আকবণেরও সমষ্টি। বিমূর্তও মূর্ত হয়ে যায় এবং তাত্ত্বিকও তথ্যগত ধারণার বিষয় হয়ে ওঠে যখন তাকে আকরণেব মধ্য দিয়ে জানি, বুঝি। স্বভাবত আকরণবাদ (Structuralism) এর পাঁজর থেকে জন্ম নিয়েছে চিহ্নবিজ্ঞান। ভাষা যেহেতু একক বাচন এবং সামূহিক বাচনের দ্বিবাচনিকতায় বিকশিত হয়ে চলেছে, চিহ্নবিজ্ঞানের মূল কাজ বাচনকে বার্তাবাহক ক্রিয়া হিসেবে উপস্থিত করা। আবার যখন বলছি বার্তার কথা, গ্রাহক ও প্রেরক সত্তার উপস্থিতিও অনিবার্য হয়ে উঠছে। কত বিচিত্র উপায়ে এবং কত সার্থকতায়-ব্যর্থতায়, আনন্দে-বিষাদে, আত্মীকরণে- প্রত্যাখ্যানে ঐ বার্তা তাৎপর্যবহ হয়ে উঠছে আমাদের কাছে। এ জগতে তাই মানুষের ভূমিকা মূলত সংযোগ স্থাপনের নিরিখে নির্ধারিত হয়ে থাকে। কখনো তিনি বার্তা পাঠান, আর কখনও গ্রহণ করেন। কখনও তথ্য থেকে সংকেতের আকাশে পাখা মেলে দেন আবার কখনও সংকেত থেকে তথ্যের জমিতে ফিরে আসেন। এই সংযোগ যেমন বহির্বৃত তেমনি অন্তর্বৃত, তা যতখানি সংস্কৃতির চিহ্নায়নের ফলশ্রুতি ততখানি সামাজিক ক্রিয়ারও ফসল। জুলিয়া ক্রিস্তেভার প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে স্মরণ করতে পারি : "What Semiotics has discovered is that the law governing or if one prefers, the major constraint affecting any social practice lies in the fact that it signifies : i.e. that it is articulated like a language"[১]। এই যে সব-কিছুর মূলে চিহ্নায়কের অস্তিত্ব আবিষ্কার, এতে ভাষার অর্থই আমূল বদলে গেছে। ভাষা সেতু গড়ে তোলে নিশ্চয়, তবে এই সেতু দিয়ে তথ্যের বিনিময় হয় না কেবল ; সংকেতের চকিত উদ্ভাসন শ্রুত স্বরকে অশ্রুত স্বরের কাছাকাছি এনে দেয়। পরাভাষার সমান্তরাল অপর অস্তিত্ব ভাষার মধ্যে নিরন্তর

নবীন পরিসর আবিষ্কারের প্রক্রিয়াকে শানিত করে তোলে। এই প্রক্রিয়াতে চিহ্নায়কের সঙ্গে চিহ্নায়িতের সেতু গড়ে ওঠে।

আকরণবাদের সূত্রে' চিহ্নবিজ্ঞান মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠেছে, কারণ জন স্টারোক কথিত 'Statics of dynamic systems'[৩] হিসেবে আকরণবাদ পরিমাপ করে দেখায়—সমগ্রের সংগঠন গড়ে তুলতে টুকরো টুকরো উপকরণ ও অনুষঙ্গগুলি কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিচ্ছে ! একথা অস্বীকার করা কঠিন যে, আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আসলে কতগুলো কাঠামোর সমাবেশ। আমাদের চিন্তা, উপলব্ধি বা ঘটনাকে যদি বিনির্মাণ করি, ওইসব কাঠামো বা আকরণের সংগঠন সম্পর্কে অবহিত হই। তাই আকরণবাদের প্রথম কাজ হল সেইসব উপকরণের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যাদের সমবেত উপস্থিতিতে কাঠামোটি গড়ে ওঠে। যে-কোনো বিশ্লেষিতব্য বস্তুকে প্রাথমিকভাবে সমগ্র হিসেবে গ্রহণ করি যদিও, যতক্ষণ অংশের গুরুত্ব স্বীকার না-করছি অন্তত ততক্ষণ বস্তুটির তাৎপর্য বিমূর্ত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে অংশগুলির তাৎপর্য আলাদা-আলাদা ভাবে না-বোঝা পর্যন্ত সমগ্রের প্রতীতি অসম্ভব। একক অনুষঙ্গের সংকেত যখন যথার্থভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অজস্র আকরণে বিন্যস্ত সমগ্রের জটিল আয়তন তখনই অর্থবহ হয়ে ওঠে। সুতরাং চতুর্দিকে বহমান জীবনপ্রবাহ তার অজস্রতা ও জটিলতা দিয়ে আমাদের প্রতীতিকে, ব্যাখ্যার প্রকরণকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করছে বলে উপলব্ধির যুক্তিগ্রাহ্য মান্যতার এত অনিবার্য প্রয়োজন। আকরণবাদ সমগ্রতার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কার্যকরী বৌদ্ধিক কৃৎকৌশল হিসেবে আমাদের কাছে তাৎপর্য সন্ধানের নতুন নিবিড় পদ্ধতিকে তুলে ধরছে। এইজন্যে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞান অভিন্ন তত্ত্ববিশ্বের দুটি বিশিষ্ট অঙ্গ। বহু আকরণে বিন্যস্ত বাস্তবতা কীভাবে অজস্র তাৎপর্যের অনুপুঙ্খ-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সমগ্রতার দ্যোতনা নিয়ে আসে, এই বিশ্লেষণ খুব কৌতূহল-ব্যঞ্জক। মানবিক জিজ্ঞাসামাত্রই গভীর দ্যোতনার সন্ধানী। এই সন্ধানকে প্রণালীবদ্ধ ভাবে লক্ষ্যাভিমুখী করে তুলেছে চিহ্নবিজ্ঞান। মূর্তকে বিমূর্ত করা এর উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রাথমিকভাবে যা অস্পষ্ট, সুদূর, ধারণাতীত — তাকে গভীরতর প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলাই তার লক্ষ্য। এভাবে বিশেষের সঙ্গে নির্বিশেষের সেতু রচিত হয় এবং মানবিকী বিদ্যা হয়ে ওঠে আরও ভূমি-সংলগ্ন।

দুই

আকরণবাদ ও চিহ্নবিজ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুর-এর বহুপঠিত গ্রন্থ 'Course in general linguistics' (১৯১৫)-এর মধ্যে। তাঁর দুটি যুগান্তকারী পারিভাষিক প্রয়োগ — সামুহিক বাচন (Langue) ও একক

বাচন (Parole)-এর সূত্রে আমরা জেনেছি, ভাষার সামাজিক ও অবচেতন বৈশিষ্ট্য অন্যোন্য-নির্ভর। আর, বিবিধ উচ্চারণের সূক্ষ্ম ও জটিল আততিতে গড়ে উঠেছে ভাষার বিপুল আয়তন। সোস্যুর যেভাবে ভাষাতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এবং শব্দ ও বস্তুর প্রকৃত সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা অনুসরণ করে আমরা বুঝতে পারি, কোনো একক উচ্চারণের স্বাতন্ত্র্যও অনেকান্তিক সমগ্রতার আবহে নির্ধারিত হয়ে থাকে। এই সূত্রে আমরা যখন কোনো কবিতা বা আখ্যান বা প্রত্নকথার প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করি, তাদের একক সত্তার ও উচ্চারণের বিশিষ্টতাকে কেবলমাত্র চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে অনুধাবন করি। এই চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার নিয়ন্তা পদ্ধতিই অনুশীলনযোগ্য। সোস্যুর-এর মতে শব্দ হলো মূলত চিহ্ন। লেখ্য বা কথ্যভাষা নির্বিশেষে এই চিহ্নের একটি দিক হলো চিহ্নায়ক (Signifier) এবং অন্য দিক হলো চিহ্নায়িত (Signified)। কোনো শব্দ যখন সার্থক চিহ্ন হয়ে ওঠে তাতে চিন্তাবীজ যেন শরীরী রূপ গ্রহণ করে । মানুষের পৃথিবী মূলত নানাবিধ উচ্চারণের বয়নে নির্মিত। এইজন্যে চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে কার্যত মানুষের যাবতীয় অস্তিত্ব-সম্বন্ধীয় এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা ও রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ভাষা প্রণালীবদ্ধ করে।

চিহ্নবিজ্ঞান ভাষার মূল প্রবণতাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এবং ক্রমশ তা পাঠকৃতির অণুবিশ্বকে অনেকার্থদ্যোতনায় সমৃদ্ধ করেছে। উমবের্তো একো[৫] ও ইউরি লোটম্যান তাঁদের সংবেদনশীল ভাষ্যের মধ্য দিয়ে এই ধারাকে বিশেষভাবে পুষ্পিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে একটি প্রাজ্ঞ উক্তি : যখন আমরা কোনো পাঠকৃতির গভীরে যাই, প্রতিটি স্তরে সেসময় অলিখিত সাংস্কৃতিক বিশ্বকোষকে অনুসরণ করি। এদের মধ্যে সবটাই যে সজল মেঘের নীলাঞ্জন ছায়া, এমন নয়, বেশ কিছু ব্যাসকূটেরও মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু প্রতিটি তাৎপর্য যেহেতু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়, মরুবিজয়ের কেতনও ওড়াতে হয় পাঠককে। স্বভাবত চিহ্নায়কের আকল্প ও সামাজিক চর্যার মধ্যবর্তী সংযোগ খানিকটা প্রকাশ্য খানিকটা প্রচ্ছন্ন। চিহ্নায়িতের উপকূলরেখা যখন খুঁজব, একথা মনে রাখতে হবে। অনন্ত চিহ্নায়ন পদ্ধতির প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, এ বিষয়ে তাত্ত্বিকেরা নানা ধরনের সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন। আপাতত রোমান য়্যাকবসনের একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি : 'Every message is made of signs; correspondingly, the science of signs termed semiotics deals with those general principles which underlie the structure of all signs whatever, and with the character of their utilization within messages, as well as with the specifics of the various sign-systems, and of the diverse messages using those different kinds of signs'।[৬] এখানে যেমন বলা হয়েছে, সমস্ত চিহ্নের অন্তর্নিহিত আকরণ সঞ্চালিত

হচ্ছে যেসব সাধারণ নিয়ম দিয়ে, তাদের অনুশীলন করে চিহ্নবিজ্ঞান। প্রতিটি বার্তা যেহেতু চিহ্নায়কের নির্মিতি, সুনির্দিষ্ট ব্যবহার-উপযোগিতা এবং সংযোগের পরম্পরার ওপর নির্ভর করছে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সার্থকতা। পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী স্তরবিন্যাসের ওপর ওই প্রক্রিয়া আলোকসম্পাত করে এবং অনেক আপাত-নিঃসম্পর্কিত অনুপুঙ্খের গ্রন্থনায় খুঁজে পায় নিবিড় ঐক্যবোধের প্রতীতি।

চিহ্নবিজ্ঞানের সূত্রে আমরা এই মৌলিক সত্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছি যে ভাষা-চেতনা-সংস্কৃতি-শিল্পাভিব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে নিরবচ্ছিন্ন চিহ্নায়কের সমষ্টি। জীবন ও জগৎ থেকে প্রতিনিয়ত যত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, সেসব নানা ধরনের চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় সংকেতগূঢ় হয়ে ওঠে। অবশ্য এই গ্রন্থনার সরলীকৃত রূপ নেই কোনো। তাই এরা সর্বদা সরাসরি ও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় না। কোন্ প্রতিবেদনে কীভাবে এরা উপস্থাপিত হচ্ছে, তার ওপর এদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেকটা নির্ভর করে। গ্রহীতাকে তাই মনে রাখতে হয়, জগৎ ও জীবনের বিবর্তনশীল পরিসর বিশেষ সময়ানুভূতিতে সংলগ্ন হয়ে বস্তুকে প্রতীক করে তুলছে বলে সৃষ্টিশীল ভাষা কখনও একমাত্রিক হয় না। তেমনি অন্যদিকে প্রতীকও তো গৃহীত হচ্ছে বস্তুর প্রত্যক্ষতায়। যখন এই অন্তর্গূঢ় দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হন গ্রহীতা-পাঠক, সৃজনাত্মক প্রতিবেদনের অনেকান্তিক তাৎপর্য তাঁর দ্রষ্টা চক্ষুতে উদ্‌ভাসিত হয়ে ওঠে । তবে বহুমাত্রিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার সূক্ষ্মতা ও সৌরভ সবচেয়ে চমৎকার ভাবে ধরা পড়ে কবিতার বয়নে।

তিন

পরাভাষার দ্যুতি কীভাবে কবিতার চিহ্নায়ক-খচিত ভাষায় প্রকাশিত হয়ে থাকে, তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এবার দেওয়া যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত ক :

আমরা যাই নি মরে আজো — তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় ;
মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন — এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে[৬]

এই আশ্চর্য রহস্যদ্যোতক পঙক্তিগুলি যদি বিনির্মাণ করি, দেখব, চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বস্তু হয়ে উঠেছে প্রতীক। পদান্বয় ও শব্দানুষঙ্গ বদলে গেছে। আমাদের চেনা পৃথিবীর অনুষঙ্গ থেকে পাওয়া চিহ্নায়কগুলি যখন পূর্বাগত আকরণদের বিপর্যস্ত করে

দিয়েছে— ভাষা পৌঁছে গেছে পরাভাষার আঙিনায়। এ ধরনের পরা-উপস্থিতিতে কল্পনা পেরিয়ে যায় বাস্তবকে এবং তথ্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সংকেত। স্বভাবত পরিচিত দৃশ্যের পাঁজর থেকে জন্ম নেয় অপরিচিত, এমনকি উদ্ভট ও অসম্ভব দৃশ্যাবলি। মহীন কে এবং মহীনের ঘোড়া কি সতিাই সেই মহীন নামক সাংকেতিক অস্তিত্বের ঘোড়া — এসব জিজ্ঞাসা অবান্তর হয়ে পড়ে! শুধু কি তাই! আমরা ঘোড়া বলতে যে প্রাণীটিকে বুঝি, তাকে না- বুঝিয়ে কেবলমাত্র গতি অর্থাৎ সময়ের চিহ্নায়ক হিসেবেও ধরে নেওয়া যায়। কার্তিকের জ্যোৎস্না কোনো মৃদুস্বরিক শান্ত আয়তনের সংকেত বা 'প্রান্তর' উচ্চারণের মধ্যে পাচ্ছি শব্দাতিগ বিস্তৃতি আর দ্যোতনার মায়া — পাঠক এমনও ভাবতে পারেন। প্রস্তরযুগের ঘোড়া বলতে কি তবে খণ্ডকাল পেরিয়ে-যাওয়া মহাসময়ের বার্তা উঠে আসছে? কেনই বা কিমাকার ডাইনামোর মতো বাক্‌ব্যবহার? তাকে কি বলব যন্ত্রসভ্যতার কুশ্রীতা ও স্থূলতার প্রতি জীবনানন্দ-সুলভ ধিক্কার! 'ভিড় রাত্রির হাওয়া'র মধ্যে যেটুকু আপাত-অসম্বদ্ধ ভাবনার গ্রন্থনা, তাতে চিহ্নায়কের সূক্ষ্মতা ধরা পড়েছে কি?

এই যে পরপর প্রশ্ন উঠে এল, চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া কি তবে এভাবেই প্রশ্নমালা তৈরি করে সম্ভাব্য মীমাংসার দিকে নিয়ে যায়? প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে খুঁজতে জীবন ও জগতের পাঠ বিশ্লেষণ করার জন্যে পরাবয়নের সম্ভাবনায় পৌঁছান সেই পাঠক, যিনি আসলে চিহ্নবিজ্ঞানী। সময় ও পরিসরের সূক্ষ্ম ও বহুমুখী আততিতে গড়ে ওঠে যে অন্যোন্য-নির্ভর গ্রন্থনা, তাকে ক্রনোটোপ নামক পারিভাষিক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন এসময়ের অগ্রণী তাত্ত্বিক, মিখায়েল বাখতিন। লক্ষ্য করলে বুঝব, চিহ্নায়কের পরম্পরায় ওই আততি কত বিচিত্র অভিব্যক্তি পেয়ে চলেছে। জীবনানন্দের ' ঘোড়া' কবিতার সমাপ্তিবিহীন উপসংহারে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত পরাভাষা সমে এসে পৌঁছেছে :

> প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
> সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে;
> এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

আপাত-দৃষ্টিতে যারা পরস্পর-নিঃসম্পর্কিত তথ্যের দুনিয়ায়, চিহ্নায়কের পরাজগতে তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব ও গোপন সুড়ঙ্গলালিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একেই বলি কবিত্ব, বলি নবীন সৃষ্টি। বিশেষ্য-বিশেষণ-ক্রিয়ার বিপর্যাস তখন প্রতিবেদনের মূলাধার হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য, জীবনানন্দের আরও অজস্র কবিতায় চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার চমৎকার উপস্থিতি লক্ষ করা সম্ভব। এবার আমরা বরং পরবর্তী কবিদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারি।

দৃষ্টান্ত খ :
দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কড়া নাড়া
'অবনী বাড়ি আছো' ?
বৃষ্টি পড়ে এখানে বারো মাস
এখানে মেঘ গাভীর মত চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস দুয়ার চেপে ধরে
'অবনী বাড়ি আছো ?'[৮]

জীবনানন্দের মতো শক্তি চট্টোপাধ্যায়েরও বেশ কিছু কবিতায় শাব্দিক তথ্য অবান্তর হয়ে পড়েছে চিহ্নায়কের দ্যুতিতে। এই দৃষ্টান্তে যে আত্মনাট্যের সংকেত পাচ্ছি, কবিতা সেখানেই। জীবনানন্দের প্রাগুক্ত কবিতায় যেমন মহীনের ঘোড়া মানে নিছক মহীনের ঘোড়া নয়, তেমনি শক্তির কবিতাতেও অবনীর বাড়ি কেবল অবনীর বাড়ি নয় — এর চেয়ে আলাদা এবং বেশি কিছু। কবিতাটির মূল ভরকেন্দ্র কিন্তু খুব সরল এবং প্রত্যক্ষগোচর। তবু এই অজটিল তথ্যগত ভিত্তি কবিতার নিয়ামক নয়। তথ্যের ভিত্তিকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে যে-চিহ্নায়কের গ্রন্থনা, আসলে তাই কবিতাটির আকর। নইলে গভীর রাত্রে কোনো ঘুমন্ত পাড়ার ছবি, অনবরত কড়া নাড়ার শব্দ এবং গভীর রাতে কোনো এতোলবেতোল মাতালের অবনী নামে বন্ধুর বাড়ি খোঁজা — এমন কিছু উল্লেখনীয় বৃত্তান্ত নয়। কিন্তু যখন কোনো অনিকেত সত্তাকে আর্তভাবে আশ্রয় খুঁজতে দেখি আমরা ওই তথ্যের আড়ালে, সেসময় গভীরতর মানসিক সংকেত আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই তথ্যাতিগ চিহ্নায়নের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় কবিতা। ঠিক তার পরবর্তী স্তবকে যেটুকু শান্ত প্রকৃতির অনুষঙ্গ রয়েছে, বিপ্রতীপের আবহ তৈরি করে বলেই কবিতার বাচনিক আকরণে তার গুরুত্ব। আবার 'পরাঙমুখ' বিশেষণটি যখন অপ্রত্যাশিত ভাবে 'সবুজ নালিঘাস' - এর সঙ্গে যুক্ত হয়, নিছক নৈসর্গিক অনুপুঙ্খ বলে তাকে আর বিবেচনা করি না। সবশেষে কোনো-এক অবনীর প্রতি আর্ত প্রশ্ন যখন পুনরাবৃত্ত হয়, চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক কালের পথভ্রান্ত সত্তার অমোঘ কণ্ঠস্বর যেন নীড়ে ফেরার ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করছে — এমন মনে হয়। এ যেন ভ্রাম্যমান সত্তার তাৎপর্য সন্ধানের সন্দর্ভ হিসেবে কবিতার অন্তঃশায়ী চিহ্নায়িতকে আরও গভীরতর তাৎপর্যে যুক্ত করেছে। তাৎপর্যের এই তাৎপর্য-সন্ধান শক্তির কাব্যভাষাকে অভূতপূর্ব দ্যোতনায় ঋদ্ধ করেছে। ভুবন পরিক্রমা শেষে বাচন ফিরে এসেছে পরাভাষার নীড়ে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বাখতিনের প্রবাদপ্রতিম কাব্যিক উচ্চারণ : 'Every meaning has its own home coming

festival'। এভাবে শক্তির অণুবিশ্ব জুড়ে চিহ্নায়ন- প্রক্রিয়া পর্যাপ্ত স্মরণীয় পঙ্ক্তির জন্ম দিয়েছে। নিবিড় পাঠ থেকে বুঝতে পারি, এই প্রক্রিয়ায় রয়েছে অসংখ্য প্রাকরণিক বিন্যাস। স্বভাবত এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। এবার আমরা শক্তি-পরবর্তী কবিদের মধ্যে ভাস্কর চক্রবর্তীকে বেছে নিতে পারি।

দৃষ্টান্ত গ :

আমি কি পাহারা দেবো
ছোটো বোন ঘুমায় যখন
দুপুরে, আকাশ নীল
শরীরে শান্ত কলরব
আমি কি ঘুমবো পাশে
ছোটো বোন ঘুমায় যখন ৮

এই আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল কবিতায় চিহ্নায়কের দীপ্তিতে তথ্য যেন কুয়াশালীন ধূসর দিগন্তের মতো দূরে মিলিয়ে গেছে। প্রায় নীরবতার কাছাকাছি এর বাক্‌বন্ধ আগাগোড়া নিভৃত সাংকেতিকতায় মণ্ডিত। কবিতায় সূত্রধার-সত্তা হিসেবে 'আমি' যদিও দু-বার উপস্থিত, উত্তমপুরুষের অবস্থান এখানে প্রায় দৃষ্টির অগোচর। মৃদু ও নিবিড উচ্চারণের লাবণ্যে যুক্ত হয়েছে আশ্চর্য রহস্যমেদুরতা। প্রতিটি অনুষঙ্গ এতে চিহ্নায়কের মর্যাদা অর্জন করেছে বলে শব্দ এখানে নৈঃশব্দ্যের নামান্তর। সব মিলিয়ে কবিতার সামগ্রিক বাচন হিসেবে আমাদের কাছে চিহ্নায়কের বিন্যাস পৌঁছে দিয়েছে তীব্র আত্মমুখী অনুভূতির বার্তা। ভাস্করের কবিতা এ কারণে আলাদাভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তথ্যের শৃঙ্খল ও চিহ্নায়কের বিন্যাসের মধ্যবর্তী জলবিভাজনরেখা তাঁর রচনায় স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। যেসব ক্ষেত্রে বিন্যাসে উত্তরণ ঘটেনি, সে-সমস্ত লিখন-প্রয়াসকে তথ্যপুঞ্জ শৃঙ্খল হয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে নিয়েছে। স্বভাবত ভাস্করের কবিতায় এক ধরনের সাংবাদিকতা, তারল্য ও অগভীরতা প্রকট হয়ে পড়ে। সূক্ষ্মতা ও সংবেদনশীলতায় স্পষ্ট হলে তা-ই হয়তো চিহ্নায়কের মর্যাদাবান পদবি পেতে পারত। শক্তি ও অলোকরঞ্জনের মতো বড়ো বৃত্ত নয় তাঁর, তাই চিহ্নায়কের বৈচিত্র্যও কম। তবু আত্মজৈবনিক স্থাপত্যে প্রোথিত চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় তীব্রতা ও গভীরতার অভাব নেই। প্রাগুক্ত পূর্বজদের তুলনায় নির্মিতিহীন নির্মাণের প্রতি ভাস্করের ঝোঁক বেশি। এর কারণ, তাঁর চিহ্নায়কের লক্ষ্য ও আধেয় সাম্প্রতিক বিবর্ণ ও পুনরাবৃত্তিময় জীবন। যেমন :

অসংখ্য ছেঁড়া চটিজুতোর পাশে বসে বসে, প্রত্যেক দুপুরে, অদ্ভুত খেলা আমার
আমি হাঁ করি, মুখ দিয়ে ধুলো বেরোয় আমার
আমি চোখ বুজি, চোখ খুলে যায় আমার ভেতর থেকে —

একলা থাকতে থাকতে, থাকতে থাকতে
আমার গায়ে সবুজ শ্যাওলা গজিয়ে উঠবে একদিন
পোড়া বাড়ির মতো, আমি অদ্ভুত দাঁড়িয়ে থাকবো একদিন,
গভীর জঙ্গলের মধ্যে"

এখানেও চিহ্নায়ক বিনির্মাণপন্থী, তবে প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তের তুলনায় প্রতীকই বস্তু হয়ে উঠেছে অর্থাৎ তথ্য সূচনা থেকেই প্রতীকায়িত। ফলে পাঠক যখন চিহ্নায়কের মুখোমুখি হচ্ছেন, কোনো ধরনের সাংবাদিকতার মোকাবিলা তাঁকে করতে হচ্ছে না। মাইকেল রিফাটেরের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে খুব প্রাসঙ্গিক : 'A poem says one thing and means another' ![১০] কবিতায় যে-অংশটি 'বলে', তাতে বিবৃতি অতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়ে গেলে হয়ে ওঠে সাংবাদিকতা। কিন্তু বিবরণ ও তাৎপর্যের মধ্যে যে-ব্যবধানটুকু লক্ষ্য করেছেন তিনি, তা হলো চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্র। এছাড়া কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে রিফাটেরে বলেছেন ঐক্যবোধের কথা। জীবনানন্দ, শক্তি ও ভাস্করের কবিতা থেকে আমরা যে- দৃষ্টান্ত আহরণ করেছি, তাতেও এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

এ বিষয়ে আরও গভীরভাবে যখন ভাবি, কবিতা পাঠ হয়ে ওঠে ঐক্যের সন্ধান। কবিতার বাচনে যা প্রতীয়মান ও বহির্বৃত, সংবেদনশীল পাঠক তার মধ্যে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখেন না। চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় তিনি খুঁজে পান ঐক্যবিধানের পথ। তথ্যের প্রতীয়মান স্তর থেকে পাঠকৃতির তাৎপর্যের স্তরে পৌঁছানোয় যেহেতু উত্তরণের ইশারা পাচ্ছি, এতে জীবন ও জগতের বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্যবর্তী আন্তঃসম্পর্কের বিন্যাসেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। আপাত-স্তর থেকে গভীর স্তরে পাঠকৃতির সঞ্চরণ আসলে পরিচিত জগতের রূপান্তরেরই সূচক। রিফাটেরে মনে করেন, 'This functional shift is the proper domain of semiotics. Everything related to this integration of signs from the mimesis level into the higher level of significance is a manifestation of semiosis.'[১১]।

যেসব কবির রচনা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করেছি, রিফাটেরে-কথিত 'functional shift'-এর প্রমাণ তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। বলা বাহুল্য উৎপলকুমার বসু, বিনয় মজুমদার, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শামসের আনোয়ার, আল মাহমুদ, রফিকের মতো কবিদের প্রতিবেদন থেকে অজস্র উদাহরণ সংগ্রহ করতে পারি। চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়ার কত বিচিত্র অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি তাঁদের বাচনে। আরও পরবর্তী কবিদের মধ্যে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্ত, মৃদুল দাশগুপ্ত, রণজিৎ দাশ ও জয় গোস্বামীর প্রতিবেদন চিহ্নায়কের দ্যুতিতে সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ। এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে বেছে নিচ্ছি জয়ের একটি কবিতা।

দৃষ্টান্ত ঘ :

আসলে নখাগ্রে থাকে যা কিছু। শস্য, জ্ঞান, ছাই।
চাকার ঘূর্ণন, তীব্র কালো ঘোড়া, ব্যারাকপুরের
বাসের জানালা দিয়ে একদল স্কুলের কিশোরী ....
ভাঙ্গা ও আস্ত ডানা, ধবল টাওয়ার

....

শুকনো জ্যোৎস্না, ভিজে পরিখার পাশে পড়ে আছে হাড়, দুর্গের মাথায়
লাফিয়ে পড়েছে চাঁদ, ওষ্ঠ রাখবে বলে চূড়ায় । কফির
কাপ থেকে ঠোঁট তুলে স্টিল চশমা যে মেয়েটি দ্বিতীয় স্তবকের শেষদিকে
জানালায় তাকিয়েছিল, এক্ষুণি সে, ফের ঠোঁট নামালো কফিতে।

....

তুমিও ওষ্ঠ রাখো, কালো ওষ্ঠ, সাদা নীল পীত
রাখো এই শুশ্রূষায়, কাচ নয়, ধাতব বাটিতে ;
যে পাত্রে রয়েছে মদ, ঘনীভূত নাতি-শীত-উষ্ণ জলবায়ু আমাদের
বাষ্প ও আরক ।[১১]

এই প্রতিবেদনের মুখোমুখি হয়ে কেবল অজস্র চিহ্নায়কের স্বতন্ত্র দ্যুতিতে আবিষ্ট হই আমরা, তা কিন্তু নয়। অংশের দ্যোতনা সত্ত্বেও আমাদের অভিনিবেশ সমগ্রের প্রতীতিতে কেন্দ্রীভূত হয়। পরস্পর-নিঃসম্পর্কিত অনুপুঙ্খদের বয়নে রহস্যের বলয় যদিও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবু কবিতার সামূহিক আকরণ শেষ পর্যন্ত সব কিছু ছাপিয়ে যায়। দৈনন্দিন অভ্যাসের অঙ্গ হিসেবে সাধারণ ভাষাকে যেভাবে গ্রহণ করি, জয়ের শব্দবন্ধকে যদিবা প্রথমে সেভাবে পড়ি, অনতিবিলম্বে বয়ানের অর্ন্তবর্তী শূন্যায়তনগুলি প্রকট হতে শুরু করে। পাঠক তখন ওইসব আপাত-শূন্যায়তন সম্পর্কে মনোযোগী হয়ে ওঠে। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে দীপ্যমান হতে দেখি চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াকেও। চিরাচরিত যুক্তির বিন্যাস পেরিয়ে পরাবাচনের জন্ম হয় তখন। রিফাটেরে যাকে 'Ungrammaticalities' বলেন, ব্যাকরণের শৃঙ্খলা ভেঙে সেইসব পরাভাষার এককগুলি পাঠকৃতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রাগুক্ত দৃষ্টান্তে জয়ও বাক্ব্যবহারের প্রচলিত যুক্তিশৃঙ্খল ভেঙে দিয়েছেন। তথ্যাতিগ সংকেতে কীভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বয়ান, তা প্রাথমিক পাঠেই অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। টুকরো-টুকরো প্রতীকায়িত বিন্যাস নিশ্চয় মুগ্ধ করে, কিন্তু শুরু থেকেই যেন সামগ্রিক আকরণের প্রতি সচেতনতা তৈরি হয়ে যায়। পরিচিত বস্তুসম্বন্ধের বিপর্যাস যে ইচ্ছাকৃত অন্তর্ঘাত, একথা বুঝতে পারি বলে চিহ্নায়কের পরম্পরাকে সতর্কভাবে অনুসরণ করা আমাদের দায় হয়ে ওঠে যেন। বিবৃতির সীমানা পেরিয়ে যায় না শুধু এই কবিতা ; বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলি চিহ্নায়কের গ্রন্থনা করে তার

নির্মিতি অবসন্ন হয় না। বরং সামগ্রিক উপলব্ধির প্রতীতিতে যাবতীয় অস্তিত্বসম্বন্ধীয় ও জ্ঞানতাত্ত্বিক জিজ্ঞাসাকে সমন্বিত করে। জয়ের কবিতাপাঠক যথার্থ চিহ্নবিজ্ঞানী অভিযাত্রী হিসেবে প্রতিপন্ন হতে পারেন। আরও একবার রিফাটেরেকে স্মরণ করতে পারি এখানে। তাঁর মতে, কবিতার সামূহিক আকরণকে পাঠক যখন অনুভবগম্য করে তোলেন, নিরন্তর উত্থাপিত প্রশ্নমালার মীমাংসাসূত্র সহ বয়ানের অন্তর্বর্তী রহস্যমোচনের দিশাও তিনি পেয়ে যান।

রিফাটেরে লিখেছেন : 'Then suddenly the puzzle is solved. everything falls into place, indeed the whole poem ceases to be descriptive, ceases to be a sequence of mimetic signs. and becomes a single sign, perceived from the end back to its given as a harmonious whole. wherein nothing is loose. wherein every work refers to one symbolic focus.'[১৩] এই মন্তব্যের সূত্রে বলা যায়, কোনো কবিতার সম্পূর্ণ অবয়ব তখনই স্পষ্ট হতে শুরু করে যখন পাঠক সমাপ্তিবিন্দুতে পৌঁছে দ্রষ্টা চক্ষু নিয়ে ফিরে তাকান। কবিতার সূচনাবিন্দু থেকে চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় সময় ও পরিসরের যে-পর্যায়ক্রম আভাসিত হয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত কোনো অনুষঙ্গই অপ্রয়োজনীয় থাকে না। আপাতদৃষ্টিতে যা বিবৃতি-সম্পৃক্ত, তাও গভীরতার তাৎপর্যের বিস্তারে অন্বিত হয়ে যায়। সার্থক কবিতার প্রতিটি শব্দ এইজন্যে প্রতীকী প্রেক্ষণ-বলয়ে অপরিহার্য।

চার

চিহ্নবিজ্ঞানকে কবিতার হয়ে-ওঠার প্রক্রিয়া অনুধাবনের পক্ষে খুব কার্যকরী কৃৎকৌশল হিসেবে যখন বিবেচনা করি, স্বভাবত পাঠক্রিয়া ও সমালোচনাতত্ত্বের পক্ষেও এর আলাদা গুরুত্ব অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অবশ্য ভাষ্যের বহুমুখী বিস্তারের ফলে কিছু সমস্যাও অনিবার্য হয়ে পড়েছে। উমবের্তো একো যাকে 'অতিভাষ্য' বলেছেন, ব্যাখ্যায়ন যাতে তার কবলে গিয়ে না পড়ে — এ বিষয়েও সচেতন থাকতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিটি পাঠকৃতিতে কি একটিমাত্র কেন্দ্রীয় তাৎপর্য থাকে ? আবার, তাৎপর্যের বহুত্ব প্রতিবেদনে যদি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত না হয়, তাহলে ভাষ্যকার চিহ্নায়ন-প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে গিয়ে কতটা স্বাধীনতা পেতে পারেন? পাঠক নিশ্চয় অভিযাত্রী ও আবিষ্কারক। কিন্তু এমন যদি হয়, তাহলে একটি পাঠকৃতি থেকে একাধিক অর্থের প্রতীতিতে পৌঁছাবেন তিনি। তার মানে, চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় অজস্র চিহ্নায়িতের সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সুতরাং ভাষ্যও হবে ভিন্ন ভিন্ন। ভাষ্যের বহুত্ব পাঠকৃতির অন্তর্বর্তী শক্তির নিদর্শন। কিন্তু ভাষ্যের বহুত্ব আর অতিভাষ্য এক কথা নয়। অতিভাষ্যে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে

পড়ে। ফলে, এমনও হতে পারে, উদ্দিষ্ট সৃজনবর্গের আকরণ (যেমন কবিতা, ছোটোগল্প, উপন্যাস) ওই অতিভাষ্যের চাপে ঝাপসা হয়ে গেল। এখানেই তত্ত্বের নিয়ন্ত্রণ প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। চিহ্নবিজ্ঞান তাই কেবল কবিতা এবং অন্য শিল্পমাধ্যমের হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে উদ্‌ভাসিত করে না, পাঠক-প্রতিক্রিয়ার আয়তনকেও দেয় পথের দিশা। পাঠকৃতিকে যদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ বলে কল্পনা করি, তার পুনরভিনয়ে চিহ্নবিজ্ঞানই আবিষ্কারক পড়ুয়ার মঞ্চ-অবস্থানকে নির্ধারণ করে দেয়। অবশ্য, জোনাথন কুলেরের সতর্কবাণীর ধরনে ('The discourse which attempts to analyze metaphor does not itself escape metaphor.'[১৪]) বলা যায়, চিহ্নায়ক থেকে চিহ্নায়িতে পৌঁছানোর তথ্যাতিযায়ী পথ খুঁজতে খুঁজতে ভাষ্যের মায়ায় যেন ভাষ্যকার হারিয়ে না যান।

ভাষা নিশ্চয় প্রাণিত করে, ইশারাও করে; কিন্তু বিবরণ পেশ করাও তার প্রাথমিক দায়ের মধ্যে পড়ে। তাই যখন ভাত নেই পাথর রয়েছে (শক্তি) বা শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা (ভাস্কর) বা ৯ই ভাদ্র ১৩৯৫ (রাহুল)-এর পাঠকৃতিতে শুরু থেকেই প্রতীয়মান বিবৃতির স্তর পেরিয়ে যাওয়ার সংকেত পাই, বুঝতে পারি কেন কুলের সেই দ্বিধাহীন ও চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন : 'Semiotics is a metalinguistic enterprise. It attempts to describe the evasive, ambiguous, paradoxical language of literature in a sober, unambiguous metalanguage!'[১] অর্থাৎ শক্তির ভাত যেমন ভাত নয়, পাথরও নয় পাথর। শব্দ নামক খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে ওইসব শব্দের সাধারণ অর্থ মিলিয়ে গেছে সংকেতের আকাশে। তেমনি জীবনানন্দের বনলতা সেন বা অরুণিমা সান্যালদের মতো ভাস্করের সুপর্ণাও কোনো সুনির্দিষ্ট নারী নয়। তাঁর শীতকালও হিমঋতুর অনুষঙ্গকে সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে গভীরতর দ্যোতনাগর্ভ হয়ে উঠেছে। এ এমন শীতকাল যখন তিন মাস ঘুমিয়ে থাকা যায় কোলাহলমুখর ব্যস্ত পৃথিবী থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে। তেমনি রাহুল পুরকায়স্থের ৯ই ভাদ্র ১৩৯৫ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো তারিখের পঞ্জীয়ন নয়। তাঁর 'শ্বাসাঘাত, তাঁতকল, পুরোনো হরফ'ও বিবরণ দেয়নি, সংকেতের দ্যুতি ছড়িয়েছে। কবিতার ভাষা যে মূলত পরাভাষা এবং চিহ্নায়কের গ্রন্থনা তার আশ্রয়, নামকরণ থেকেই সেই বার্তা পৌঁছায় আমাদের কাছে। শব্দের আধারে অর্থের আধেয় কত বিচিত্রভাবে ব্যক্ত হয়ে চলেছে, এ বিষয়ে কবিদের সৃষ্টিশীল উদ্ভাসন বারবার কার্য ও কারণের অন্বয় পেরিয়ে যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া কি সর্বতোভাবে ব্যক্তি-নির্ভর ? পরিসর ও সময় কিংবা ইতিহাস ও সমাজের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক কি নেই?

উল্টোভাবে যদি বলি, এমন চিহ্নবিজ্ঞান আদৌ গড়ে উঠতে পারে কি যা সামাজিক অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিষ্কর্ষ নয়! এই সূত্র ধরে এগোতে এগোতে ক্রমশ মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব,

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব প্রভৃতি পরিসরে চিহ্নায়নের প্রেরণাগত উৎস খুঁজে পাই। সুতরাং শুধুমাত্র কবিতা বা ছোটোগল্প বা কথকতার নান্দনিক তাৎপর্য সন্ধানের বলয়ে এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ থাকছে না। বহুস্বরসংগতির পক্ষে তারও যাত্রা অবধারিত হয়ে যাচ্ছে। আবার এমনও নয় যে বিশ শতকের শেষের ক-টি দশকে চিহ্নবিজ্ঞান প্রাসঙ্গিক। কিংবা শুধুমাত্র আধুনিক ইউরোপ এই চিন্তাধারাকে লালন করেছে। কেননা প্রাচীন এবং মধ্যযুগেও তাৎপর্য-প্রতীতির প্রয়াস আমাদের নজরে পড়ে। বিস্তারিত আলোচনার যদিও সুযোগ নেই, এখানে এই উল্লেখমাত্র করে রাখছি যে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে প্রাচীন ভারতেও শব্দ ও অর্থের অন্যোন্য সম্পর্ক নিয়ে সূক্ষ্ম চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল। যাস্কাচার্য তাঁর 'নিরুক্ত' বইতে এর প্রমাণ দিয়ে গেছেন। আর, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী বইতে সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-বিধি গ্রথিত করে যাননি কেবল, ভাষাকে দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তাৎপর্য অনুশীলন সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য সূত্রও রেখে গেছেন। মধ্যযুগে ভর্তৃহরি এই ঐতিহ্যেরই বিস্তার ঘটিয়েছেন। আজকের এই পর্যায়ে যদি কোনো গবেষক প্রতীচ্যের তাত্ত্বিক বয়ানের সঙ্গে প্রাচ্যের ঐতিহ্যগত পাঠ-অভিজ্ঞতার সৃষ্টিশীল সমীকরণ করতে পারেন — তাৎপর্য-সমন্বয়ের প্রয়াস যে আরও সূক্ষ্ম, গভীর ও বিচিত্রগামী হয়ে উঠবে, এবিষয়ে সংশয় নেই কোনো।

তাৎপর্যতত্ত্ববিদেরা সত্তর দশকেই চিহ্নবিজ্ঞানের অনেকান্তিক দ্যোতনা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হয়েছিলেন। তাঁবা পরস্পব-বিচ্ছিন্ন গবেষণার মধ্যে অন্বয়সূত্র আবিষ্কার কবে শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপনের অনিবার্য প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এই তাগিদে ১৯৭৪ সালে ইতালির মিলান নগরে চিহ্নবিজ্ঞান অনুশীলনকারীদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও এই মহাসম্মেলন থেকে কোনো নতুন দর্শন বা চিন্তাপ্রস্থানের ফতোযা জারি করা হয়নি, তবুও প্রায় ছ-শো পঞ্চাশ জন প্রাজ্ঞ গবেষকের উপস্থিতি নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এর ফলে পরবর্তী দুটি দশকে চিহ্নবিজ্ঞানের চর্চায় আরও গতি সঞ্চারিত হলো এবং নতুন নতুন শাখা-প্রশাখায় তাৎপর্যতত্ত্বকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার তাগিদও ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠল। দেখা দিল সংশ্লেষণের বহুমুখী প্রয়াস। তাই আজকের দিনে চিহ্নবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি কেউ সাহিত্যিক পাঠকৃতির চিহ্নায়নকে ঈপ্সিত গুরুত্ব দিতে চান, তাঁকে সহযোগী সমস্ত চিন্তা-প্রস্থান সম্পর্কেও সম্যক অবহিত হতে হবে।

চিহ্ন বা 'Sign' কথাটি যেহেতু গ্রিক 'Semeion' শব্দ থেকে উদ্ভূত, ইংরেজিতে 'Semiotics' ও 'Semiology' নামক দুটি পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগে মূল ভাববীজের পরিবর্ধিত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি। প্রথমোক্ত শব্দটিকে যেহেতু চিহ্নবিজ্ঞান বলছি, শেষোক্ত

শব্দকে বলা যেতে পারে চিহ্নতত্ত্ব। এদের সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানেই যে, প্রথমটি ক্রিয়াত্মক এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানাত্মক। অর্থাৎ চিহ্নবিজ্ঞানে পারদর্শিতা আমাদের শব্দ থেকে চিহ্নায়ক নিঙড়ে নেওয়ার প্রায়োগিক কৃৎকৌশল শেখায় আর চিহ্নতত্ত্ব এই প্রক্রিয়ার অধিবিদ্যাগত দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে। আপাতদৃষ্টিতে চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সার্বভৌম অবস্থান প্রতীয়মান হয় যদিও, সমাজ-নিরপেক্ষ ও সময়-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব এদের নেই। তার মানে, সামূহিক বাচনের পরিধি-বহির্ভূত কোনো একক বাচনের সম্ভাবনা নেই কোথাও। এক্ষেত্রে রলাঁ বার্ত, জোনাথন কুলের ও উমবের্তো একোর তত্ত্বচিন্তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তবে, এঁদের অনেক আগে আমেরিকার দার্শনিক চার্লস স্যান্ডার্স পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১৪) চিহ্নবিজ্ঞান বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন।[১৬] একে তিনি বলেছেন বিজ্ঞানের বিজ্ঞান; তাঁর মতে এই হলো যুক্তিবিদ্যার আকর। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মূলত চিহ্ননির্মিত, বৈশ্বিক অভিব্যক্তির প্রতিটি স্তরে নিহিত রয়েছে চিহ্ন।[১৭] মানুষ নামক অস্তিত্বও তো অজস্র চিহ্নের সমষ্টি। বিভিন্ন চিহ্নের পার্থক্য নির্দেশ করার জন্যে তিনি বিচিত্র জটিল পদ্ধতির প্রস্তাবনা করেছেন। তাঁর প্রস্তাবিত বর্গীকরণ অনুযায়ী মোট ৫৯,০৪৯ ধরনের চিহ্ন হতে পারে। আবার হ্রস্বীকরণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী এদের মাত্র ৬৬টি বর্গেও বিন্যস্ত করা চলে। যাই হোক, এই জটিলতা স্পষ্টত পরবর্তী গবেষকদের বিভ্রান্ত করেছে।

পিয়ার্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হলো, সব কিছুই আসলে চিহ্ন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে সেস্যুর সমস্ত চিহ্নকে নিয়মাতিযায়ী ও আকস্মিকতা-প্রসূত বলে মনে করতেন। ব্যবহারের রীতি অনুযায়ী এদের স্বাভাবিক মনে হয় কখনও, আর কখনও আরোপিত। তবে সর্বদা সমস্ত চিহ্ন সামাজিক বিধিবিন্যাস ও চিহ্নায়নের ঐতিহ্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। পিয়ার্স প্রতীক, বাক্‌প্রতিমা, সূচক ইত্যাদি বর্গের আকল্প যদিও চিহ্নায়কের মধ্যে লক্ষ করেছেন — উপস্থাপনার ধরনে গুরুত্ব দিয়ে তিনি সোস্যুরের অনুরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। পরবর্তী চিন্তাবিদেরা বস্তু ও নিষ্কর্ষের সম্পর্ক নিয়ে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বে ভাষার ক্রিয়া ও ভূমিকা নিয়ে আরও বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। যেহেতু ভাষার মতো মানুষের জগৎও বহুস্বরিক, চিহ্নায়ন প্রকরণেব নিরবচ্ছিন্ন বিন্যাস ছাড়া এদের তাৎপর্য অনুধাবন অসম্ভব। 'উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম' -এর মতো চিহ্নায়কের উপস্থিতি সমস্ত পরিসর জুড়ে রয়েছে। আমাদের জগৎ চিহ্নের জগৎ, আমাদের জীবনও চিহ্নখচিত। মনে রাখতে হয় কেবল একথা যে, এইসব চিহ্নের মধ্যে বৈচিত্র্য অন্তহীন — 'Some more mental and spontaneous, others more material and regular' [১৮]। আমাদের চিন্তা ও উপলব্ধি অভিজ্ঞতা-নির্ভর, একথা যেমন যথার্থ তেমনি অভিজ্ঞতার নির্যাসই যে আমাদের অনুভূতির আকরণকে গড়ে তোলে - একথাও সমান সত্য। তাই

আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগৎকে যদি বুঝতে চাই, বস্তুর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনুধাবন করার সঙ্গে সঙ্গে এদের ভিত্তিতে নির্মীয়মান প্রতীকী আকরণ এবং বস্তু ও প্রতীকের বহুমুখী সম্পর্ককেও বুঝতে হয়। 'সত্তা মানে সমান্তরালতার বোধ' — বাখতিনের এই মহাসূত্র অনুযায়ী মানববিশ্বের চিহ্নায়কগুলি যদি বিশ্লেষণ করি, দেখব, বস্তু ও ক্রিয়া বা বস্তু ও তাৎপর্য যুগপৎ স্বতন্ত্র ও পরস্পর- সম্পৃক্ত হয়েই মানববিশ্বকে গঠন করছে। মানুষেব স্বাভাবিক প্রবণতা যে বস্তু-অতিযায়ী সংকেতের স্বরূপ উপলব্ধির দিকে, এবিষয়ে বিশ শতকের দার্শনিকেরা উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন রচনা করেছেন। বস্তুত বিদ্যাবত্তার নানা ধারার সমন্বয়ে চিহ্নবিজ্ঞানের বহুমাত্রিক পরিসর গড়ে উঠেছে। তাৎপর্য ও সংকেত যেহেতু মূলত সামাজিক প্রক্রিয়া, এ বিষয়ে গভীরতা ও ব্যাপ্তি যুক্ত হয়েছে সমাজতাত্ত্বিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও নন্দনতাত্ত্বিকদের যৌথ অবদানে। উনিশ ও বিশ শতকে মানুষের ভাববিশ্ব আমূল আলোড়িত হয়েছে যাঁদের দিগ্‌দর্শক বিশ্লেষণে, আজকের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অনুশীলন তাঁদের ছায়ায় লালিত না- হয়ে পারে না। এইজন্যে কার্ল মার্কস, এমিল ডুর্কহাইম, সিগমুন্ড ফ্রয়েড, মার্টিন হাইডেগাব ও মিখায়েল বাখতিনের মতো যুগান্তকারী চিন্তাবিদদের অমোঘ উপস্থিতি চিহ্নবিজ্ঞানের চর্চায় অনস্বীকার্য।

সুতরাং চিহ্নবিজ্ঞানকে মানুষেব চিন্তাবিশ্ব বিবর্তনেব ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলেনা । এ কেবল চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সামাজিক ভাষ্য কবার জন্যে নয়, যুক্তিবিন্যাসে নিহিত অন্ধতাকে পেরিয়ে দ্রষ্টা চক্ষুর উদ্ভাসনে পৌছানোর জন্যেও জরুরি। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্লদ লেভিস্ট্রস, মিশেল ফুকো, জাক লাকাঁ, লুই আলত্যুসের, রলাঁ বার্ত, জাক দেরিদার মতো চিন্তাবিদেরা বস্তু থেকে সংকেতে এবং সংকেত থেকে বস্তুতে পৌছানোর জন্যে অনেকান্তিক সংশ্লেষণী পথের নির্দেশ দিয়েছেন। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার উদ্দিষ্ট প্রতিবেদনের আদল এর ফলে অস্থির ও সঞ্চরমান হয়ে পড়েছে। ভাষার বাচন, প্রত্নকথার ভাববীজ, চিহ্নের সংকেতসূত্র—সমস্ত কিছুকেই আজ আমরা একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনা ও অবচেতনের দ্বিবাচনিক নির্মিতি বলে বুঝতে পারছি। সাম্প্রতিক কালে বিকেন্দ্রায়িত সত্তার উপলব্ধি মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন ধারায় যে গ্রন্থিল সমস্যা তৈরি করেছে, চিহ্নবিজ্ঞানকে ইদানীং সেই সংকটের মোকাবিলাও করতে হচ্ছে। সত্তার পরিসর জুড়ে অনবরত হ্যাঁ ও না- এর সংঘর্ষ এবং সমসাময়িক বিমানবায়িত পৃথিবীর ধূসরতা হয়তো পূর্ববর্তী অনেক সিদ্ধান্তকে নতুন প্রশ্নের মুখোমুখি করে তুলছে। আসলে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার উপযোগিতাকে তীক্ষ্ণ প্রশ্নে বিদ্ধ করছে চিহ্নবিজ্ঞানেরই নতুন প্রকরণ। যেন নিজেকে নিজেই বিশ্লেষণ করছে, আপন অস্তিত্বের তত্ত্বগত সমর্থন খোঁজার জন্যে বিবর্তনশীল বিশ্বের অভিঘাতে নতুন আধার ও আধেয় সন্ধান করছে। আর, এইজন্যে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় কোনো উপসংহার থাকতে পারে না। নিয়তসঞ্চরমান বলে আত্মপরীক্ষা

ও আত্মসমালোচনার প্রকরণ নির্মাণ করে যাওয়াই তার গোত্র-লক্ষণ। এ বিষয়ে জুলিয়া ক্রিস্তেভার চমৎকার মন্তব্য স্মরণ করতে পারি : 'Semiotics cannot develop except as a critique of semiotics. At every moment in its development semiotics must theorize its object. Its own method, and the relationship between them : it therefore theorizes itself and becomes by thus turning back on itself, the theory of its own scientific practice........ It is a direction for research, always open, a theoretical enterprise which turns back upon itself, a perpetual self-criticism.' [১৯]

কোনো সন্দেহ নেই যে সাম্প্রতিক বিশ্বপরিস্থিতির কূটাভাসপূর্ণ গ্রন্থিলতা শব্দ ও চিহ্নায়িতের যুগলবন্দিকে ক্রমাগত দুরধিগম্য করে চলেছে। পাঠককে আমরা অভিযাত্রী বলেছি; কিন্তু ইদানীং তাঁর সামনে যেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। সাহিত্য চিহ্নবিজ্ঞানীদের জন্যে যেমন সবচেয়ে বেশি প্রত্যাহ্বান নিয়ে আসে, তেমনি চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াও সাহিত্যেই সর্বাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম পরিসর পেয়ে থাকে। প্রত্যাহ্বানের কথা বলছি একারণে, সাহিত্যের তাৎপর্য কখনও স্পষ্টভাবে ধরা দেয় না। সোনার হরিণের মতো তা চিরকাল সন্ধানীদের নাগালের বাইরে থেকে যায়। শব্দের সহযাত্রী চিহ্নায়ক, আবার, শব্দের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে সহসা যাত্রাবিরতি করে কিংবা শব্দের উপকূলকে বহুদূর পেছনে ফেলে এসে যাত্রার বিপুল বিস্তার ঘটিয়ে দেয় ওই চিহ্নায়ক। সাহিত্যের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় এই কূটাভাস যেন সাধারণ নিয়ম। মোদ্দা কথা হলো পথ ও পাথেয় নির্ণয়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস, আত্ম-আবিষ্কারের সূত্রে জগৎ-বীক্ষণ, নিরন্তর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সৃষ্টিশীল সমীকরণের সূত্রসন্ধান। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গ্রহীতা-পাঠক আসলে সামাজিক ও আত্মিক অভিজ্ঞতার ভাষ্য রচনার প্রচলিত প্রকরণগুলির প্রাসঙ্গিকতাই অনবরত পরীক্ষা করতে থাকেন। ভাষার দায় যদিও উন্মোচনেব প্রতি, বহু ক্ষেত্রে ভাষা সত্যের প্রকাশক না-হয়ে আচ্ছাদকও হয়ে থাকে। এক দিকে রয়েছে তাব সৃজনশীল স্বভাব, অন্য দিকে 'মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ' তা পেতে রাখে 'নিপুণ হাতে'। ভাষার এই অন্তর্বৃত দ্বিবাচনিক পদ্ধতিকে মনে রেখেই চিহ্নসন্ধানী পাঠক এগিয়ে যান পাঠকৃতির দিকে, পূর্বাগত বিশ্লেষণী প্রকরণ ও সংকেতসূত্রের মুখোমুখি হয়ে কিছুটা গ্রহণ করেন কিছুটা বর্জন করেন আর কিছুটা নতুন চিহ্নায়নের নির্মাণও করেন। সুতরাং প্রতিবেদনের তাৎপর্যে পৌঁছানো মূলত সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া। লেখক ওই তাৎপর্যের আদি-সূত্রধার মাত্র; শুধু সংবেদনশীল পাঠকই সাহিত্যের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এ বিষয়ে জোনাথন কুলার লিখেছেন : 'Meaning is not an individual creation but the result of applying to the text operations and conventions which constitute the institution of literature.' [২০]

পাঁচ

মানুষিক অস্তিত্বের সাংগঠনিক রূপ দেখানোব বদলে আজকের চিন্তাবিশ্ব যদি তাকে চিহ্নসর্বস্ব হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায়, তাহলে মানবসত্তা কি নিছক নির্মিতি হয়ে দাঁড়ায় না? কয়েকটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি -প্রকরণের মধ্যে বিচূর্ণিত হয়ে গিয়ে মানুষ কি আর তাৎপর্যের উৎস ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হতে পারে? সেক্ষেত্রে উপন্যাসের কথাবয়ন থেকে মানুষের রহস্যময় উপস্থিতি আবিষ্কার ও পুনরাবিষ্কার করার বদলে কখনও খুঁজে পাব অবচেতনের চিহ্নায়ন, কখনও প্রত্নকথা ও সম্পর্ক-বিন্যাসের চিহ্নায়ক-পরম্পরা, কখনোও বা রাষ্ট্রযন্ত্রের ভাবাদর্শগত আকরণের ছায়া, কখনও ঐতিহাসিক সন্দর্ভের আততি। এই সবই নিশ্চয় অপরিহার্য আজ; কিন্তু চিহ্নসর্বস্বতাব আবর্তে মানুষ ডুবে যাচ্ছে কি না—তা লক্ষ করার দায় আমরা এড়াতে পারি না। একটু আগে যেমন লিখেছি, আত্মসমালোচনার প্রবণতাকে নিয়ত জাগ্রত রেখে চিহ্নবিজ্ঞান নিজস্ব প্রকরণে অন্তর্বৃত স্ববিরোধিতা ও সম্ভাব্য ভ্রান্তিবিলাস সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারে। এই পদ্ধতির নিরন্তর চলিষ্ণুতা সত্ত্বেও কোথাও যে সীমারেখা মেনে নিতে হয়, এই উপলব্ধি অতিভাষ্যেব বিপদ থেকে সতর্ক পাঠককে রক্ষা করতে পারে।

চিহ্নবিজ্ঞান যতক্ষণ কোনো-এক বিশেষ মানবিকী বিদ্যার চার দেওয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ নান্দনিক পরিসরের নিবিড় অনুশীলন সত্ত্বেও তা প্রাগুক্ত স্ববিরোধিতা ও কূটাভাস এড়াতে পারে না। কিন্তু যখন তাকে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এবং ব্যাপকতর ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে স্থাপন করি তখন সাংস্কৃতিক চিহ্নতত্ত্বের ইতিবাচক প্রেরণা ব্যক্ত হতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সূক্ষ্মতর গভীরতর ও ব্যাপকতর অপরতার অস্তিত্ব যখন স্বীকার করি, সত্তা ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিকতায় চিহ্নায়ক পরম্পরার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মিখায়েল বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব পর্যালোচনা করে আমরা তাই সাংস্কৃতিক চিহ্নবিজ্ঞানের উজ্জ্বল সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে উঠি। সেসময় তাৎপর্য বা নিষ্কর্ষ উদ্ভাসনী বলয়ের অন্য নাম হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি ঔপন্যাসিক পাঠকৃতির উল্লেখ করছি যেখানে আখ্যান আগাগোড়া সামাজিক চিহ্নতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। সেইসব পাঠকৃতির আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছে আমরা বহুমুখী চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার উদ্ভাসন সম্পর্কে নতুনভাবে সচেতন হয়ে উঠি। জীবনানন্দ দাশের মাল্যবান ও জলপাইহাটি, কমলকুমার মজুমদারের অন্তর্জলী যাত্রা ও খেলার প্রতিভা, অমিয়ভূষণ মজুমদারের রাজনগর ও চাঁদবেনে, মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার ও হাজার চুরাশির মা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই ও খোয়াবনামা, গুণময় মান্নার মুটে, নবারুণ ভট্টাচার্যের হার্বার্ট প্রভৃতির কথনবিশ্ব মূলত চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের দ্বিবাচনিকতায় গ্রথিত। এইসব

রচনার আখ্যান আলাদাভাবে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ তবু এদের গ্রন্থনা এমন যে আখ্যানের চেয়ে অন্তর্বর্তী চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার বয়ন পাঠকের বেশি অভিনিবেশ দাবি করে। উপন্যাস-পাঠ যখন শেষ হয়ে যায়, কোনো ঘটনার প্রসাধিত আড়ম্বরের বদলে সামাজিক চিহ্নায়নের তাৎপর্যই বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বাখতিন/ভোলোশিনোভের মন্তব্য 'The utterance is a social phenomenon' এইসব আখ্যানের কেন্দ্রীয় সত্যের প্রতি তর্জনি সংকেত করছে। উপন্যাসের কুশীলবদের অবস্থান ও মিথষ্ক্রিয়া থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সামাজিক চিহ্নায়নের বিচিত্র প্রক্রিয়া। নিবিড় পাঠে বুঝতে পারি, এই প্রক্রিয়ার আধার ও আধেয় হলো সামাজিক ভাবে নির্ধারিত ভাবাদর্শ। এক্ষেত্রে বাখতিন/ভোলোশিনোভের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 'Without signs there is no ideology.... Everything ideological possesses semiotic value.'[১১]

এখানে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। কিন্তু প্রাগুক্ত উপন্যাসগুলির ঘটনাবিন্যাস ও বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর আততির মধ্য দিয়ে যে অনবরত 'encoding'ও 'decoding' -এর প্রক্রিয়া ব্যক্ত হচ্ছে — এ বিষয় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। 'চিলেকোঠার সেপাই' এর ওসমান, 'খোয়াবনামা'র তমিজ, 'অন্তর্জলি যাত্রা'-র বৈজুনাথ,'মাল্যবান' ও 'হার্বার্ট' এর নাম-চরিত্র যে ক্রমশ স্বর থেকে স্বরান্তরে আর চেতনা থেকে অধিচেতনায় বিবর্তিত হতে থাকে, তাতে ঘটনা তো নিছক নির্মোক; সাংকেতিক দ্যোতনার বিচ্ছুরণই এদের পরিক্রমার মুখ্য আধেয়। এই পরিক্রমা যতখানি আত্মগত, ততটা সামাজিক : এর প্রমাণ করা যায় বারবার। সমস্ত তাৎপর্যই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয়। ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার বহুস্বরিক সংঘর্ষে আরও বুঝতে পারি, চিন্তা যেমন চিহ্ন তেমনি ঘটনাও মূলত চিহ্ন। আর, সমস্ত ভাববীজ ও ঘটনা-বিন্যাস আকরণ ও স্বভাবগত দিক দিয়ে মূলত দ্বিবাচনিক। বহির্বৃত আপাত-অভিব্যক্তিকে যখন গভীরতর আকরণের দর্পণে বুঝতে চেষ্টা করি, উপন্যাসের কথনবিশ্বেও প্রতীয়মান পাঠ ও প্রকৃত পাঠের দ্বিবাচনিক সম্পর্কটি অনুভব করি। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া এই সম্পর্কেরই ফলশ্রুতি। বাস্তবতা ও সত্য, ভাষা ও পরাভাষা, আখ্যান ও তাৎপর্য তাই নিবিড় সামাজিক সংবিদ্ দ্বারা লালিত ও পরিশীলিত হচ্ছে। আমরা যখন উপন্যাসের পাঠকৃতিতে অবগাহন করি, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাত্রার জটিলতা ও পথভ্রান্তির আশঙ্কা সত্ত্বেও চিহ্নায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সময় ও পরিসরের বিপুল, সুদূরপ্রসারী ও মায়াবী ভূমিকায় মুগ্ধ না-হয়ে পারি না। কিন্তু মুগ্ধ হয়েও বিহ্বল হতে পারেন না চিহ্নবিশারদ পাঠক। কেননা তাতে তথ্য থেকে সত্যে, রূপ থেকে রূপান্তরে পৌঁছানোর সামাজিক ভিত্তি অস্পষ্ট হয়ে পড়বে। রবার্ট হোজ ও গুনথের ক্রেসের সিদ্ধান্ত : 'All semiotic activity takes place in time : all

semiotic phenomena are diachronic, whether on a small scale the time to produce or interpret a single syntagm, the flow of syntagms in discourse on a larger scale, including the history of human semiosis.' ** আখ্যানের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আকরণকে ঐতিহাসিক সময়ের প্রেক্ষিতে স্থাপন না-করা পর্যন্ত প্রতিবেদনের পরিসর থেকে জায়মান চিহ্নায়কের তাৎপর্য ও গুরুত্ব আমরা কখনও বুঝতে পারব না। যেমন আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের উপনিবেশ বিরোধী ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রেক্ষিতকে যতক্ষণ বিশ্লেষণ না করছি, মহাশ্বেতা দেবীর অরণ্যের অধিকার-এ সঞ্চরমান চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া স্পষ্ট হবে না কখনও। প্রতাপের সহগামী ভাবাদর্শ কীভাবে প্রান্তিকায়িত জ্ঞানের অস্তিত্বকে পিষ্ট করে, এই বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছাবে না। তেমনি হাজার চুরাশির মা উপন্যাসের পাঠকৃতিতে মাতৃ-অস্তিত্বও যে রাজনৈতিক অনুষঙ্গের নির্মিতি, এ কথা স্পষ্ট হতে পারে কেবল নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবনের সূত্রে।

এইজন্যে কোনো তাত্ত্বিক যখন বলেন, 'তাৎপর্য সর্বদা প্রসঙ্গ নির্ভর'—সেসময় তিনি সামাজিক চিহ্নতত্ত্বের মৌলিক বৈশিষ্ট্যের প্রতিই তর্জনিসংকেত করেন। চিলেকোঠার সেপাই-এর প্রতিবেদন এবং ওসমান, হাড্ডি খিজির, চেংটুর অস্তিত্বগত তাৎপর্য বাংলাদেশের জন্মকালীন সংঘর্ষের পটে দ্যোতনাগর্ভ হয়ে উঠেছে। আবার খোয়াবনামার বাচন ও পরাবাচনের দ্বিবাচনিকতায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ভারত-বিভাজনের কালিক বলয়। একইভাবে বলা যায়, মুটে বা হার্বার্ট বা তিস্তাপারের বৃত্তান্ত বা রাজনগরের বয়নে সঞ্চরমান চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া পাঠকের কাছে ধরা দেবে না কখনও যদি তিনি সময় ও পরিসরের অন্যোন্য-বিন্যাস সম্পর্কে অবহিত না হন। প্রসঙ্গের সঙ্গে পাঠকৃতির নিবিড় সাংগঠনিক ঐক্যকে আলোকিত করে তোলে চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া। গ্রহীতা-পাঠক তখন সক্রিয় পর্যবেক্ষক হিসেবে প্রতিবেদনের দ্বিবাচনিক আবহে যুক্ত হয়ে পড়েন। আখ্যানের বিভিন্ন স্তর কিংবা কুশীলবদের ধারাবাহিক উন্মোচন নিশ্চয় চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার অনন্ত বৈচিত্র্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরে। তবে এদের মধ্যে অমোঘ হয়ে ওঠে ভাবাদর্শের তরঙ্গায়িত বিস্তার ও সামাজিক সংবেদনার অনেকান্তিক সম্পর্ক। এ প্রসঙ্গে সামাজিক চিহ্নবিজ্ঞানীর বক্তব্যকে ঔপন্যাসিক কেবল সৃষ্টিশীল সমর্থনই দেন না, তাকে রূপান্তরিত ও বিস্তৃততর করে তোলেন। অমিয়ভূষণ মজুমদারের চাঁদবেনের গ্রন্থনা বা কমলকুমার মজুমদারের খেলার প্রতিভার বহুস্বরিক অন্তর্বয়ন এর দৃষ্টান্ত।

জীবনের শেষ নেই তাই চিহ্নায়কের বিচ্ছুরণেও কোনো সমাপ্তিরেখা নেই। কখনও কবিতায় কখনও উপন্যাসে আর কখনও ছোটগল্পে আমরা তাৎপর্যের সঙ্গে সামাজিক প্রেক্ষিতের দ্বিবাচনিক সম্পর্কটি বুঝে নিই। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের সম্পর্ক নির্মিতি-

বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে এই সম্পর্ক-বিন্যাসই কথনবিশ্বকে গড়ে তোলে। এই জগৎ চিহ্নের জগৎ। তবে গ্রহীতার অবস্থান ও প্রস্তুতির গভীরতার ওপর নির্ভর করে চিহ্নায়িতের প্রবাহ উদ্দিষ্ট মোহনায় পৌঁছাতে পারছে কি না! বাখতিন জানিয়েছেন, জ্ঞান ও অনুভূতি অন্যোন্য-সম্পৃক্ত। চিহ্নায়ক পরম্পরার মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে অস্তিত্ববিষয়ক জিজ্ঞাসা আর জ্ঞানতাত্ত্বিক সন্ধানের পারস্পরিক উদ্ভাসন। তাই পাঠকৃতির মুখোমুখি হই যখন, মানববিশ্বকে আরও একটু ভালভাবে জানি, চিনি। জীবন ও জগৎ অনবরত আমাদের কাছে নিরুচ্চার ও সোচ্চার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। এই উচ্চারণ-প্রবাহে সাড়া যদি দিতে পারি, তবেই অর্থবহ হয়ে ওঠে আমাদের অস্তিত্ব। এই সংযোগসূত্র গড়ে তোলা মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়। চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে, প্রতিটি মুহূর্তে নিজেকে রচনা করতে করতে, আপন অনন্যতাকে স্বতঃসিদ্ধ করে তুলছেন চিহ্নতাত্ত্বিক পাঠক।

উল্লেখপঞ্জি

১. Julia Kristeva, 'The system and the speaking subject.' Times literary Supplement', 12 October 1973. p. 1249.

২. এ বিষয়ে আরও বক্তব্য এবং পারিভাষিক প্রয়োগ-সূত্রের জন্যে দ্রষ্টব্য : মদীয়, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৯৯৭, পৃ ১-৪৫, ২১৮-২৬।

৩. John Sturrock. Structuralism. Fontana Press. London. 1993 (2nd edition), p.xiii.

৪. দ্রষ্টব্য : Umberto Eco. A Theory of Semiotics, Indiana University Press, Bloomington and London. 1976; The Role of the Reader : Exploration in the Semiotics of Texts, Indiana University Press. Blomington, 1979; Semiotics and the Philosophy of Language. Macmillan, London, 1984.

৫. Roman Jakobson, 'Language in relation to other communication systems,' Selected Writings. Vol.II. The Hague, Moutan, 1971, p.698.

৬. জীবনানন্দ দাশ, 'ঘোড়া,' সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, ভারবি, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ ২৫৫-৫৬

৭. শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'অবনী বাড়ি আছো', ধর্মে আছো জিরাফেও আছো, পদ্য সমগ্র (১ম), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ-৮৫

৮. ভাস্কর চক্রবর্তী, 'ছোট বোন', শীতকাল কবে আসবে সুপর্ণা, অধুনা, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ.৩০।

৯. তদেব, চব্বিশ বছর, আমি, তদেব, পৃ-২৭।

১০. Michael Riffaterre. Semiotics of Poetry. Indiana University Press. Bloomington. 1978. p.1.

১১. তদেব, পৃ.৪

১২. জয় গোস্বামী, 'ভ্রূণ,' 'প্রত্নজীব'. কবিতা সংগ্রহ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০. পৃ. ৫০-৫৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ.১২।

১৪. Jonathan Culler. The Pursuit of Signs. Routledge, London. 1992. p.xi.

১৫. তদেব

১৬. দ্রষ্টব্য : C.S. Peirce : Collected Papers (8 vols.) ed. Charles Hartshorne et al. Harvard University Press. Cambridge : Mass. 1931-58 এবং James K.Feibleman : An Introduction to Peirce's Philosophy. Allen & Unwin. London. 1960.

১৭. দ্রষ্টব্য : C.S. Peirce. Collected Papers. Vol. V. p. 448.

১৮. তদেব, Vol. vii. p. 570.

১৯. Julia Kristeva. Semiotike. Paris. Seuil. 1969. p.30.

২০. Jonathan Culler. The Pursuit of Signs. Routledge. London. 1992. p.127.

২১. Mikhail Bakhtin / V. N. Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language, Seminar Press, New York, 1973. p.9.

২২. Robert Hodge and Gunther Kress. Social Semiotics. Polity Press. Cambridge. 1991. p.35.

সময়ের প্রত্নতত্ত্ব

পাখি, তুই কার ?

যখন যার হাতে, তখন তার।

লোককথার কথকের বড়ো প্রিয় এই বাচন। যখন উড়াল দেয় কাহিনির পাখি, তাকে পিঞ্জরে ফিরিয়ে আনার জন্যে এই বাক্‌কৌশল ব্যবহার করতে হয়। খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়, সে তো চিরকালের বিস্ময়। যখন বাউল বলে, ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম তার পায় — সেও তো প্রত্যাশার কথা। ধরতে যে পারা যায় না, বাচনের ধরনে এই সত্য এবং সত্য-সংশ্লিষ্ট বেদনার দীর্ঘশ্বাস লুকোনো থাকে না খুব একটা।

সময় নিয়েও ঐ একই বিহ্বলতা। শুধু যাওয়া-আসা শুধু স্রোতে ভাসা। নানা অনুষঙ্গ দিয়ে বুঝতে চাই তাকে, ধরতে চাই। তবু বোঝা যায় না, ধরা যায় না। কল্পনা করে নিই, এই হলো বর্তমান আর এই ভবিষ্যৎ। যা-কিছু পেছনে ফেলে এলাম, সমস্ত অতীত। মানুষেব মনে খটকা লাগে কেবলই : যা বিগত তা তো মৃত, ঝরা পাতার স্তুপ মাত্র। কিন্তু অতীত কি মৃত, অশ্মীভূত পুরোপুরি ! তাহলে ভুবনে-ভুবনে গোপনে-গোপনে অতীতের সক্রিয় থাকা সম্পর্কিত অনুভব কি মিথ্যে ?

সময় তো মূলত বিমূর্ত । আমাদের কল্পনায়, প্রত্যাশায়, আখ্যানের প্রকল্পে তাকে যে মূর্ত করে তুলি — তা নির্মাণের প্রতিষ্ঠা শুধু। যতক্ষণ নির্মাণ, ততক্ষণ বাস্তব। তার মানে, সময়ের বাস্তবতাকে অনুভব করতে পারি কেবল নির্মাণের নিরিখে, এর বাইবে নয়। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ইশারায় ব্যক্ত হলো : বিচিত্র কূটাভাসে নির্মাণের বাস্তবের অন্তরালে থাকতে পারে অলক্ষ্যগোচর প্রকল্পনাও। অর্থাৎ সময়কে মূর্ত করার জন্যে যখন কল্পনা-প্রত্যাশা-আখ্যানের আশ্রয়ে যাচ্ছি — প্রকল্পনার আয়ুধও ব্যবহার করছি। কেননা মানুষের বোধে বাস্তব নির্বিকল্প হয়ে থাকে না কখনও, প্রকল্পনার সঙ্গেও দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ। অতএব সময়-স্বভাব বলতে বুঝি আলো ও ছায়ার দ্বিবাচনিকতা, উদ্‌ভাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্ধবিন্দু সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি তাই।

কিন্তু সতিই কি সচেতন হই আমরা ? যদি হতাম, সময় আজ সর্বস্তরে কৃষ্ণবিবরের নামান্তর হয়ে উঠত না। আমাদের সাহিত্যবোধ-সংস্কৃতিবোধ-সমাজবোধ এমন দুর্নিবার গতিতে নেতির গহ্বরে হারিয়ে যেত না। সময়-কথন মানে অন্ধকারের অন্ধলিপি নয় যে, বৌদ্ধিকতার গর্বে মদিরজনেরা ইদানীং সেই সত্য বিস্মৃত হয়েছেন। এখনকার পৃথিবীতে এক অন্ধ পথ দেখায় আরেক অন্ধকে। তবু, তারই মধ্যে সময় নামক অচিন পাখিকে ধরে

রাখার জন্যে কতরকম শিল্পের পিঞ্জর তৈরি করে মানুষ। নিজেকে আর নিজের জগৎকে তাৎপর্যবহ করে তোলার জন্যে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতেই হয়। তবু সময় চিরদিন অধরা মাধুরী মানুষের জন্যে ; নৈর্ব্যক্তিক নিরপেক্ষ অস্তিত্বের কথা জেনেও তার উপর কখনও আরোপ করে হন্তারক নিষ্ঠুরতার ছায়া আর কখনও বিশল্যকরণীর শুশ্রূষা।

যাই ভাবুক না কেন মানুষ, কালপুরুষের দু'হাতে মন্দিরা বেজে চলে। তার তালে-লয়ে নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে-পাছে। ভাবতে ভাবতে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করে : Time is out of joint। কিংবা মহাভারতের দার্শনিক কবির প্রাজ্ঞ বাচনে বলে : 'কালঃ পচতি ইতি বার্তা।' সময়ের এই তো বার্তা : বিপুল বিনাশের মধ্যে একাকার হয়ে চলেছে উঁচু-নিচু শিখর-উপত্যকা মহৎ-তুচ্ছ লাবণ্য-কুশ্রীতা।

তাহলে, বিলয়-বৃত্তান্তই কি সময়-কথন ?

দুই

ভারতীয় উপমহাদেশের জনৈক প্রাচীন দার্শনিক কবি লিখেছিলেন, 'যারা মনে করে জানে তারা জানে না (সত্য কী) এবং যারা মনে করে জানে না, তারাই জানে।' সময় সম্পর্কেও ঐ একই কথা। দেশে-দেশে কালে-কালে জানা ও অজানার মধ্যবর্তী রহস্যবলয়ে সময়বোধের তাৎপর্য খুঁজছে মানুষ। লোককথায় কিংবদন্তিতে প্রত্নকথায় রূপকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে সময়ের নতুন নতুন চিহ্নায়ন প্রকরণ। কিন্তু তৃপ্ত হয় নি কখনও। সৃষ্টি-সক্ষম কল্পনায় ও প্রকল্পনায় যুগপৎ আবিষ্কার করেছে সময়ের বর্ণায়তন ও বর্ণশূন্যতা। ভাষার প্রকল্পে সূক্ষ্মভাবে শুষে নিতে চেয়েছে সময়ের আকল্পগত নির্যাস। নানা দেশের পুরাণ ও মহাকাব্য সময়ের নিষ্ক্রিয় ও ক্রিয়াত্মক স্বভাব অনুবাদ করতে চেয়েছে আখ্যানের জটিল অরণ্য অগাধ সমুদ্র দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত রচনা করে, অর্থাৎ আখ্যানও আসলে রূপক ; অজস্র স্বর ও অর্থের দ্যোতনায় যেন আতসকাঁচের মধ্যে প্রতিফলিত অমেয় জ্যোতিরুচ্ছ্বাস। এই প্রতিফলনের পরিমাপ করে আমরা ভাবি, অন্তহীন পারাপারহীন অবয়বহীন সময়ের বিমূর্ততাকে তবু খানিকটা মানুষের বোধের উপযোগী করে তোলা গেল। এই যে বিশেষণগুলি ব্যবহার করলাম, এসব তো আসলে সময়-বিষয়ক সম্ভাব্য প্রতিবেদনের কয়েকটি খিলান। স্বভাবত এদের মধ্যে বৈচিত্র্য আনা যায়; তবে সময়কে বিশেষিত করার যাবতীয় চেষ্টাই বাচন-নির্ভর। এছাড়া বাচনাতীত পরমতার কাছে, পরা-অস্তিত্বের নৈঃশব্দ্যের কাছে পৌঁছানোর অন্য কোনো মানবিক উপায় আমাদের জানা নেই।

সন্ত অগাস্টিন তাঁর বিখ্যাত 'কনফেশন্‌স্' বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ দিকে এই প্রবাদ-প্রতিম প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন : Quid est enim tempus ? (১১ : ১৪ : ১৭)

অর্থাৎ 'সময় তাহলে কী?' বিদ্বজ্জনেরা বলেছেন, এই মৌল প্রশ্নটি অস্তিত্ব-তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসা থেকে নিষ্পন্ন, তবে তা থেকে উৎসারিত হয়েছে সময়ের তত্ত্ববস্তুবাদী প্রতিবেদন। অমেয় সময়কে কীভাবে মাপা সম্ভব, এ নিয়ে অগাস্টিন গভীর চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতিবেদনের মধ্যে রয়ে গেছে এমন কিছু অন্ধবিন্দু যা তিনি সমাধান করতে পারেন নি। যার অস্তিত্ব রয়েছে শুধুমাত্র তাকেই আমরা মেপে নিতে পারি। এই বক্তব্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষতার প্রশ্নগুলিও। সময়ের অস্তিত্ব নিশ্চয় অনুভবগম্য তবে সেই সব অনুভূতির সংরূপও পূর্ব-নির্ধারিত। একটু আগে যেমন লিখেছি, সময় সর্বদা আমাদের কাছে কোনও-না-কোনও প্রতিফলনে সক্ষম সংরূপের মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে। সময়ের অস্তিত্ব শুধু বিচার্য নয় দার্শনিকের কাছে, তার অনস্তিত্বও নিবিড় পাঠের বিষয়। দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতায় প্রবহমান সময়ের অস্তিত্ব আমরা অবশ্যই অনুভব করি এবং বুঝতে পারি। সময়ের অস্তিত্বকে মান্যতা দিয়েই বাচন অভিজ্ঞতাকে নানাস্তরে বিন্যস্ত করতে পারে। বস্তু-বিশ্বের দিকে তাকিয়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে বর্তমান সময়ে গ্রথিত নির্দিষ্ট কিছু উপস্থিতি যেমন অনস্বীকার্য, তেমনি অদূরবর্তী ভবিষ্যতে তাদের অনুপস্থিতিও সমান সত্য হবে। আবার বিগত মুহূর্তগুলিতে কিছু কিছু বস্তুর উপস্থিতি ছিল, সেই পরিস্থিতি এখন নেই। এই যে অপস্রিয়মানতা, তা বস্তুরূপকে অহরহ অস্থির ও অনিশ্চিত করে রেখেছে। মানুষের ভাষা এই বহমানতার সঙ্গে পাল্লা দেয় কখনও, কখনও বা অনস্তিত্ব ও অস্তিত্বের মধ্যবর্তী দোলাচল অন্ধবিন্দুগুলিকে অনতিক্রম্য করে তোলে।

রূপহীন, আকারহীন, গুণাতীত সময়ে আমরা রূপ, আকার ও গুণ আরোপ করি। নইলে সময়ের ধারণা আমরা তৈরি করতে পারবই না। নির্দিষ্ট কিছু এককে অবিভাজ্য সময়কে বিভক্ত করে নিয়ে বয়ান তৈরি করি আমরা। তবু সময় রয়ে যায় ধারণার অতীত। অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কূটাভাস সময়বোধের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য যেন। ইতিহাসের প্রতিবেদন দিয়ে সময়কে বোঝাতে চাই যখন, নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা কিংবা ব্যক্তি-নির্ভর পর্ব-পর্বান্তরের আকল্প তৈরি করি। তবু বিস্তীর্ণ-এক সময়-পরিধি রয়ে যায়, যাকে বলি প্রাগ্-ঐতিহাসিক সময়। সেই সময় ধূসর ও অনির্দেশ্য, রহস্যের মায়াগুণ্ঠনে ঢাকা। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষকেরা ঐ গুণ্ঠন সরাতে সাহায্য করেন অনেকখানি। শেষ পর্যন্ত পারাপারহীন সময়কে উপলব্ধির বিষয় করে তুলতে মানুষকে কেন্দ্রে রাখি। আদিম বা বর্বর যা-ই হোক, পার্থিব সময়ে মানুষ যখন ছিল, সে-ই তো মানবিক সময়। তার সূচনাবিন্দু আছে কোথাও-না-কোথাও, দূরতম নিবিড়তম অন্ধকার কোনো প্রহরে, যেখানে মানুষ নিজেকে স্থাপন করতে পারে। আবার মানুষ যখন ছিল না অথচ পৃথিবী ছিল, তেমন নিরন্তর কালপ্রবাহকে আজ প্রত্ন-সময় বলে শনাক্ত করতে পারি। অর্থাৎ এ এমন সময়

যখন সময়বোধ বা সময়ের পরিমাপক তৈরি হয় নি। সেখানে দর্শন ও বিজ্ঞানের যুগ্ম অধিকার। কীভাবে শুরু হলো পার্থিব সময়, মহাজাগতিক মহাসময়ের অংশ হিসেবে কীভাবে তার সৃষ্টি এবং কীভাবেই বা মহাসময় ও মহাপরিসরের যুগলবন্দি স্বতঃসিদ্ধ — এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই প্রতিবেদনে তার অবতারণা করছি না। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম বয়ান ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ উচ্চারণ মনে আসে : 'নাসতো সদ্ অজায়ত' অর্থাৎ অনস্তিত্ব থেকেই অস্তিত্বের আবির্ভাব। মানুষের বোধাতীত মহাপরিসর-বাচক মহাশূন্য মহাবিস্ফোরিত হলো যখন, সেই থেকে বস্তুবিশ্বের উদ্ভব-প্রক্রিয়ার সূত্রপাত। সেই পরম ক্রিয়াত্মকতায় আবির্ভাব সময়েরও। সেই মুহূর্তের আগে কোনও পরা-মুহূর্ত কিংবা কোনও পরা-পরিসর ছিল কি না, তা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মননেও কতটা প্রতিফলিত হয় — তা বলা শক্ত। সময়ই যখন পরিসর আর পরিসরই সময়, তাতে আরম্ভ-বিকাশ-সমাপ্তি জাতীয় আকরণগুলি নিরর্থক। বস্তুত পার্থিব সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহমানতায় সময়ের কোনও বস্তুগত অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া দুরূহ। ভবিষ্যৎ অনাগত, অতীত আর নেই এবং বর্তমানও প্রতি মুহূর্তে মুছে যাচ্ছে। সময়ের অস্তিত্বকে তাহলে কীভাবে প্রমাণ করব, এ নিয়ে বিহ্বলতা কাটে না। মানুষের ভাষায় এবং প্রতিবেদনে এই বিহ্বলতার বিচ্ছুরণ ঘটতে থাকে সর্বদা। শুধু বাচনিক মাধ্যমগুলিতে নয়, সমস্ত শিল্প-প্রকরণে।

তিন

'হে পূর্ণ, তব চরণের কাছে যাহা-কিছু সব আছে আছে আছে
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারই, নিশিদিন কাঁদি তাই।'

— রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত গানে ছোট সময়ের আর্তি কি প্রকাশ পেয়েছে বড়ো সময়ের কাছে ! কতরকম ভাবে যে খণ্ডকাল ও মহাকালের কখনো আততি আর কখনো দ্বিরালাপ ব্যক্ত হয় মানুষের শিল্পিত ভাষায়, তার ইয়ত্তা নেই। একদিকে অন্ত ও রুদ্ধতা, অন্যদিকে অনন্ত ও মুক্তি :

'বনের পাখি গাহে বাহিরে বসি বসি বনের গান ছিল যত
খাঁচার পাখি গাহে শিখানো বুলি তার—দোঁহার ভাষা দুই মত।

....

বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘন নীল কোথাও বাধা নাহি তার'।
খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি কেমন ঢাকা চারিধার'।

টুকরো-সময়ের টুকরো-অস্তিত্ব থেকে উৎসারিত ভাষাপিঞ্জরের পারিপাট্য আর সীমার আকরণ প্রকাশ করে। সাহিত্যিক প্রতিবেদনে বহু ধরনে তার অভিব্যক্তি ঘটে।

কিন্তু মহাসময়ের বিপুল অস্তিত্বের ইশারাও তো দিতে চায় ভাষা, তার দৃষ্টান্তও মানুষের সাহিত্যভুবনে কম নেই। বাস্তবে যা অর্জনীয় নয়, সেই চিরন্তনতাকে কল্পনা ও প্রকল্পনা দিয়ে মানুষ পেতে চেয়েছে। লিখেছে পুরাণ, মহাকাব্য; তৈরি করে নিয়েছে অন্তহীন আদিকল্প, কিংবদন্তি ও প্রত্নকথা। তবু, মহাসময়ের মৃত্যুহীন চিহ্নায়কগুলির দিকে তাকিয়ে মানুষ যখন খন্ডকাল ও খণ্ডপরিসরের মর-অস্তিত্ব আর সেই অস্তিত্বের অতৃপ্ত তৃষ্ণা ও বিষণ্ণ সৌন্দর্য অনুভব করে—ঐ অনুভূতির তুলনা হয় না কোনো। কালের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য মাত্রার শিল্পিত সংরূপ কবিতায়, চিত্রকলায়, স্থাপত্যে যখন খুঁজি, মৃত্যু-শাসিত মানুষের তৃষ্ণা, বিষণ্ণতা, অতৃপ্তি ও সৌন্দর্যকে বন্দনা করতে শিখি।

ইংরেজ কবি স্যুইনবার্ন 'Atalanta in Calydon'-এ যখন সময়ের ঘাতক মূর্তিকে দেখতে পান এবং সময়াতীত চিরহরিৎ স্বর্গের বিপ্রতীপে অজস্র ভঙ্গুরতায় লাঞ্ছিত মানুষের মরজীবনকে প্রতিস্থাপিত করেন, তারও একান্ত নিজস্ব মহিমা কীভাবে ফুটে ওঠে যেন :

'All we was old and wither like a leaf.
We are outcast, strayed between bright sun and moon;
Our light and darkness are as leaves of flowers.
Black flowers and white that perish; and the moon
As midnight and night as daylight hours,
A little fruit a little while is ours.
And the worm finds it soon.'

সময়ের প্রহারকে অস্বীকার করতে পারে না মানুষ, এই মূল বার্তা বারবার ফিরে এসেছে কবি-লিখিয়েদের অনুভবে। শেলির বহুপঠিত চতুর্দশপদী 'Ozymandius of Egypt' -এর দৃষ্টান্ত তো হাতের কাছেই রয়েছে। সময়ের অবাধ অগাধ রহস্য থেকে দ্রাক্ষামোচন করে যখন মানুষ, তার শিল্পের নানা প্রকরণ জন্ম নেয়। রহস্যের যবনিকা তাতে একটুখানি দুলে ওঠে শুধু; এক সৃষ্টি-প্রকল্প থেকে অন্য সৃষ্টি-প্রকল্পে সরে যেতে-যেতে অভিজ্ঞতার বলয় প্রসারিত হয়। সময়ের প্রকৃত মুখ দেখা যায় না, দেখা সম্ভব নয়, ঝরোখার আড়াল রয়েছে বলেই মানুষ ঝলসে যায় না। সময়ের মোহর যতটুকু খচিত হয় তার বয়ানে, ততটুকুই তার অর্জন। নানা ধরনের পাঠকৃতিতে সময়ের বিচিত্র ও বহুবাচনিক উপস্থিতি কিন্তু আকস্মিক নয়; বরং তাতে ব্যক্ত হচ্ছে মানবিক অস্তিত্বের 'transcultural form of necessity'। কথাটি ব্যাখ্যা করে পল রিকো চমৎকার মন্তব্য করেছেন : 'Time becomes human to the extent that is articulated through a narrative mode, and narrative attains its full meaning when it becomes a condition of temporal existence.' (১৯৮৪ : ৫২)

চার

সময় যখন আখ্যানের আকল্প ও প্রকরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়, তখনই তা মানবিক হয়ে ওঠে—এই বক্তব্যকে আরো একটু প্রসারিত করে বলা যায়, আখ্যানে তার অবকাশ বেশি হলেও অন্য শিল্পমাধ্যমও সময়ের স্পর্শরহিত নয়। কিংবা, সময়-শীলিত অস্তিত্বের অন্তহীন বিচ্ছুরণের মধ্যে আখ্যান এবং অন্যান্য সৃজনকলা তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিসরের অন্তর্বর্তী সীমান্তগুলি পেরিয়ে যাওয়ার প্রেরণা সময়-অনুশীলনের ফলেই লাভ করে মানুষ। এক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পথ আলাদা হলেও সময়বোধে নিষ্ণাত হওয়ার তাগিদ সভ্যতার সূচনাপর্বেই দেখা দিয়েছিল। একটু আগে ভারতীয় চিন্তাবিশ্বে সময়-ভাবনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছি। সংক্ষিপ্ত পরিসরে যেহেতু এর সানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অসম্ভব, তাই কিছু কিছু সূত্র উল্লেখ করছি শুধু। বৈদিক সাহিত্যে দেখতে পাই, সময় ও মৃত্যু সমার্থক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে; একটি সাধারণ অভিধা ব্যবহৃত হচ্ছে তাই : কাল। মানে যম, মৃত্যুলোকে যিনি প্রথম পথিক এবং ধর্ম অর্থাৎ ন্যায়বিচারের অধিষ্ঠাতা। সময় যেমন মৃত্যুর সংকেত বয়ে আনে তেমনি বৈদিক আর্যদের কূটাভাসপূর্ণ মনে তা মৃত্যু-অতিযায়ী পরা-সত্তা : অতিমৃত্যু! আবার সময় যেহেতু বিভিন্ন প্রজন্মের মধ্য দিয়ে, অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে, প্রবহমান : কাল ও তার সমার্থক যম (ব্যুৎপত্তিগত দিক দিয়ে যার অর্থ হলো নিয়ম) অথর্ববেদের কবির চোখে পিতৃলোকের অধিপতি : 'যমঃ পিতৃণাম অধিপতিঃ' (৫ : ৫ : ১৩ : ১৪)। সূক্ষ্মভাবে সময় মানে পরিসরের বোধ। তাই কাল বা যমের কাছে প্রাচীন ভারতীয় কবি চেয়েছেন নির্দিষ্ট আবাসভূমি : পৃথিবীতে এবং মৃত্যুর পরেও (শতপথ ব্রাহ্মণ : ১৩ : ৮ : ২ : ৪)! সময়কে ঘিরে প্রাচীন মানুষের যে 'অতিমৃত্যু' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কিংবা সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার আর্তি—এর অন্তর্বৃত যুক্তিশৃঙ্খলা অনুধাবন করলেই শুধু ব্যক্ত ও অব্যক্তের সেতু তৈরি করতে পারব। নইলে ঋগ্বেদের কবি এত সব দেব-দেবী থাকতে কেন যমের কাছে সুখ, দীর্ঘায়ু, এমন কি অমরতা চাইতেন — (যেমন ঋগ্বেদ : ১০ : ১৪ : ১৪)-এর তাৎপর্য স্পষ্ট হবে না।

প্রাচীন কবিরাও বুঝেছিলেন, সময়ই দাতা আর সময়ই হন্তারক। মৃত্যুশাসিত জীবনে সময়ের কাছে চাইতে হবে ঋদ্ধ জীবন : এই উপলব্ধি ছিল তখনকার মানুষের মর্মমূলে। ঋক্‌বেদের বিখ্যাত আকাঙ্ক্ষাই হলো : 'জীবাতবে, ন মৃত্যবে' অর্থাৎ জীবনের জন্যে, মৃত্যুর জন্যে নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির অজস্র স্তর থাকে মানুষের। অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে অন্ত ও অনন্তের দ্বিরালাপ সেদিনকার কবি ও দার্শনিকদের

কাছে যেভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল, কাল-সম্পর্কিত নানা বিশ্লেষণে, প্রত্নকথায় ও অধিবিদ্যাগত আখ্যানে তার বিচিত্র প্রকাশ ঘটেছে। কঠোপনিষদের যম ও নচিকেতার গল্প তার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। কালের অন্য নাম অন্তক, কেননা জীবনের অন্ত ঘটে সময়ের নির্দিষ্ট কিছু পর্যায় পেরিয়ে গিয়ে। এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই, তাই নিয়ম বা যম বা মৃত্যুকে ভয় করতে হয়। যাবতীয় অস্তিত্ব সময়-নির্ধারিত, এই বোধ পরবর্তী মহাকাব্যের যুগে অর্থাৎ রামায়ণে ও মহাভারতে এবং বিভিন্ন পুরাণে নানা আখ্যানের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

মহাকাব্য ও পুরাণের পর্যায়ে ভারতীয় সময়-ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে গেল একদিকে কর্মবাদ ও নিয়তিবাদ এবং অন্যদিকে ন্যায় ও ধর্মের দেবায়ন। স্বভাবত বিভিন্ন উদ্ভট ও অলৌকিক কাহিনি নির্মাণ করে সময়-সম্পর্কিত অধিবিদ্যাগত ধারণাগুলিকে সাধারণ মানুষের উপযোগী করে তোলার চেষ্টা হলো। এই পর্যায়ে কাল ও শিব একীভূত। বহতা সময়কে বোধাতীত মহাসময়ের চিন্তাবীজে পরিশীলিত করার তাগিদে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ জনমানসের পক্ষে গ্রাহ্য করে তোলার বাস্তব প্রয়োজনে এল মহাকালের ধারণা। স্বভাবত শিবের মান্য বিশেষণ হিসেবে গণ্য হলো 'মহাকাল', যুক্ত হলো নতুন নতুন আখ্যান। কর্মবাদ, নিয়তিবাদ, জন্মান্তরবাদ যেহেতু বহুমাত্রিক কালেব বিভিন্ন বিভঙ্গ হয়ে উঠল, ক্রমশ অন্যান্য সমস্ত দেবতাকে দেখানো হলো তার অধীন বলে। মানুষের জীবনেব প্রতিটি অনুপুঙ্খ ঘোষিত হলো কালনিয়ন্ত্রিত বলে (মহাভারত : ১৩ : ১)। পার্থিব প্রতাপ যাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত, সেই রাজন্যবর্গ গৃহীত হলেন কালের প্রতিনিধি বলে। সূক্ষ্মভাবে, বিশ্লেষণ-প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রাজকীয় অভিজ্ঞানে সময়ের নিয়ন্ত্রক উপস্থিতি বিজ্ঞাপিত হত। রাজদণ্ড ও যমদণ্ডের অন্তঃসাদৃশ্য ছাড়াও 'ধর্মরাজ' উপাধির ব্যবহার খুব তাৎপর্যপূর্ণ। সময় হলো আগুন, 'কালাগ্নি' তাই মহাকাব্যে বার বার দেখা যায়। দিন-রাত্রি ঐ আগুনের ইন্ধন : মহাভারতের বিখ্যাত যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদের প্রয়োগ মনে পড়ে আমাদের। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে জ্বলে ওঠে যে-আগুন, সময় তার স্বাভাবিক প্রতিকল্প। প্রাচীন ভারতীয় মনীষা অনুষঙ্গবোধে আগুনকে ভেবে নিয়েছে মৃত্যু : 'অগ্নির্বৈ মৃত্যুঃ' (জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ : ১ :৩৩২) । রামায়ণে মহাভারতে ক্রুদ্ধ যোদ্ধাদের যে কতবার কালাগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

সময় বিনাশক : এই মৌল উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে 'ধ্বংসের মধ্য দিয়ে পবিত্র হওয়া'র (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ : ১ : ৪ : ৮ : ৬) বোধও। সামগ্রিক সময় নয় শুধু, সময়ের এককও (যেমন সম্বৎসর) মৃত্যুবাচক —কৌতূহলজনক এই বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে শতপথ ব্রাহ্মণে : 'সংবৎসর নিঃসন্দেহে মৃত্যুতুল্য কারণ তা দিন ও রাত্রির মধ্য দিয়ে মরণশীল প্রাণীদের জীবন ক্ষয় করে তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়।.....

জীবনকে সমাপ্ত করে বলে তা যথার্থই অন্তক।' (১০ : ৩ : ১-৯)। না লিখলেও চলে, বৈদিক সাহিত্য এবং মহাকাব্য-পুরাণ থেকে এরকম বক্তব্য অজস্র তুলে ধরা যায়। বহুস্বরিক সময়ের তিনটে উপমান একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে ক্রুদ্ধ রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে : 'কালান্তকযমোপমঃ' (রামায়ণ : ৩ : ৩২ : ৫)। মহাকাব্যের যুগে সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো বিধি বা নিয়তির ধারণা; প্রাগুক্ত তিনটে উপমানের সঙ্গে চতুর্থ হলো 'বিধি' (তদেব : ৬৯ : ২০)। ' আমাদের ধ্বংস করার জন্যে নিয়তি তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে' (রামায়ণ: ৬ : ১ : ৩)-প্রাগুক্ত সময়- ভাবনারই বিচ্ছুরণ। বাঙালি পাঠকের অবশ্য মনে পড়বে মেঘনাদবধ কাব্যের কথা, যেখানে বারবার পাই 'বিধি প্রসারিছে বাহু' জাতীয় অভিব্যক্তি। ব্যক্তি-জীবনের অনন্বয় আর কূটাভাস উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক বুদ্ধিজীবীর মনকে অধিকার করেছিল বলেই এমনভাবে নিষ্ঠুর বিধির উপস্থিতি লক্ষ্য করেছিলেন মধুসূদন। আসলে সময়ই ছিল বৈরি ; নইলে এই অনুভব এত প্রবল হয়ে উঠত না : ''মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে।' প্রাচীন ভারতের সময়-ভাবনা পুনর্গৃহীত হয়েছিল তখন। তবে সময় যে দুর্নিবার, এই বোধ থেকে সঞ্জাত অধিবিদ্যায় তাকে অন্তক ও করাল কাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারেননি প্রাচীন ভারতের চিন্তাবিদেরা। মহাভারতের বনপর্বে যুধিষ্ঠিরের বাচনে জীবনের কেন্দ্রীয় বার্তাই অপ্রতিরোধ্য বিলয় :

'অস্মিন মহামোহময়ে কটাহে সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রিদিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তুদর্ব্বী পরিঘট্টনেন ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা।।'

অর্থাৎ 'সূর্যকে আগুন, দিন ও রাতকে কাঠ এবং মাস ও ঋতুকে হাতা হিসেবে ব্যবহার করে প্রাণীদের বিপুল মোহের কড়াইতে ফেলে কাল তাদের পাক করে চলেছে— এটাই বার্তা' (৩ : ২৬৭ : ৮২)। সময়-ভাবনা বস্তুত ছড়িয়ে রয়েছে মহাভারতের স্তরে-স্তরে। কখনও তা রূপক আখ্যানের মধ্য দিয়ে, কখনও অধিবিদ্যাগত চিহ্ন-প্রকরণে, কখনও সরাসরি দার্শনিক বাচনে প্রকাশ পেয়েছে। এখানে শান্তিপর্ব থেকে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেখানে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে জানাচ্ছেন :

'সর্ব্বভূতসমুচ্ছেদঃ স্রোতসেবোহ্যতে সদা।

উহ্যমানং নিমজ্জন্তমপ্লবে কালসাগরে।। (শান্তি : ৩০৯ : ৮)

অর্থাৎ 'কালে সমস্ত জীবের উচ্ছেদ হয়, স্রোতের মতো সময় সর্বদা প্রাণীদের বয়ে নিয়ে চলেছে। নৌকোশূন্য কালসাগরে ভাসতে ভাসতে কখন যেন এরা ডুবে যায়।'

পাঁচ

বিমূর্ত সময় ভাবনা নিশ্চয় বহু শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়েছিল। দর্শন ও অধিবিদ্যা

যেহেতু সাধারণ মানুষকে তৃপ্ত করে না পুরোপুরি, তাদের চাহিদা মেটানোর জন্যে ক্রমশ উদ্ভূত হয়েছিল চর্যাকেন্দ্রিক ধর্মতত্ত্ব ও দেবসমবায়ের নানা সংরূপ। সময়-চেতনার বহুমাত্রিকতা নিশ্চয় বিবর্তনময় ভারতীয় বাস্তবতার ফসল; তবে এর উৎসমূলে কি ইন্দো-ইউরোপীয় প্রত্নভাবনা সক্রিয় ছিল ? অথবা ম্যাসোপটেমীয় চিন্তাবিশ্বের কোনো দূরাগত প্রভাব রয়েছে এর মধ্যে! নাকি ইন্দো-ইরানীয় প্রত্নপর্যায়ে সময়-ভাবনার সূত্রপাত! এসব দীর্ঘ আলোচনাসাপেক্ষ; এখানে শুধু বিশেষজ্ঞের একটি মন্তব্য তুলে ধরছি। 'The Mysteries of Mithra' বইতে ফ্রানৎস কুমঁ লিখেছিলেন মিথ্রবাহী ভাবনায় 'The apotheosis of time...was the capital doctrine that Babylon introduced into Mazdaism : belief in Fatality, the conception of an inevitable destiny controlling the events of this world and inseparably conjoined with the revolution of the starry heavens' (১৯৫৬ : ১২৪)। প্রাচীন পারসিক চিন্তাবিশ্বে জুরভান ঈশ্বরপ্রতিম, তিনি মহাসময়। গ্রিক প্রত্নকথায় সময় হলো এয়ন; কিন্তু তাতে এয়নের রূপ স্পষ্ট নয়। ইন্দো-ইউরোপীয় প্রত্ন-ভাবনায় সময়-চেতনার সূত্রপাত হলেও ইন্দো-ইরানীয় পর্যায়ে জুরভানকে ঘিরে তা গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান অর্জন করে। আর, বৈদিক যুগে এর দার্শনিক ও অধিবিদ্যাগত নিষ্কর্ষ নতুন শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত হয়ে মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে বহুধাপল্লবিত হয়ে ওঠে। তবে পারসিক প্রত্নকথার মিথ্রবাদী চিন্তায় জুরভানের মধ্যে নেতিবাচক অতীন্দ্রিয় চর্যা প্রাধান্য অর্জন করেছে; কিন্তু ভাবতীয় প্রত্নকথা ও ধর্মতত্ত্বে সময়ের বহুমাত্রিক স্বভাব বেশি লক্ষ্যণীয়।

প্রাচীন পারসিক সমাজে জুরভান-কেন্দ্রিক ভাবনা অনেকের মতে প্রাক্-জরথুস্ত্র পর্বে শুরু হয়েছিল এবং সম্ভবত তা ব্যাবিলনীয় প্রভাবের ফসল। জুরভান বা সময় হলো পরম সত্তা;ইনি ভালো এবং মন্দের চূড়ান্ত উৎস। অহুর মজ্‌দা ও আহ্‌রিমান তাঁর যমজ সন্তান; সুমতি ও কুমতির দ্বিমেরুবিষমতা তাঁর মধ্যে সমন্বিত হয়েছে। যখন পৃথিবী ও স্বর্গ তৈরি হয় নি, জুরভান বা মহাসময় তাঁর মহত্তম ও অনধিগম্য নিঃসঙ্গতা নিয়ে একা উপস্থিত ছিলেন। পুত্রের আকাঙ্ক্ষায় হাজার বছর কেটে যাওয়ার পরে তাঁর যখন প্রত্যাশা পূরণ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে, সেই সংশয় তাঁর মধ্যে সন্তান-সম্ভাবনা তৈরি করল। বিষয়টি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। জুরভানের পরম অদ্বৈত সত্তা থেকে জন্ম নেয় দ্বৈততা : আকাঙ্ক্ষা থেকে পৃথিবী ও স্বর্গের স্রষ্টা অহুর মজ্‌দা এবং সংশয় থেকে দানব ও অশুভের স্রষ্টা আহ্‌রিমান। সুতরাং ভালো ও মন্দ : দুটোই সময়ের ফসল। গর্ভ থেকে যে প্রথম ভূমিষ্ঠ হবে, তাকে রাজার পদবি দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন জুরভান। সর্বজ্ঞ অহুর মজ্‌দা উদারতার বশে এই খবর ভাইকে দেওয়ার পরে গর্ভ বিদীর্ণ করে আহ্‌রিমান বেরিয়ে এল। বাবাকে মিথ্যা

পরিচয় দিয়ে বলল, সেই অহুরমজ্‌দা। R.C. Zaehner তাঁর 'The Dawn and Twilight of Zoroastrianism' বইতে এই প্রত্নকথার সানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন। তারপর 'And Zurvan said : 'My son is light and fragrant, but thou art dark and stinking, And he wept most bitterly'(১৯৬১ : ২০৮)। অহুর মজ্‌দা জন্ম নেওয়ার পরে তাকে চিনে নিতে জুরভানের অসুবিধে হয়নি। নিজের প্রতিজ্ঞা ভাঙবেন না বলে জুরভান প্রিয় সন্তানকে রাজার পদবি দিতে পারলেন না, তবে তাকে দিলেন পৌরোহিত্যের অভিজ্ঞান।

এই প্রত্নকথার বিভিন্ন অনুষঙ্গ পরবর্তী কালে যেভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, অনন্ত কাল ও অনন্ত পরিসরের প্রতীক জুরভান নিরাকার হয়েও যাবতীয় সীমায়িত কাল ও পরিসর এবং বস্তুবিশ্বের জন্মদাতা। সময় থেকে জগতের উদ্ভব : এই মৌল প্রত্যয় অবশ্যই চিত্তাকর্ষক এবং দার্শনিক ও অধিবিদ্যাগত ভাবনার দিক দিয়ে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন। জগতের সৃষ্টি ও বিনাশ সময়বোধে সম্পৃক্ত — এই উপলব্ধির সূত্রপাত প্রাচীন পারসিকদের মধ্যে হয়েছিল : 'We enter in at one door and pass out of another : Time counts our every breath' (তদেব : ২৪০)

ছয়

এভাবে ভাবতে পারি মিশরীয় প্রত্নকথায় সময়-ভাবনার বিশিষ্টতা নিয়েও। অথবা গ্রিক বিশ্ববীক্ষায় প্রতিফলিত সময় নিয়ে। বিস্তীর্ণ মানবসমাজের ভিন্ন-ভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিসরে সময়বোধ যে কত বিচিত্রভাবে সক্রিয়, তা লিখে ফুরোনো যাবে না। শতাব্দীর পরে শতাব্দী, সহস্রাব্দের পরে সহস্রাব্দ পেরিয়ে গেছে। চিন্তার কত যে রূপান্তর ঘটেছে, কত আশ্চর্য সংশ্লেষণ ঘটেছে বিভিন্ন উৎস-জাত উপলব্ধির—তার ইয়ত্তা নেই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবুকেরা, শিল্পীরা নিজেদের সৃষ্টিকর্মে সময় সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করেন নি কেবল, সম্ভ্রমও ব্যক্ত করেছেন। এমন কি তাঁদের বয়ানে খুঁজে পাই মুগ্ধতা ও বিস্ময়। সময়-নিরপেক্ষ তাৎপর্য সন্ধানের কোনো চেষ্টা করেন নি কেউ। বৌদ্ধ দর্শনে তো ক্ষণ বা নিমিষকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্শনিক বসুবন্ধু জানিয়েছিলেন, অভিসম্বোধি বা বিপুল জাগরণ একটি মুহূর্তে (এক ক্ষণ) ঘটতে পারে। নিমিষের অণু-পরিসরে অনন্তকে উপলব্ধির কথা বলেছিল যোগদর্শন। উপনিষদে অণু-কাল ও চিরন্তনতার অভিজ্ঞান নির্ণয় খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরম সত্যকে বুঝে নিতে হয় এই দুইয়ের অভিজ্ঞানের নিরিখেও। 'কালশ্চাকালশ্চ' অর্থাৎ কাল ও অকাল (সময় ও সময়শূন্যতা)-এর অভিধায় আসলে সময়ের দুরকম ধারণার কথা বলা হয়েছে। এই তত্ত্বীজকে কিছুটা প্রসারিত করে বিখ্যাত প্রত্নকথা-বিশারদ মির্চা এলিয়াড মন্তব্য করেছেন : 'Mythical or sacred time is

qualitatively different from profane time, from the continuous and irreversible time of our everyday desacralized existence. In narrating a myth we reactualize, as it were, the sacred time in which occurred the events of which we are speaking' (১৯৬৩ : ১৭৩)। পার্থিব সময়ের বিপ্রতীপে যে শুদ্ধ সময়ের কথা ভাবা হলো এখানে, তাকে যদি মহাসময় বা শাশ্বত কাল ভেবে নিই—দেখব যে ভারতীয় দর্শনপ্রস্থানগুলির মধ্যে এ-বিষয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য রয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন-ভাবনায় সময় চিরন্তন সত্তা ও স্বয়ম্ভু। অতীত থেকে বর্তমান হয়ে অনন্ত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তার বিস্তার। এই যুগ্ম চিন্তাপ্রস্থানের নিজস্ব অধিবিদ্যাগত বাস্তববাদের নিরিখে সময়ের সার্বভৌম মর্যাদা রয়েছে। বিভিন্ন বস্তুর উদ্ভব ও ধ্বংসের মধ্যে যে নৈসর্গিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া মূর্ত হয়ে ওঠে, তাতে সময়ের ভূমিকা আবশ্যিক। দৃশ্যমান জগতে গতি ও পরিবর্তনের তথ্যগুলি লক্ষ করে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে এদের ভিত্তি রয়েছে স্বতন্ত্র-এক নিয়ামক বাস্তবতায়। কেননা গতি ও পরিবর্তন নিজে-নিজে ঘটে না এবং আত্মবিকাশের কোনো শক্তিও নেই তাদের। বিশ্বব্যাপ্ত সময় স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও প্রকৃত বাস্তবতায় দীপ্যমান, তারই প্রভাবে সুশৃঙ্খল ও নিয়মবিন্যস্ত গতি ও রূপান্তর সম্ভব হয়। বিভিন্ন ঘটনার অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদ্‌বর্তিতা, সমান্তরালতা ও অসমান্তরালতা কিংবা পৌর্বাপর্য, গুরুতা ও লঘুতার মধ্যে সম্পর্ক শুধুমাত্র সময়ের প্রেক্ষিতে নির্ণীত হতে পারে। এই দর্শন-প্রস্থানের ভাবুকেরা সময়ের মধ্যে সেই অন্তঃসার খুঁজে পেয়েছেন যা সমস্ত মানবিক অভিজ্ঞতার চিরন্তন ভিত্তি। কিন্তু সাংখ্য-যোগ দর্শন-প্রস্থানের বক্তব্য একেবারে বিপরীত। এই মতবাদের দার্শনিকেরা নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতার কষ্টি-পাথর হিসেবে জগৎ সম্পর্কিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। একক সর্বব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক বাস্তবতা হিসেবে কীভাবে অনন্ত সময়কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অর্জন করা সম্ভব : এই জিজ্ঞাসা তাঁরা করেছেন। এটা ঠিক যে বাস্তব জগতে পরিবর্তনের বাস্তবতা অনস্বীকার্য এবং তা সর্বজনীনও। কিন্তু তাই বলে তাঁরা এটা মানতে রাজি নন যে, সমস্ত পরিবর্তনের ভিত্তিভূমি হিসেবে সময়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও বাস্তবতা স্বীকার্য।

সাংখ্য-যোগ দর্শনপ্রস্থানে যাবতীয় ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্ন উত্তরাধিকার, পৌর্বাপর্য, অগ্রাধিকার ও পশ্চাদ্‌বর্তিতার মধ্যবর্তী সম্পর্ক-বিন্যাসের নিয়ন্তা হিসেবে সময়ের স্বতন্ত্র অভিজ্ঞান মান্য নয়। কেননা তাঁদের মতে সর্বব্যাপ্ত অনন্ত সময় বলে কিছু হতে পারে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্য দিয়ে পরিব্যাপ্ত এবং আরম্ভশূন্য সমাপ্তিহীন অনন্ত সময়ের আয়তন-বিষয়ক ধারণাকে বুদ্ধির কাল্পনিক নির্মাণ বলেছেন তাঁরা : 'স খল্বয়ম কালো বস্তুশূন্যো বুদ্ধিনির্মাণঃ'(পতঞ্জলির যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্য)। কোনও বস্তুর তাৎপর্য অনুধাবন করতে গেলে তাকে প্রাসঙ্গিক খণ্ডকালের প্রেক্ষিতে বিচার করতে হয়।

সীমাতিযায়ী নৈর্ব্যক্তিক কালের ধারণা দিয়ে ঐ প্রেক্ষিতের অর্থবোধ হয় না। যিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, সেই বিষয়ী-সত্তার পর্যবেক্ষণের পরিধিতে উপস্থিত বস্তুগত অনুপুঙ্খগুলিকে বুঝে নিতে হয় তাদেব সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সীমাবদ্ধতার ধারণায়। বস্তু বা ক্রিয়া বা ঘটনার সীমাবদ্ধতা খণ্ডকালের সীমানায় আধারিত। অতএব সীমাতিযায়ী মহাকালের ধারণা অভিজ্ঞতা অর্জনের ক্ষেত্রে কোনও ভাবেই প্রাসঙ্গিক নয়। যার আরম্ভ ও শেষ আছে, তা সময় ও পরিসরের নিরিখে সসীম। বিষয়ী-সত্তা যখন কোনও বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়, অনির্দেশ্যতাব বদলে নির্দিষ্টতা তার কাঙ্ক্ষিত হতে বাধ্য। কেননা নির্দিষ্ট সময় ও পরিসরের বাইরে কোনও অভিজ্ঞতা হতে পারে না, তা সোনার পাথরবাটির মতো অসম্ভব।

সীমাতিযায়ী অনন্ত কালের প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করে সাংখ্য-যোগ দর্শনের ভাবুকেবা একে নিছক বৌদ্ধিক নির্মিতি বলেছেন। আত্মোপলব্ধির মুহূর্তে এই ধারণার মৌলিক অবাস্তবতা বিজ্ঞজনেব কাছে ব্যক্ত হয়ে পড়ে।'যুক্তিদীপিকা' বইতে এমনও বলা হয়েছে যে 'কাল' নামে কোনও পদার্থের অস্তিত্বই নেই। ('ন হি নঃ কালো নাম কশ্চিদ অস্তি, কিং তর্হি ক্রিয়মান-ক্রিযানামেব বিশিষ্ট-অবধি-স্বরূপ-প্রত্যয়-নিমিত্তত্বম্'।) তাব মানে, সীমিত সময়েই সীমিত অস্তিত্ব বা ঘটনাক্রম সম্পর্কিত ধারণার পুষ্টি হতে পারে। বিভিন্ন মুহূর্তের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সময়ের যে-ক্রম তৈরি করে, তাকে কিন্তু 'বস্তু' হিসেবে গ্রহণ কবা যায় না। এইজন্যে তা কোনো বাস্তব পদার্থের সঙ্গে তুলনীয় নয়। একে বলা যেতে পারে মননের নির্মিতি যাকে বাচনিক জ্ঞানের পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করা যায। মুহূর্ত-পরম্পবার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ যে ক্রমের আভাস আনে, তাকেই বিজ্ঞজনেরা 'কাল' (অর্থাৎ মহাসময়)বলে চিহ্নিত করেছেন। (দ্রষ্টব্য : পতঞ্জলির যোগসূত্রের ব্যাস-ভাষ্য : ৩ : ৫২) । সময়ের এই অধিবিদ্যা থেকে যত বিতর্ক উদ্ভূত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বিপুল পরিসর দাবি করে। অতএব সেই চেষ্টা করছি না। আপাতত এইটুকু শুধু বলা যায়, সময়কে যে নানা ধরনের চিহ্নায়কের গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে বুঝে নিতে হয় — এ সম্পর্কে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন-প্রস্থান পুরোপুরি অবহিত ছিল। সময় এক ও অবিভাজ্য, তাকে খন্ড-খন্ড অনেক বলে মনে হয় মাত্র। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ হিসেবে প্রতিভাত সময় পরম সত্যেব অন্তর্বৃত শক্তির নানা অভিব্যক্তি। বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ কালের নানা মাত্রায় ভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। বস্তুর যেমন পরমাণু, সময়ের তেমনই ক্ষণ বা মুহূর্ত। সময়ের অণু-সমবায়কে বুঝি পরিসরের অণু-পরম্পরায়। এদের অন্যোন্য-সম্পর্কের গ্রন্থনা ছাড়া কোনো আস্তিত্বিক বা জ্ঞানতাত্ত্বিক উপলব্ধি অসম্ভব। সমস্ত উপলব্ধির কেন্দ্রে রয়েছে বর্তমান; তাই গভীর মনস্তাত্ত্বিক প্রেরণায় মানুষ একদিকে চিরবর্তমানের অস্তিত্ব এবং অন্যদিকে নিয়ত উপস্থিত

স্মৃতি বা ঐতিহ্যের কল্পনা করে নিয়েছে। আর, ভারতীয় সময়চেতনার নির্যাস যেন ব্যক্ত হয়েছে প্রাজ্ঞবাচনে : 'অহমেবাক্ষয়ো কালঃ' (গীতা : ১০ :৩৩) অর্থাৎ পরম সত্যই অক্ষয় কাল কিংবা অক্ষয় কালই পরম সত্য।

সাত

একদিকে ক্ষয়িষ্ণু ও নশ্বর খণ্ডকাল এবং অন্যদিকে অক্ষয় ও অবিনশ্বর মহাকাল। এই ভাবনায় সম্পৃক্ত হয়ে গেছে সৃষ্ট জীবজগৎ ও স্রষ্টা পরম-নিয়ন্তার ধারণা। কোনো ধর্মবিশ্বাসে এর ব্যতিক্রম নেই। অজস্র দৃষ্টান্ত থেকে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করছি। কোরআন শরীফের সূরা আন্‌আ'ম (ষষ্ঠ সূরা : প্রথম রুকূ)-এর এই আয়াতগুলি লক্ষণীয় : প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন অন্ধকার ও আলো। .... তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, তারপর একটি কাল নির্দিষ্ট করেছেন এবং আরেকটি নির্ধারিত সময়সীমা আছে যা শুধু তিনিই জানেন।' সুতরাং ইস্‌লামি সৃষ্টিতত্ত্বের নিরিখেও সময়-ভাবনার দার্শনিক অন্তঃসার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সময়-বাচক অনুষঙ্গ হিসেবে লক্ষ করা যায় আরও কিছু আয়াত :

ক. 'তিনিই দিনকে রাত দিয়ে আবৃত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করতে পারে। আর, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রপুঞ্জ যা কিছু তাঁর আজ্ঞাধীন, সেসব তিনিই সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা আ'রাফ : রুকূ ৭ : আয়াত ৫৪)

খ. 'তিনিই সূর্যকে তেজস্কর ও চন্দ্রকে জ্যোতির্ময় করেছেন এবং তিথি নির্দিষ্ট করেছেন যাতে তোমরা বর্ষগণনা ও কাল- নির্ণয়ের জ্ঞান অর্জন করতে পারো। আল্লাহ এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি।' (সূরা ইউনুস : রুকূ ১ : আয়াত ৫)

গ. 'তিনিই তোমাদের বিশ্রামের জন্য রাত সৃষ্টি করেছেন এবং দেখার জন্য দিন সৃষ্টি করেছেন।' (সূরা ইউনুস : রুকূ ৭ : আয়াত ৬৭)

ঘ. 'আমি রাতকে করেছি আলোকহীন এবং দিনকে করেছি আলোকময় যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে এবং বর্ষ-সংখ্যা ও হিসাব স্থির করতে পারো।' (সূরা বনি-ইস্রাঈল : রুকূ ২ : আয়াত ১২)

ঙ. 'কত মহান তিনি যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন সূর্য ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র। এবং যারা অনুসন্ধিৎসু ও কৃতজ্ঞচিত্ত, তাদের জন্যে রাত ও দিনকে সৃষ্টি করেছেন পরস্পরের অনুগামীরূপে।' (সূরা ফুরকান

: রুকু ৬ : আয়াত ৬১-৬২)

চ. 'তিনি সুপরিকল্পিত ভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা, চন্দ্র ও সূর্যকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই আবর্তন করে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত।' (সূরা যুমার : রুকূ ১ : আয়াত ৫)

ছ. 'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা যিনি মহিমময়, মহানুভব।' (সূরা রাহমান : রুকূ ২ : আয়াত ২৬-২৭)

ইসলামি সৃষ্টিতত্ত্বে সময় এভাবে পবম সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো জটিল দার্শনিক বিতর্কের অবকাশ তাতে কম। প্রধান বিশ্বাস হলো : সময় বস্তুবিশ্বে প্রতিফলিত ও প্রত্যক্ষগোচর। খ্রিস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বেও সময় বিমূর্ত নয়; মূর্ত একক আকরণে তা বিন্যস্ত। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের সূচনায় (জেনেসিস : ১) লোককথার সহজিয়া ধরনে এই আখ্যানবীজ পরিবেশিত হয়েছে : In the beginning, when God created the universe, the earth was formless and desolate. The raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the power of God was moving over the water. Then God commanded, Let there be light and light appeared. God was pleased with what he saw. Then he separated the light from the darkness, and he named the light 'Day' and the darkness 'Night'. Evening passed and morning came, that was the first day...................

Then God commanded, 'Let lights appear in the sky to separate day from night and to show the time when days, years and religious festivals begin; they will shine in the sky to give light to the earth' -and it was done. So God made the two larger lights, the sun to rule over the day and the moon to rule over the night. He also made the stars. He placed the lights in the sky to shine on the earth to rule over the day and night, and to separate light from darkness.'

তাহলে এই হলো সময়ের জন্মবৃত্তান্ত। দিন-বাত্রি-ঋতু-বছর পরম সত্তার আকাঙ্ক্ষায় উদ্ভূত হয়েছে। ভারতীয় উপনিষদের বাচন মনে পড়ে : 'স ঐক্ষত। একো অহং বহু স্যাম্। প্রজায়েয়েম।' অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেন : 'আমি একা, বহু হব। জীবজগৎ সৃষ্টি করব।' কিন্তু সৃষ্টি তো মহাশূন্যে হতে পারে না। অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে পৌঁছাতে গেলে চাই সময়, চাই পরিসর। ইসলামি ও খ্রিস্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ভাবুকদের কেন্দ্রীয় চিন্তাবীজের ক্ষেত্রে আশ্চর্য সাদৃশ্য বিস্মিত করে। চিহ্নায়ক প্রকরণের অনুসারী

হিসেবে আমাদের কয়েকটি কথা মনে আসে :

১. আকাঙ্ক্ষা ও সময়ের নিবিড় দ্বিরালাপ সুদূরপ্রসারী।

২. সময় ও পরিসরের অন্যোন্য-গ্রন্থনা স্বতঃসিদ্ধ।

৩. দিন-রাত্রি ঋতু-বছর আলো-অন্ধকারের দ্বৈততা ও যুগলবন্দি মৌল চিহ্নায়ক হিসেবে সময়-ভাবনায় গ্রথিত।

৪. সময়ের সৃষ্টি ও বিকাশ সম্পর্কিত আদিকল্প আখ্যানেরও প্রত্ন-প্রেরণা।

৫. মহাসময় থেকে খণ্ডসময়ে যাত্রা অবধারিত এবং তা পার্থিব অস্তিত্বেরও অভিজ্ঞান।

আট

এইসব ভাবনাসূত্র আমাদের আরও একবার সন্ত অগাস্টিনের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বহু প্রজন্মের সমবায়ী মনীষা সভ্যতার সেই ধূসর লগ্নেও তাঁর মধ্যে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছিল। অনস্তিত্ব ও অস্তিত্ব, অনধিগম্যতা ও প্রতীতি-সামর্থ্যের মীমাংসাহীন দ্বিবাচনিকতা বিহ্বলতা এনে দিয়েছিল তাঁর বাচনেও। গান যেভাবে সমে ফিরে আসে, আমরাও তেমনি ফিরে-ফিরে আসি তাঁর প্রাথমিক জিজ্ঞাসায় :'Quid est enim tempus ?' আর, ঐ উচ্চারিত প্রশ্নের পরবর্তী বাচনিক বিচ্ছুরণগুলিতে : 'I know well enough what it is, provided that nobody asks me;but if I am asked what it is and try to explain, I am baffled.' (11 :14 : 17)। সেই বোধাতীত ও অপরিমেয়কে উপলব্ধি করার প্রয়োজনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাবিদ-লিখিয়ে-শিল্পীদের সংখ্যাহীন প্রজন্ম অজস্র চিহ্নায়ক-রূপক-প্রতীক-আখ্যানবীজ নির্মাণ করে চলেছে। তবু অণু থেকেও অণীয়ান, মহৎ থেকেও মহীয়ান সময় রয়ে গেছে রহস্যের যবনিকার আড়ালে। ভাবি, সময় কি তবে বাস্তব নয় কখনও? প্রতিটি ক্ষেত্রে তা আসলে অধিবাস্তব! কেননা অনস্তিত্ব সূক্ষ্ম অথচ দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মতো সময়ের অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছে। প্রাচীন সময়-ভাবনার অধিবিদ্যা আজও, এই আধুনিকোত্তর পর্যায়েও, অপ্রতিরোধ্য। সময়ের অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক কূটাভাসকে ভাষা ও বয়ান দিয়ে মোকাবিলা করতে চায় মানুষ। ইদানীং আখ্যানের নতুন-নতুন আকল্পে, এমন কি আখ্যান-বিন্যাসের বিনির্মাণে, এই মোকাবিলার বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি দেখতে পাচ্ছি। অধিবিদ্যাগত মনোভঙ্গি অনুযায়ী অতীত স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে প্রলম্বিত অনিশ্চিত ও অনুপস্থিত অস্তিত্ব। বলা ভালো, অস্তিত্বের ধারণা। তাকে প্রতি মুহূর্তে গ্রাস করে নেতির মন্থন। আর, ভবিষ্যৎ অনাগত ও অনিশ্চিত অস্তিত্ব যা সম্ভাবনা

ও ব্যর্থতার মধ্যে দোদুল্যমান। অন্যদিকে বর্তমান মুহুর্মুহু ক্ষীয়মাণ অনিশ্চিত অস্তিত্বে। সময়বোধ, তাহলে, সর্বগ্রাসী অনিশ্চয়তার দ্যোতনায় খচিত। তার মানে, কার্যত সময় অস্তিত্বহীন অস্তিত্বের ধারণা; তার কোষে-কোষে স্তরে-স্তরে নেতির বিস্তার। অমেয়কে পরিমাপ করার জন্যে তবু যে মানুষ চিহ্নায়ক-রূপক-প্রতীক-প্রত্নকথা- আখ্যানবীজ সৃষ্টি করেছে, একে কূটাভাস ছাড়া কী বলা যাবে আর! দীর্ঘ সময় আর সংক্ষিপ্ত সময় কিংবা প্রত্নকাল আর সমকালের ধারণায় ঐ কূটাভাসের আরেকরকম বিচ্ছুরণ দেখি। পল রিকোর ভাষ্য অনুযায়ী 'The paradox of measurement is a direct result of the paradox of the being and nonbeing of time.' (১৯৮৪ : ৮)। মানুষের আছে বাচন, আছে কল্পনা, আছে আখ্যান : এই আয়ুধ যতটা জ্ঞানতাত্ত্বিক তার চেয়ে বেশি আস্তিত্বিক। সময়ের কূটাভাসকে এই আয়ুধ দিয়ে দেশে-দেশান্তরে পর্বে-পর্বান্তরে মোকাবিলা করেছে মানুষ। নাকি মোকাবিলা করতে গিয়ে আরও অধরা করে তুলেছে কূটাভাসকে! করুক, তবু আয়ুধও তো শানিততর হয়েছে। নইলে ভাষায়, আখ্যান-প্রকল্পে, কল্পনা-মনীষায় কেন দিগন্তের পরে দিগন্ত উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠবে! মানুষের অনুভূতিও সময়-সাপেক্ষ, বলা ভালো, সময়ের ভাসমান বুদ্বুদে জন্ম নেয় অনুভব। বুদ্বুদ যেমন মুহূর্তে লীন হয়ে যায়, অনুভবও ক্ষণিকের মুঠো ভরিয়ে দেয়। কিন্তু হারিয়ে যায় না একেবারে, রেশ রেখে যায় কোথাও। বিলীয়মান অনুভূতিপুঞ্জের অর্জন কতখানি, তা ক্রমবিকাশমান ভাষাচেতনার নিরিখে বুঝে নেওয়া সম্ভব। সময়ের মোহর বাচনের কোষে-কোষে মুদ্রিত হয়ে যায়। অন্তর্বয়নে ও সামূহিক প্রতিবেদনে খচিত থাকে সময়ের স্মৃতি, সময়ের প্রত্যাশা। অর্থাৎ বর্তমানের সত্তা বিচ্ছিন্ন একক নয়, অতীত লীন হয়ে আছে তাতে আর ভবিষ্যৎ রয়েছে বীজের গর্ভে অঙ্কুরের মতো প্রচ্ছন্ন।

তৃতীয় সহস্রাব্দের এই সূচনা-পর্বেও কোনো মোহনায় পৌঁছেছি, তা নয়। তবু দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে মানুষ, এতে তো সন্দেহ নেই। এবার উৎসের দিকে, সময়ের প্রত্নতত্ত্ব অনুধাবনের জন্যে, ফিরে তাকাতে পারি নিশ্চয়। নিয়ত সঞ্চরমান অস্থির বর্তমানের ওপর নির্ভর করতে পারি না, এই জেনেও অতীতের স্মৃতি আর ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় বর্তমানের পরিসরকেই দীর্ঘায়িত করি। এই কূটাভাস অনতিক্রম্য বলে সময়ের বাস্তব নিয়ত অধিবাস্তবে সম্পৃক্ত থাকে। মানুষের শিল্প, সংস্কৃতি ও আখ্যান জুড়ে ব্যক্ত হচ্ছে এই বোধ : 'There are three times : a present of past things, a present of present things, and a present of future things.' (অগাস্টিন : ২০ : ২৬)।

অতীতের বর্তমান আর ভবিষ্যতের বর্তমান যদি নিয়ত ঢেউ তোলে সাম্প্রতিক বর্তমানে, তাহলে সময়ের প্রত্নতত্ত্বও হতে পারে আমাদের প্রত্যেকের নির্জন ঝরনাতলা।

উৎকণ্ঠা-অবসাদ-আতঙ্ক-ঘেরা টুকরো-জীবনে সময়কে যখন জল্লাদের কালো জোব্বায় দেখতে পেয়ে সন্ত্রস্ত আমরা, অভাবনীয়ের চকিত কিরণের স্পর্শ লাগে যেন। আশ্চর্য এই, প্রত্নতত্ত্বের গভীর অতল থেকে উঠে আসে এই বার্তা যে, আধিপত্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও নির্মানবায়ন শাসিত জীবনেও সময়-ভাবনাতে নিহিত আত্মবিনির্মাণের সম্ভাবনা স্বয়ং সময়ই তৈরি করে রেখেছে।

অতএব পাখি যার হাতেই যখন থাকুক, তার উড়াল বন্ধ হয় নি, হবেও না কোনোদিন। ধূপছায়া আর অন্ধবিন্দু সত্ত্বেও সময় ঝল্‌সে উঠছে নিজস্ব আলোয়।

বহু-মরণে ক্লান্ত ও ধূসর আমরা, সময়ের প্রত্নতত্ত্ব থেকে পাঠ করব জীবনের অনন্ত পুনর্জাগরণের গাথা।

❑❑❑